শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-স্মৃতি

(পূর্ণাঙ্গ জীবনী)

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীশিশিরকুমার বসু বি, এ,

তৃতীয় সংস্করণ

প্রকাশক
শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দ সরস্বতী
আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ
(পূর্বনাম—দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম)
পোঃ হালিসহর, জেলা ২৪ পরগণা

উৎসর্গ

যিনি গুহ্যাতিগুহ্য সাধনরহস্যপূর্ণ জীবনেতিহাস বলিতে আমার নিকট হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন এবং নশ্বর দেহান্তে স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদবর্জ্জিত আনন্দঘন-বিগ্রহরূপে আমার হৃদয়-কমলে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পরিচালিত করিতেছেন, অশ্রুসিক্ত এই ক্ষুদ্র বেদনাস্মৃতি তাঁহারই শ্রীচরণে—

শিশিরকুমার

তৃতীয় সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

অনন্তকরুণাঘনবিগ্রহ শ্রীশ্রীঠাকুরের অসীম অনুগ্রহে ৺শিশিরকুমার বসু বি. এ. প্রণীত শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্ণাঙ্গ জীবনী 'শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-স্মৃতি'র সংশোধিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করিল। এই সংস্করণে শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধিমগ্ন অবস্থার একটি প্রতিমূর্তি এবং শ্রীশ্রীঠাকুর অঙ্কিত জ্ঞানচক্রের রঙ্গীন ছবি সংযোজিত হইল। গ্রন্থকারের ইচ্ছানুসারে ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থের লভ্যাংশ হালিসহর মঠে অবস্থিত শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধিপীঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগরাগের নিমিত্ত ব্যয়িত হইবে।

গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন লেখক স্বয়ং ১৩৪২ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের ৩ মাস পরে। ইহার পাণ্ডুলিপি শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুটা সংশোধন করিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম হইতেই গ্রন্থটি মঠ হইতে প্রকাশের চেষ্টা চলিয়াছিল, কিন্তু এতদিন ইহা কেন সম্ভব হয় নাই তাহা দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকারের বক্তব্য পড়িলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। অবশ্য পূর্ববর্তী সংস্করণে গ্রন্থটিতে বহু তথ্য অগোছালভাবে এবং বিকৃতভাবে সন্নিবেশিত ছিল। অতঃপর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন শ্রীমুকুন্দলাল দে। এই সংস্করণ শেষ হওয়ার পর গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত দে-কে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের অনুমতি দেন নাই। এইসময় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রবীণ ভক্ত শ্রীমনোমোহন ঘোষ হালিসহর মঠ হইতে প্রকাশের চেষ্টায় গ্রন্থকারের নিকট যাতায়াত করেন এবং বহু আয়াসে গ্রন্থটির বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশের স্বত্ব অধিগ্রহণের বন্দোবস্ত করেন। অবশেষে বিগত ১৩৮৬ সালের ৮ই ফাল্গুন গ্রন্থটির দানস্বত্ব রেজিষ্ট্রীকৃত হয়। তাহার একটি অন্যতম সর্ত ছিল যে, গ্রন্থটি শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী বৎসরের মধ্যে প্রকাশ করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় গ্রন্থকার ইহার মুদ্রণকার্যের সূচনা দেখিয়া গেলেন মাত্র, গ্রন্থাকারে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। বিগত ২৯শে বৈশাখ তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে লীন হইয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থটির দানস্বত্ব রেজিষ্ট্রীকালে যাবতীয় লেখালেখির কাজ কলিকাতা-নিবাসী অ্যাডভোকেট শ্রীশচীন্দ্রনাথ হালদার এম. এ. এল. এল. বি. বিনা পারিশ্রমিকে সম্পন্ন করিয়া দিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই সংস্করণের প্রেসকপি আগাগোড়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন শ্রীমৎ স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী মহারাজ। তিনি অসুস্থ শরীর লইয়াও সম্পূর্ণ গ্রন্থের প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছেন শ্রীমৎ বিমলচৈতন্য ব্রহ্মচারী। গ্রন্থ অধিগ্রহণের পূর্ব হইতে প্রেসে প্রুফ আনা-নেওয়া, নূতন ব্লক নির্মাণ ইত্যাদি তদারকি করিয়াছেন শ্রীমনোমোহন ঘোষ। গ্রন্থটি সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে প্রকাশের আপ্রাণ প্রচেষ্টার জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। ট্রাষ্টী শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র রায় গ্রন্থটির অনেকগুলি তথ্যগত ত্রুটি ধরাইয়া দিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। নির্ভুলভাবে প্রকাশের যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও তথ্যগত, ভাষাগত ও মুদ্রণগত ভুলত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। তজ্জন্য মরালধর্মী পাঠকগণের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের এই জীবনীগ্রন্থখানি পাঠে পাঠকগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘটনাবহুল অমূল্য জীবনী সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করিব। অলমতিবিস্তরেণ।

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ
(আশ্রম বিভাগ)
পোঃ হালিসহর, ২৪ পরগণা
ইং তাং ২০।১২।১৯৫৫

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
স্বামী তুরীয়ানন্দ সরস্বতী
প্রকাশক

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ

পরিশিষ্ট



শ্রীশ্রীঠাকুর

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-স্মৃতি

প্রথম ভাগ

১

নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমাকে * দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ভৈরব নদ প্রবাহিত। কিছুকাল পূর্ব্বে এই নদের স্বাদু জল স্বাস্থ্যকর ছিল। এখন নানা কারণে মরিয়া বুজিয়া যাওয়ায় ইহার তীরবর্ত্তী গ্রামগুলি ম্যালেরিয়ার লীলা-নিকেতন হইয়াছে। ইহার তীরে নীলকর সাহেবগণের যে-সব লীলাভিনয় হইয়াছে তাহা কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে বটে কিন্তু ভৈরবের উভয় তীরের বৃক্ষশ্রেণী ও উত্তর তীরে নীলকুঠির বিরাট সৌধরাজি এখনও সে স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভৈরবের উত্তর তীরে যে স্থানে নীলকুঠি, ঠিক তাহার দক্ষিণ তীরে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজির অন্তরালে কুতবপুর নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লী অবস্থিত।

কুতবপুর গ্রামটী মেহেরপুর মহকুমার অন্তর্গত, চুয়াডাঙ্গা রেল ষ্টেশন হইতে ২৬ মাইল দূরবর্ত্তী। গ্রামের লোক অধিকাংশই কুমার জাতীয়; তাহারা শাঁখার ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং উদরান্নের

---

* বর্ত্তমানে মেহেরপুর মহকুমা বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত।

সংস্থানের জন্য তাহাদের বাহিরের প্রয়োজন ছিল খুব কম। গ্রামে লোকের সংখ্যাও যে খুব বেশী তাহা নহে। পুরাতন পল্লী বলিতে আমাদের সম্মুখে যে সকল চিত্রের সমাবেশ হয়, কুতবপুর গ্রামে তাহার কোনটীরই অভাব ছিল না। উদরান্নের সংস্থান লইয়াই যে সংসার, তাহাতে তাহারা বেশ শান্তিতে বাস করিত। কিন্তু এ শান্তি ত প্রকৃত শান্তি নয়। প্রকৃতপক্ষে নিজ অভাববোধের অজ্ঞতাই যে এ শান্তির হেতু! যে শান্তি চিরন্তন, শাশ্বত, অব্যয়—যে শান্তির গরিমা একদিন এইরূপ শান্তরসাস্পদ ক্ষুদ্র পল্লীতে ফুটিয়া উঠায় ভারত সমগ্র জগতের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে শান্তির সন্ধান ইহারা জানিত না। ইহাদের অধ্যাত্ম-জগতের ধারণা অতি দীন ছিল। উচ্চাঙ্গের যে সকল সাধনপদ্ধতি প্রকৃত শান্তির প্রবাহ বহায়, সে সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অন্ধ ছিল। তাহারা জানিত না যোগ কি, জ্ঞান কি, বুঝিত না ভক্তি কি ও ভাবোন্মত্ততার উচ্ছ্বাসে শান্তি কি? মিত্রপূজা (ইতুপূজা), মনসাপূজা, বাস্তুপূজা, আসানপীরের সিন্নী, এই ছিল তাহাদের অধ্যাত্ম-সাধনা। তাহাদের ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ সংস্কার ছিল বৎসরান্তে ব্রাহ্মণবাড়ী দোল, দুর্গোৎসব, কালীপূজা ও হরি-সঙ্কীর্ত্তন। এইরূপ সমাজে সজীবতার লক্ষণ ছিল দলাদলি, ঈর্ষ্যা-দ্বেষ, বাদ-বিসম্বাদ এবং সর্ব্বোপরি নৈতিক চরিত্রের অতি হীন আদর্শ।

পিতৃপরিচয়—আমরা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর * পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। তখন এইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতরে ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় (ভট্টাচার্য্য) নামে দেব-দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ কয়েক ঘর জ্ঞাতির সহিত এই গ্রামে বাস করিতেন। তিনি মেহেরপুরের অদূরে রাধাকান্তপুর-নিবাসী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী নামে জনৈক সঙ্গতিপন্ন ব্রাহ্মণের কন্যা মাণিকসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন।

* এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকাল ১৩৪২ বঙ্গাব্দ।

মাতৃপরিচয়—স্বামীগৃহে শ্বাশুড়ীর অভাব থাকিলে নববধূ স্বামীগৃহে আসিয়া অকালে গৃহকর্ত্রীর পদপ্রাপ্তিতে নবীনা হইয়াও প্রবীণার শ্রেণীতে পরিণতা হইয়া থাকেন; মাণিকসুন্দরী দেবীরও তাহাই হইয়াছিল। অল্প বয়সে প্রবীণার পদপ্রাপ্তি হইলেও তাঁহাতে প্রকৃতি-প্রদত্ত গাম্ভীর্য্য বেশ মানাইয়াছিল। অতি অল্প দিনে তিনি সংসারের ভার স্বীয় স্কন্ধে লওয়ায় সংসারসম্বন্ধে তাঁহার আদেশ সবারই পক্ষে অলঙ্ঘনীয় হইতে লাগিল। স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য্য তাঁহার বয়সের অপেক্ষা না রাখিয়া ভুবনমোহনের গৃহে সর্ব্বময়ী কর্ত্রীর আসনকে অতিশয় সুশোভিত করিয়াছিল। তাঁহার গাম্ভীর্য্য সবাইকে মাতৃত্বের সন্ধান দিত এবং এই গাম্ভীর্য্য এত দ্রুত তাঁহার মাতৃত্বে পরিণত হইয়াছিল যে আপামর সাধারণ তাঁহার ভিতর কিছু গুরুত্বের ও স্নেহের সঙ্কেত পাইয়া বিপদ-আপদে নিজেদের ভরসাস্থল মনে করিয়া লইয়াছিল; তাই দূর-দূরান্তর হইতে নিরাশ্রয় রবাহূতের দল আসিয়া ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকিত। দীনদুঃখী যাহারা তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিল তাহারা সমস্ত দিন এদিক ওদিক ঘুরিয়া দ্বিপ্রহরে ঠিক আহারের সময় আসিয়া হাজিরা দিত। তিনি তাহাদিগকে কোন দিনই বিমুখ করিয়া ফিরাইয়া দিতেন না। এমন অনেক দিন গিয়াছে যখন তিনি সকলকে খাওয়াইয়া দিনের শেষে আহারে বসিয়াছেন, আর অজ্ঞাত অভাজন কেহ আসিয়া "মা, দু'টি পাব" বলিয়া মুখের দিকে তাকাইয়াছে তখন মার আর খাওয়া হয় নাই। কোলের অন্ন তাহাকে দেওয়ায় মনের আনন্দপ্রাচুর্য্যে তাঁহার সমস্ত দেহ-প্রাণ নৃত্য করিয়া উঠিয়াছে, নয়নে বদনে প্রীতির বিমলচ্ছটা জাগিয়া উঠিয়াছে। এমন দিনও গিয়াছে যে দারুণ শীতের গভীর রাত্রে আহারের পর শুইয়াছেন আর অতিথি অভ্যাগত কে কোথা হইতে আসিয়া তাঁহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছে, মার আর ঘুম হয় নাই। কারণ মার সদাব্রতের কথা ওদেশের লোকের

জানা ছিল—'কুতবপুরের ব্রাহ্মণবাড়ী যখনই যাওয়া যায় তখনই অন্ন মিলে।'

মাণিকসুন্দরী দেবীর বিবাহের পর সাত আট বৎসর কাটিয়া গেল। ক্রমে দীনদরিদ্রের সেবাপরায়ণা সদাহাস্যময়ী মাণিকসুন্দরী দেবীর হৃদয়ে একটি নিরাশার তরঙ্গ মাঝে মাঝে দেখা দিয়া আবার মিলাইয়া যাইত। কারণ প্রথমে পর পর দুইটী কন্যা হয়। পুত্রসন্তান না হওয়ায় ভুবনমোহন চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। দ্বিপ্রহরে গ্রামের মেয়েরা তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া প্রায় প্রত্যহই গল্পগুজব করিত। কথাপ্রসঙ্গে প্রায়ই মাণিকসুন্দরী দেবীর পুত্রসন্তানের আক্ষেপ শুনিতে পাওয়া যাইত। এমন অন্নপূর্ণাসদৃশী মহীয়সী রমণীর কোলে যে একটা ছেলে হইল না, এই আক্ষেপের উত্তরে মাণিকসুন্দরী দেবী বলিতেন "আমার ছেলের অভাব কি? নিজের পেটে সন্তান না ধরিলে কি আর মা হওয়া যায় না?" কিন্তু অন্তরে-অন্তরে একটী পুত্রসন্তান কোলে করিতে এবং তাহার মুখে "মা" ডাক শুনিতে তাঁহার বড়ই সাধ হইত। মাঝে মাঝে তাঁহার বিমর্ষ মুখ দেখিয়া আত্মীয়স্বজন সবাই দুঃখিত হইয়া পড়িত এবং অনেকে তাঁহাকে ব্রত-নিয়ম পালন করিতে পরামর্শ দিত। মাণিকসুন্দরী দেবীর পিতা অপুত্রক ছিলেন। সুতরাং পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয় কুলই নির্ব্বাপিত হয় দেখিয়া তিনি ব্রত নিয়ম পালন ও কার্ত্তিকেয়ের নিত্যপূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। মাতৃত্বই নারীর ধর্ম্ম, তাহাতেই তাহার জীবনের সার্থকতা। তাহা যদি না হইবে তবে নারীর দেহ এরূপভাবে গঠিত হইয়াছে কেন? নারী-দেহে বিধাতা কতটা কল্পনাবলেই না সমস্ত জরায়ুতে সন্তানের শয্যা রচনা করিয়াছেন? যদি সন্তানের জন্যই না হইবে তবে এ রচনা কেন? এবং "মা" ডাকই বা কর্ণে মধু বর্ষণ করে কেন? যদি নারী-দেহ সৃষ্টির কোন সার্থকতা না হয়, যদি প্রকৃত মাতৃত্ব তাহাতে বিকশিত না হয়, তবে দেহভার বহন

করিয়াই বা লাভ কি ? মাণিকসুন্দরী দেবী এইরূপ চিন্তা করিয়া মাঝে মাঝে একান্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িতেন এবং দেবতার নিকট মনে মনে প্রার্থনা করিতেন যাহাতে সত্বরই তিনি একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র লাভ করেন।

আবির্ভাব—ন্যূনাধিক দুই বৎসর ব্রত নিয়ম পালন করিবার পর মাণিকসুন্দরী দেবীর সন্তানসম্ভাবনা প্রকাশ হওয়ায় কুতবপুর ও রাধাকান্তপুরে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। সন্তান গর্ভে আসিবার পর হইতেই দিন দিন তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া তিনি যেন কোন অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিতা হইতে থাকিলেন। গর্ভে সন্তান যতই বড় হইতে থাকিল মাণিকসুন্দরী দেবীর ততই নানাবিধ দিব্য অনুভূতি, দিব্য স্বপ্ন, দিব্য দর্শন দৈনন্দিন ঘটনা হইয়া দাঁড়াইল। মধ্যে মধ্যে অনাঘ্রাতপূর্ব্ব সৌরভে তাঁহার ঘর আমোদিত অনুভব করিতেন। মাঝে মাঝে তিনি শুনিতে পাইতেন যেন দূরে কেহ আরতির ঘণ্টা-নিনাদ করিতেছে ও ধূপধুনার গন্ধ বায়ুভরে ভাসিয়া আসিতেছে এরূপ অনুভব করিতেন। আবার কখনও কখনও শুনিতে পাইতেন, কাহারা যেন সমস্বরে দেব-বন্দনা-গীতি ও স্তোত্রপাঠ করিতেছে। এতাদৃশ অদ্ভুত ঘটনায় তিনি মাঝে মাঝে ভাব-স্তম্ভিতা হইতেন। যাহা হউক এইরূপে দশমাস কাটিয়া গেল। মাণিকসুন্দরী দেবী তখন পিত্রালয় রাধাকান্তপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অবশেষে বঙ্গাব্দের ১২৮৬ সালের* ঝুলনপূর্ণিমার তিথি আসিল। দিকে দিকে হরিধ্বনি, দিকে দিকে আনন্দের উচ্ছ্বাস বহিতে লাগিল। উক্ত তিথিতে রাত্রি দেড় ঘটিকার সময় সূতিকাগৃহ আলোকিত করিয়া, উভয়কুলকে উল্লসিত করিয়া, মাণিকসুন্দরী দেবীর অঙ্ক শোভিত করিয়া দিব্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিশুর আবির্ভাব হইল।

---

* মতান্তরে ১২৮৭ সাল।

আনন্দাতিশয্যের ভিতর দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। মহাসমারোহে বালকের নামকরণ করা হইল। ভুবনমোহন বালকের নাম রাখিলেন নলিনীকান্ত। উত্তরকালে এই বালকই পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী** নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

বংশতালিকা *

(১) পিতৃপক্ষ

- ৺শালগ্রাম চট্টোপাধ্যায়
  - ৺জগমোহন
    - ৺গুরুদাস
      - ৺ভুবনমোহন
        - নলিনীকান্ত (স্বামী নিগমানন্দ)
    - ৺রামতনু
      - ৺রাধিকা
        - বিষ্ণুপদ
    - ৺বিশ্বনাথ
      - ৺বিধু
        - ৺ইন্দু
          - তিনকড়ি
            - তারাপদ
            - ৺দুর্গাপদ
            - ৺শ্যামাপদ
            - রামপদ
  - ৺কাশীনাথ
    - ৺দীনবন্ধু
      - ৺শরচ্চন্দ্র

(২) মাতৃপক্ষ

- ৺আনন্দরাম চক্রবর্ত্তী
  - ৺রামতনু
    - ৺ত্রৈলোক্য ও তৎপত্নী ৺আনন্দময়ী দেব্যা
      - ৺কৃষ্ণময়ী
      - ৺মাণিকসুন্দরী (নলিনীকান্তের মাতা)
      - গোলাপসুন্দরী

* শ্রীযুক্ত রামানন্দ ব্রহ্মচারী (রামপদ চট্টোপাধ্যায়) মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শিক্ষা—কুতবপুরের পূর্ব্ববর্ণিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর শিশু ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে ভুবনমোহনের নিরানন্দের সংসারে আনন্দ ফিরিয়া আসিল। তিনি তারাপদ, দুর্গাপদ, শ্যামাপদ ও রামপদ নামক আরও চারিটি পুত্র লাভ করিলেন। ইহাদের ভিতর দুর্গাপদ ও শ্যামাপদর বাল্যকালেই মৃত্যু হয়। এদিকে নলিনীকান্ত যতই বড় হইতে থাকিল তাহার দৌরাত্ম্য ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আশৈশব তাহার শরীর অত্যন্ত কৃশ থাকিলেও বাল্যের স্বভাব-চাঞ্চল্য-বশে দারুণ দৌরাত্ম্যে প্রতিবেশীগণ ঝালাপালা হইয়া যাইত। যেমন মাণিকসুন্দরী দেবীর পূর্ব্বে কোনও সন্তানসন্ততি ছিল না, এখন তেমনিই মাঝে মাঝে সন্তানের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিতে লাগিলেন। দৌরাত্ম্য করিলেও প্রতিবেশীগণ কিন্তু নলিনীর ফুটন্ত পদ্মের মত মুখখানার দিকে তাকাইলে সব ভুলিয়া যাইত। তাহাকে সবাই প্রাণ উঘাড়িয়া ভালবাসিত বলিয়াই তাহার দৌরাত্ম্য অকাতরে সহ্য করিত এবং কোনদিনই তাহারা কোন অভিযোগ করিতে আসিত না। কারণ অত্যাচারের বহরটা যত বেশীই হউক না কেন, সুকুঞ্চিত দীর্ঘকেশে আবৃত তাহার প্রিয়দর্শন মুখের দিকে তাকাইলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ব্যক্তিও না হাসিয়া থাকিতে পারিত না। ভুবনমোহন তাঁহার পুত্রের দৌরাত্ম্য কমাইবার জন্য তাহার শিক্ষায় মনোযোগী হইলেন। তখন নলিনীকান্তের বয়স ৭ বৎসর হইয়াছে। এখনও লেখাপড়া না করিয়া শুধু খেলাধূলা লইয়াই থাকিবে এ কেমন অশোভন বলিয়া বোধ হইল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া দু'পয়সা না আনিলে যদিও বা চলে কিন্তু ব্রাহ্মণের ছেলে একেবারে মূর্খ হইয়া থাকিলে চলিবে কি প্রকারে? সুতরাং তাহাকে গ্রামের নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল।

এতদিন যে শক্তি চাঞ্চল্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছিল এখন সেই সমস্ত শক্তি ক্রমশঃ পাঠে নিয়োগ করার ফলে অতি অল্প সময়ের ভিতরেই তাহার পাঠ আয়ত্ত হইয়া যাইতে লাগিল। বিদ্যাশিক্ষায় সে যেমন মেধাবী ছিল, গুরুমহাশয়ের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতেও তদ্রূপ উদ্যোগী ছিল। গুরুমহাশয় প্রায়ই তাহার প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার করিতেন, কিভাবে তাহার প্রতিশোধ লওয়া যায় নলিনীকান্ত তাহার চিন্তা করিয়া উপায় উদ্ভাবন করিত। একদা গুরুমহাশয় পাঠশালার ভিতর গোলযোগ করিবার জন্য দোষী নির্দ্দোষী বিচার না করিয়া সবাইকে উত্তম-মধ্যম দিলেন, ফলে নলিনীও বাদ পড়িল না। দু'দিন বসিয়া চিন্তা করিয়া নলিনী উহার উপায় উদ্ভাবন করিল। অতঃপর সন্ধ্যার সময় একখানি 'হেসো' (একপ্রকার ধারাল অস্ত্র) ভাল করিয়া ধার দিয়া লইয়া শুইয়া রহিল। গভীর রাত্রে যখন সবাই নিদ্রিত, নলিনী তখন এই অপমান ও অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য 'হেসো'খানি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। গুরুমহাশয়ের খড়ের ঘর, ঝাপের দরজা, সুতরাং ভিতরে গিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার কোনই অসুবিধা নাই। কয়েকখানি বাড়ী অতিক্রম করিয়া একস্থানে আসিয়া লোকের সাড়া পাইয়া নলিনী দাঁড়াইয়া পড়িল। অতঃপর এই বাড়ীর বৃক্ষের আড়ালে কোনও লোক দাঁড়াইয়া আছে অনুমান করিয়া তাড়া খাইবার ভয়ে নলিনী গাছের আড়াল হইতে সরিয়া পড়িল। সুতরাং ঐ দিন তাহার সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল। এইরূপ প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়াও নলিনী অতি অল্পদিনের মধ্যেই গুরুমহাশয়ের যাহা কিছু বিদ্যা সব আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। ভুবনমোহন ও যুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায় পরস্পর জ্ঞাতি ভাই। উভয়ের ভিতর বেশ সৌহার্দ্দ্য, বাড়ী উভয়ের একই। যুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না। তিনি নলিনীকান্তকে অতিশয় স্নেহ করিতেন ও তাহার আবদার উপদ্রবও

অনেক সহ্য করিতেন। নলিনীকান্তও অনেক সময় তাঁহার নিকট থাকিত, তাঁহার গৃহে আহার ও রাত্রি যাপন করিত।

দিব্যদর্শন—এই সময় নলিনীকান্তের সর্ব্বপ্রথম এক অপূর্ব্ব দর্শন হয়। একদা সাঁঝের বেলায় মা নলিনীকান্তকে চণ্ডীমণ্ডপে আলো জ্বালিবার জন্য তাহার হস্তে একটী প্রদীপ দিলেন। প্রদীপ হস্তে বালক মণ্ডপের সমীপস্থ হইবা মাত্রই সহসা মণ্ডপের মধ্যে আপনা হইতেই দপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া মণ্ডলাকৃতি ধারণ করিল ও তন্মধ্যে দশভুজার মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। বালক নলিনীকান্ত ভয়ে প্রদীপ মাটিতে ফেলিয়া দৌড়াইয়া গিয়া মাকে সমস্ত ঘটনাটী বলিল ও কাঁপিতে থাকিল। মহামনা মাতা পুত্রকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "ভয় কি বাছা! আমি তোমার মা, আর দশভূজা জগতের মা। তোমাকে তিনি দেখা দিয়াছেন, ইহা ত ভাগ্যের কথা।" শুনিয়া বালক আশ্বস্ত হইল। এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদা রাত্রে নলিনীকান্ত খুল্লতাতের গৃহে শয়ন করিয়া আছে। হঠাৎ গভীর রাত্রে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। অন্ধকার রাত্রে প্রথমে ছাদে দৃষ্টি পতিত হওয়ায় সে দেখিল, অন্ধকার রাত্রে সমস্ত তমসা ডুবিয়া গিয়া পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া ভাবিবার পরে সে যেদিকে তাকাইতে লাগিল সেই দিকেই যেন চন্দ্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া মনে হইল। তারপর বহুক্ষণ অনুধাবন করিয়া বুঝিল যে চন্দ্র আর কিছুই নহে, তাহারই নয়নজ্যোতি।

পূর্ব্বজন্মের সংস্কার—নলিনীকান্ত অতি অল্প দিনেই নিম্ন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা শেষ করিয়া স্থানীয় পোষ্টমাষ্টারের নিকট ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু সুবিধা হইল না দেখিয়া রাধাকান্তপুরের অনতিদূরে দারিয়াপুর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। ক্রমে নলিনীকান্ত যখন একাদশ বর্ষে পদার্পণ

করিল, ভুবনমোহন তখন সময় বুঝিয়া পুত্রের উপনয়নকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। উপবীতের পর নলিনীকান্তের খুব ধর্মভাব জাগিল।

দৈবঘটনা দিব্যদর্শন যাহার আশৈশব দৈনন্দিন ঘটনা হইয়া আসিতেছিল, দেবদেবীর উপর ভক্তি যাহার মনটা অধিকার করিয়াছিল, উপবীত গ্রহণের ২।৩ বৎসর পরে সে সমস্ত দর্শন একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে নাস্তিকতা আসিয়া ক্রমে তাহার সমস্ত অন্তরটা অধিকার করিয়া বসিল। কিন্তু এই সময় হইতে সে মাঝে মাঝে প্রায় দুই তিন মাস অন্তরই একই প্রকারের একটী স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। এই স্বপ্নটী সে আত্মসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত ৪।৬ মাস অন্তরই এক একবার দেখিত। স্বপ্নটী এইরূপ ঃ—কোথায়ও এক ঘনান্ধকারময় প্রদেশে একটী পুষ্করিণী। সেই পুষ্করিণীর ভিতর একটি রক্তপদ্ম। পদ্মটীর চারিটী দল। প্রতি দলে একটী করিয়া অক্ষর লেখা। সেই পদ্ম হইতে যেন একটী অতি সূক্ষ্ম সূত্র ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। তিনি সেই সূত্র ধরিয়া উপরে উঠিতেন। ক্রমে উপরে গিয়া আর একটী পদ্মের উপর উপস্থিত হইতেন। তথায় গিয়া যখন দেখিতেন, নামিবার আর কোনও উপায় নাই তখনই ভয়ে স্বপ্ন ভঙ্গ হইত। এই স্বপ্ন তাঁহার সমাধি না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। তবে পরে সাধক অবস্থায় যতই অগ্রসর হইতেছিলেন ততই সেই চতুর্দল পদ্ম হইতে ঊর্দ্ধগত সূত্র ধরিয়া উপরে উঠিতে থাকিতেন। যোগসাধনকালে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ইহা তাঁহার পূর্ব্বজন্মের সংস্কার। চতুর্দল পদ্মটী মূলাধারপদ্ম ছাড়া আর কিছুই নহে।

সহজাত সংস্কার—দারিয়াপুরে বিদ্যাভ্যাসকালে নলিনীকান্তের চরিত্রের গুরুতর পরিবর্ত্তন হইতে থাকিল। ব্রাহ্মণের আভিজাত্য, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা, ধর্ম্মের গোঁড়ামি তাহার মন হইতে একে একে অন্তর্হিত হইল। তৎপরিবর্ত্তে মন মহান্ ও উদার হইতে থাকিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি গ্রামের অধিকাংশ শাঁখারী। শৈশবে তাহাদের সহিত

অতিবাহিত করিলেও বয়োবৃদ্ধির সহিত সে-সব চপলতা বা বাল্যভাব দূরীভূত হইয়া সামাজিক ব্রাহ্মণের ভাব তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইবে, এরূপ আশা করা গিয়াছিল, কিন্তু তাহা না হইয়া বরং চাপল্য আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। এখনও কৃষ্ণবন্ধুর বাড়ীতে যাওয়া-আসা পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে লাগিল। গ্রামের ভিতর অবস্থাপন্ন কুমার-জাতীয় কৃষ্ণবন্ধু পালের সহিত তাহার বন্ধুত্বের কিছুমাত্র লাঘবতা প্রকাশ পাইল না।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব—এই সময় নলিনীকান্তের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। এই চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালকের হাতে কিছু টাকাপয়সা আসিলেই কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঘন ঘন কলিকাতায় যাওয়া-আসা করিত। কলিকাতায় আসিয়া সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় থাকিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি, সম্পর্কে দাদামহাশয়। নলিনীকান্ত তাঁহাকে ঠাকুরদাদা বলিয়া ডাকিত। বঙ্কিমচন্দ্রও নলিনীকে খুব ভালবাসিতেন। উভয়ের মিলনও বড চমৎকার ছিল। একজন সাহিত্যসম্রাট্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও বৃদ্ধ, অপরপক্ষে একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক। উভয়ের ভিতর সম্প্রীতি, ভালবাসা, স্নেহ, ভক্তি, ঠাট্টা, তামাসা, উপদেশ, ধর্ম্মালোচনা কতই না চলিত। একজন বৃদ্ধ অপরজন বালক হইলেও উভয়ের চিন্তার ভূমিটা যেন একই প্রকার ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "এটা এরূপ নহে, এইরূপ হইবে।" নলিনী ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়তার সহিত বলিল, "না, তা হতে পারে না। আপনি ভুল বুঝেছেন। ওটা এইরূপ হইবে।" অনেক সময় নলিনীর প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাহার অনেক কথা মানিয়া লইতেন। নলিনীর প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণচরিত্র" ও "ধর্ম্মতত্ত্ব"।* বঙ্কিমচন্দ্র বাছাই ও ছাঁটাই

* বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার সূক্ষ্মদেহের সহিত তাঁহার প্রণীত "কৃষ্ণচরিত্র" সম্বন্ধে আলোচনা—স্বামী নিগমানন্দ প্রণীত "জ্ঞানীগুরু" গ্রন্থে "ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষিত

করিয়া যেরূপ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য অধ্যাত্মতত্ত্ববিবর্জ্জিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন তাহা বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া যুক্তিতর্কেরই সিদ্ধান্তস্বরূপ হওয়ায় নলিনীকান্তের বেশ ভাল লাগিয়াছিল। সুতরাং অলৌকিকত্ব, অতিমানুষিকতা, লীলাময়ত্ব প্রভৃতি নলিনীকান্তের তর্কযুক্তিময়ী বুদ্ধির নিকট তখন ধরা পড়ে নাই। যাহা হউক বালক নলিনীর এইরূপ মাঝে মাঝে একাকী কলিকাতায় আসা-যাওয়া করিবার জন্য তাহার জীবন একদা ভয়ানক বিপদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

একদিন কলিকাতা হইতে বাড়ী ফিরিতে শিয়ালদহ হইতে প্রাতে ট্রেনে চাপিল। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে কাঁচড়াপাড়ার নিকট ট্রেনে যাত্রীদের ভিতর বিশেষ ত্রাসের সঞ্চার লক্ষিত হইল। সবাই হুড়াহুড়ি করিয়া গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া উদ্বেগের সহিত কি যেন দেখিতেছিল। অনেকে চলন্ত ট্রেন হইতে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল। নলিনীকান্ত দেখিল যে দূর হইতে অপর একখানি ট্রেন বিপরীত দিক হইতে সাঁ সাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। মুহূর্ত্তের ভিতর দুইটি ট্রেনের ইঞ্জিনে ধাক্কা লাগায় ট্রেনের ভিতর মহা আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। যাত্রীরা সব প্রাণের ভয়ে মালপত্রের মায়া ত্যাগ করিয়া জানালা দিয়া লম্ফ প্রদান করিতে থাকিল। নলিনীকান্তের ভিতরেও তখন কে যেন সাহসের সঞ্চার করিয়া লম্ফ প্রদানে ইঙ্গিত করিল। সেও তদ্দণ্ডে লম্ফ প্রদান করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে থাকিল। পিছনে একবার ট্রেনের দিকে তাকাইয়া দেখিল যে উভয় ট্রেনের ইঞ্জিন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ধাক্কার পর ঊর্দ্ধে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ট্রেনের ভিতর মহা হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল। নলিনী আর কোনও দিকে না তাকাইয়া একেবারে হালিসহরে

ব্যক্তির অভিমত" অধ্যায়ে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠক ইচ্ছা করিলে উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি ও সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন।

আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় একদিন এক বাড়ীতে অতিথি থাকিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এই বয়সে তুইটি পারিবারিক তুর্ঘটনায় নলিনীকান্তের মন বিষাদময় হইয়া গেল। প্রথম ঘটনা তাহার উপদেষ্টা ও হিতাকাঙ্ক্ষী দাদামহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু। মৃত্যুসময়ে নলিনীকান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতার বাসায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অন্তিম বিদায় দর্শন করে। অপর ঘটনা তাহার পুত্রবৎসলা জননীর তিরোধান। মাতৃবিয়োগ-কালে সে রাধাকান্তপুরে থাকায় মায়ের সহিত শেষ দেখা না হওয়ায় নিদারুণ ব্যথিত হইল। মনুষ্যদেহের এইরূপ পরিণতি দেখিয়া গভীর নৈরাশ্যে তাহার মন সাময়িক ভাবে বিষাদগ্রস্ত ও দেহের নশ্বরতা সম্বন্ধে চিন্তার বিষয়ীভূত হইল।

কোষ্ঠীবিচার—পত্নীবিয়োগে ভুবনমোহন একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। তখন হইতে তাঁহার সন্তানগণের লালন-পালনের ভার তাহাদের মাতামহীর উপর ন্যস্ত হইল। একে পত্নীবিয়োগ, তারপর কাঁচড়াপাড়া ট্রেন সংঘর্ষ হইতে নলিনীর জীবনরক্ষা এই উভয় ঘটনায় ভুবনমোহন ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কা মন হইতে দূর করিবার আশায় নলিনীর কোষ্ঠীর ফলাফল জানিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইলেন। কয়েকদিন পরে কাশিমবাজারের রাণী স্বর্ণময়ীর সভাপণ্ডিত কার্য্যোপলক্ষে কুতবপুর আসিলেন। ভুবনমোহন নলিনীর কোষ্ঠীর ফলাফল জানিবার জন্য উক্ত পণ্ডিতমহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি কোষ্ঠীবিচার করিয়া দেখিলেন এবং তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ এরূপ অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত ঘটনাসমন্বিত যে তৎসম্বন্ধে কতকটা ভীত ও বিস্মিত হইবার কারণ আছে বলিলেন। পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন যে এইরূপ বৈচিত্র্যময় কোষ্ঠী তিনি আর জীবনে কখনও দেখেন নাই। গৃহে থাকিলে হয় বালক রাজা হইবে, নতুবা গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেও সমগ্র

সন্ন্যাসীর উপর নেতৃত্ব করিবে। দেবতার অংশে ইহার জন্ম। পণ্ডিত-মহাশয় কোষ্ঠীর সহিত বালকের করকোষ্ঠী মিলাইয়া দেখিতে চাহিলেন। তদনুযায়ী ভুবনমোহন নলিনীকে সঙ্গে করিয়া পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট লইয়া আসিলেন। পণ্ডিতমহাশয় তাহার করকোষ্ঠীর সহিত কোষ্ঠী মিলাইয়া আনন্দিত হইলেন ও তাহাকে নানাপ্রকার আদর করিয়া আশীর্ব্বাদান্তে বিদায় দিলেন।

জনসেবা—অতঃপর নলিনীকান্ত দারিয়াপুর এম ই. স্কুল হইতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার পর হইতে তাহার নৈতিক চরিত্রের এরূপ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল যে ব্রাহ্মণসমাজ তাহা বড়ই অপ্রীতির চক্ষে দেখিতে থাকিলেন। গ্রামে যদি কখনও কোন লোক মরে—লোক জুটিতেছে না যে তাহার সৎকার করে—ভিক্ষুক ইতর জাতি যদি পথিপার্শ্বে বা কাহারও বাড়ীতে মরিয়া পড়িয়া থাকে তবে দলপতি নলিনীকান্ত সর্ব্বাগ্রে তাহার দলবল লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া শব বহনে অগ্রসর হইত। মৃতের স্বজাতি যাহারা পূর্ব্বে অগ্রসর হয় নাই অথচ বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ হইয়া নলিনীকান্ত তাহাদের শব বহন করিলে বিশেষ অকল্যাণ হইবে এই আশঙ্কায় তাহারা মৃতের সৎকারের ব্যবস্থায় তৎপর হইত। গ্রামে দলাদলির ফলে যদি কেহ একঘরে হইল, নলিনী সর্ব্বাগ্রে বিনা নিমন্ত্রণে তাহার বাটীতে আহার করিয়া আসিল। গ্রামের বৃদ্ধগণ কোন কারণে দল পাকাইতে থাকিলে, নলিনী দলাদলির কারণ যাহাতে অন্তর্হিত হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিয়া ঐ দল ভাঙ্গিয়া ফেলিত। ইহাতে ভুবনমোহনের কোন দুঃখের কারণ না থাকিলেও নলিনী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া দেব-দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ না হইয়া যে অব্রাহ্মণের ন্যায় আচরণ করিতেছে ইহাতে অন্তরে-অন্তরে তিনি দারুণ বেদনানুভব করিতেন। কিন্তু এক বিষয়ে ভুবনমোহন অতিশয় নিশ্চিন্ত ছিলেন। গ্রামে যে সব যুবকের বিরুদ্ধে নৈতিক

চরিত্রের কুৎসিত কলঙ্কের কথা তাহার কর্ণে আসিত, নলিনীকান্ত সে-সমস্ত যুবকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ও সমুচিত উপায়ে তাহাদিগকে শাসন করিতে ত্রুটি করিত না। ইহাই ছিল তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব।

নলিনীকান্তের চরিত্রের আর এক বিশেষত্ব ছিল যে সে কখনও অন্যায় সহ্য করিতে পারিত না। অন্যায়ের প্রতিকারে উপেক্ষা তাহার নিকট অধর্ম্ম বলিয়া মনে হইত। এই অন্যায় প্রতিকার করিতে অধিকারী কি অনধিকারী তাহা বিচারশূন্য হইয়া কার্য্য করায় অনেক সময় আত্মীয়-স্বজনের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। এই অন্যায়ের প্রতিকার করিতে গিয়া হিতাহিতবিবেচনাশূন্য হইয়া অনেক সময় সে এমন কার্য্য করিয়া বসিয়াছে যে সে-সব অনর্থের হাত হইতে তাহাকে সহজে মুক্ত করা যায় নাই। একদা যখন সে গ্রামের প্রান্তভাগ দিয়া বাড়ীতে ফিরিতেছিল তখন হঠাৎ সে শুনিতে পাইল যে নিকটেই কোন এক বাড়ীতে শ্বাশুড়ী ও পুত্রবধূতে তুমুল কলহ উপস্থিত হইয়াছে। মৌখিক কলহ ক্রমশঃ রূপান্তর গ্রহণ করিল। অতিবৃদ্ধা লোলচর্ম্মা শ্বাশুড়ীর চুল ধরিয়া যুবতী পুত্রবধূ ভীষণভাবে প্রহার করিতেছে ও বৃদ্ধা কাতরভাবে প্রার্থনা জানাইতেছে। দ্বন্দ্বের কতক শুনিয়া ও কতক দেখিয়া নলিনী স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনাশূন্য হইয়া তাহাদের গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল ও পুত্রবধূকে বেশ উত্তম-মধ্যম দিয়া শ্বাশুড়ীকে তাহার হাত হইতে মুক্ত করিল। অতঃপর কর্ত্তৃপক্ষ বাড়ীতে আসিলে তাহারা সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এইরূপ অত্যাচারের প্রতিরোধকল্পে নলিনীকান্তের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু কিছুদিন পরে তাহারা নিজেরাই ত্রুটি স্বীকার করিয়া যাহাতে তাহাদের বাড়ীতে বৃদ্ধা মায়ের উপর এরূপ অত্যাচার আর না হয়, নলিনীকান্তের অভিভাবকের নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া আসিল।

অসামাজিক নলিনীকান্ত নিষ্ঠাবান্ গোঁড়া ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া দিন-দিন যেরূপ মেজাজের পরিচয় দিতে থাকিল তাহাতে ভুবনমোহনের বড় ভয় হইতে লাগিল। তাহার ব্রাহ্মণের আভিজাত্য নাই—এ ছোট, এ বড়, এ অস্পৃশ্য—মানুষে মানুষে এরূপ ভেদবুদ্ধি নাই। খুড়া হউন, জ্যেঠা হউন, অন্যায় দেখিলেই মুরুব্বিয়ানা চালে সম্পর্ক ভুলিয়া শাসন করিতে অগ্রসর হইতেছে। এমন কি কোন গুরুজনেরও চরিত্রের দোষ দেখিলে নির্লজ্জভাবে তাহার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিতেছে এবং তাহার পক্ষে এই দোষ সংশোধন করা অশোভন হইলেও সে শাসন যেন সে অবশ হইয়া মানিয়া লইতেছে। নলিনী বয়সে ছোট হইলেও তাহারা তাহার ভিতর গুরুত্ব লক্ষ্য করিতেছে। নলিনী একে উদারস্বভাব-বিশিষ্ট তাহাতে যদি আবার তাহার ভাবরাশি গণ্ডির ভিতরে আনিয়া ফেলিতে চেষ্টা করা হয় তবে হয়ত কোষ্ঠীর ফল সত্য হইয়া যাইতে পারে। হয়ত তাহাকে সত্বর বিবাহ দিলে সমস্ত আশঙ্কার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে। একটী সুন্দরী কন্যার অঞ্চলের সহিত যদি বাঁধিয়া দেওয়া যায় তবে এই সমস্ত হয়ত প্রশমিত হইয়া কোষ্ঠীর ফল মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে। এই প্রকার সঙ্কল্প স্থির করিয়া ভুবনমোহন একটী সুপাত্রীর সন্ধান করিতে থাকিলেন কিন্তু সুবিধামত সুশ্রী পাত্রী পাইলেন না। অবশেষে অবগত হইলেন যে হালিসহর-নিবাসী ৺বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুধাংশুবালা নাম্নী বিবাহযোগ্যা একটী পরমাসুন্দরী কন্যা আছে। অপূর্ব লাবণ্যময়ী বলিয়া পাড়াপড়শী সবাই তাহাকে রাণীবালা এবং বাড়ীতে তাহাকে আদর করিয়া রাণু বলিয়া ডাকিত। ভুবনমোহন নিজেই পাত্রীকে দেখিতে আসিলেন। দেখিলেন মেয়েটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ত বটেই, অধিকন্তু তাহার লজ্জাবিনম্র কণ্ঠস্বর যেন সঙ্গীতের ন্যায় সুখশ্রাব্য। এতদ্ব্যতীত পাত্রীটি দেখিয়াই স্নেহে ভুবনমোহনের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল—যেন বহুদিনের পরিচিত

উভয়ের সম্বন্ধ। মেয়েটী সুপাত্রী বটে, কিন্তু পিতৃহীনা। তাহার পিতা ৺বৈদ্যনাথ বাবু হুগলীর জজের পেস্‌কার ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী দুইটী কন্যা সহ হালিসহরের বাটীতে বাস করিতেছিলেন। অতঃপর বিবাহের কথাবার্ত্তা সত্বরই স্থির হইয়া গেল।

বিবাহ—১৩০৪ সালে ১৮ বৎসর বয়সে নলিনীকান্তের বিবাহ দিয়া ভুবনমোহন ত্রয়োদশবর্ষীয়া পুত্রবধূ সুধাংশুবালাকে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন।

গ্রামের দরিদ্র লোক উপযুক্ত বেতন দিয়া শিক্ষক রাখিতে অক্ষমতা প্রকাশ করায় ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল হইতে ওভারসিয়ারী পাশ করিয়া আসিয়া নলিনীকান্ত নিজ গ্রামের নূতন এম. ই. স্কুলে শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা-পার্টিতে অভিনয় করা ও যাত্রার অভিনয়ার্থে নাটক লেখাও চলিতে থাকিল। তিনি শৈব্যা ও বেহুলার ভূমিকার অভিনয় করিতেন। মেয়ে সাজিলে তাঁহাকে মানাইত ভাল। ভগবতীর বিবাহ নামে একখানি নাটকও তিনি লিখিয়াছিলেন। অন্যের লেখা নাটক অভিনয়ে তাহার ভাবের অন্তরায় হয় বলিয়া তিনি "তরণীসেন-বধ" নামক একখানি নাটক রচনা করিয়া নিজে তরণীসেনের ভূমিকায় অভিনয় করিতেন। এই নাটকে তাঁহার অজ্ঞাতসারে লেখনীমুখে রাবণের কতকগুলি উক্তি * যাহা তখন

---

* কে আমি ?
কোন্ স্থান হ'তে এসেছি এখানে
পূর্ব্বেতে ছিলাম কোথা—
কোন্ স্থানে যাইব পরেতে,
এ স্বপন অনুক্ষণ জাগে হৃদে।
যবে মনে হয় এ সকল কথা,

কপট অভিনয়ের বিষয় ছিল তাহা কিরূপে ক্রমশঃ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

চাকুরী গ্রহণ—যাহা হউক এইরূপ কিছুদিন যৌবনের উৎসাহ ও উদ্যম বিদ্যালয় পরিচালনায় ও যাত্রাভিনয়ের ভিতর দিয়া কথঞ্চিৎ বিকাশ করিয়া অবশেষে অর্থোপার্জ্জন প্রয়োজনবোধে চাকুরীর অন্বেষণ করিতে মনোযোগ দিলেন। এই সময় দিনাজপুর জেলা বোর্ডে একজন ওভারসিয়ারের পদ শূন্য হওয়ায় নলিনীকান্ত ঐ পদপ্রার্থী হইলে জেলা বোর্ড কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হন। দিনাজপুরে কর্ম্মে যোগদান করিবার কিছুদিন পরেই ভুবনমোহন পুত্রবধূকে দিনাজপুরে পাঠাইয়া দিলেন, কারণ যে উদ্দেশ্যে পুত্রকে এত অল্পবয়সে বিবাহ দিয়াছেন, পুত্রবধূকে বাড়ীতে রাখিলে পাছে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়! প্রকৃতপক্ষে দিনাজপুরে এই চাকুরীজীবন হইতেই নলিনীকান্তের দাম্পত্য-জীবন আরম্ভ হয়। পুত্রের মন বধূর উপরে যাহাতে আকৃষ্ট হয় ইহাই ভুবনমোহনের অভিপ্রেত ছিল। দু'জনের মধ্যে কিরূপ ভাব, দূর হইতে ইহা লক্ষ্য করিয়া তিনি পুলকিত হইতেন। তাহাদের ভাব, ভালবাসা দেখিয়া মাঝে মাঝে আশ্বস্ত হইতেন যে কোষ্ঠীর গণনা হয়তো বা সত্য নাও হইতে পারে।

অতঃপর দিনাজপুর জেলা বোর্ডে কিছুদিন কাজ করিবার পর নলিনীকান্ত জানিলেন যে রাণী রাসমণির ষ্টেটে উক্ত জেলার নারায়ণপুর কাছারীতে সুপারভাইজারের পদ শূন্য হইয়াছে। নলিনীকান্ত ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উক্ত পদপ্রার্থী হইলে ম্যানেজার তাঁহাকে ঐ পদে

বিঘূর্ণিত হয় মস্তিষ্ক আমার
হস্তপদ করে ঝিন্ ঝিন্
দুরু দুরু কাঁপে দেহ।
(হস্তলিখিত "তরণীসেন-বধ"। পরে এই পুস্তক পাওয়া যায় নাই।)

নিযুক্ত করেন ও দিনাজপুরের অন্তর্গত নারায়ণপুরে যাইতে আদেশ দেন। ঐ কাছারীতে সপরিবারে বাস করিবার কোয়ার্টারস্ ছিল। সুতরাং সপরিবারে বাস করিবার কোন অসুবিধা নাই দেখিয়া নলিনীকান্ত কিছুদিন পরে পিতার আদেশানুক্রমে স্ত্রীকে তথায় লইয়া যান। প্রায় ছয়মাস কাল তথায় বাস করিবার পর বাড়ীতে লোকাভাবে বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় পুনরায় স্ত্রীকে কুতবপুরে রাখিয়া আসিলেন। স্ত্রীকে বাড়ীতে রাখিয়া যাইবার পর প্রায় তিন মাস অতীত হইয়াছে এমন সময় একদা রাত্রে তিনি নিজের শয়নগৃহে শয্যার উপর বসিয়া জমিদারী সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। তখন রাত্রি অনুমান ৮টা। সম্মুখে একটা বড় আলো জ্বলিতেছিল।

স্ত্রীর ছায়ামূর্ত্তি দর্শন—অকস্মাৎ আলোটা যেন নিষ্প্রভ হইয়া গেল। কেহ আলোটা কমাইয়া দিল কিনা দেখিবার জন্য তিনি মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন। গৃহের ভিতর যে টেবিলটার নিকট তাঁহার স্ত্রী আসিয়া দাঁড়াইতেন ঠিক সেইখানে সেই টেবিল ধরিয়া তাঁহারই ছায়ামূর্ত্তি—মুখখানা অতীব বিষাদমলিন। নলিনীকান্ত অত্যন্ত ভয়ার্ত্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্ত্তিও মিলাইয়া গেল। চাকর পাচক প্রভৃতি দৌড়াইয়া আসিলে নলিনীকান্ত ওসব বিষয়ে কিছু বলিলেন না। কিন্তু তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে তাঁহার স্ত্রী আর বাঁচিয়া নাই। গত আষাঢ় মাসে তাঁহাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পর কোনও অসুখ হইলে অবশ্যই সংবাদ পাইতেন। আগামী ৺শারদীয়া পূজার আর মাত্র ২০।২২ দিন বাকী। ভাবিলেন এখনই যাইবেন। কিন্তু পূজার পূর্ব্বে হাতে অনেক কাজ। চৌদ্দজন আমিনের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার তাঁহার উপর। প্রত্যূষেই জরুরী কাজের জন্য তাঁহাকে দিনাজপুর যাইতে হইবে। সুতরাং এমতাবস্থায় ইচ্ছা থাকিলেও কাজের চাপে বাড়ী

যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। মনের ভিতর একটা প্রবল আন্দোলন চলিতে লাগিল। অবশ্য তিনি পরকাল মানেন না, অতি শৈশব হইতে তাঁহার দৃঢ় ধারণা, মৃত্যুর পর দেহের সহিতই সমস্ত শেষ হইয়া যায়।

সুতরাং এ ছায়ামূর্ত্তি তাঁহার মানসিক দুর্ব্বলতাপ্রসূত নহে ত? তাঁহাকে যে বরাবরই ঐরূপভাবে ঠিক ঐ স্থানে দাঁড়াইতে দেখিয়াছেন, সুতরাং সংস্কারবশে অকস্মাৎ মনের খেয়ালে ঐরূপ দেখেন নাই ত? একি মনের ভ্রান্তি? যদি পূর্ব্বের সংস্কার তাঁহার মনের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে তবে মন যাহা ভাবিবে চোখে ত সেইরূপই দেখা যাইবে। সুতরাং আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। এবং তাহা হইলেই পরকালের বা পরলোকের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারা যায়। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার স্ত্রী যে বাঁচিয়া নাই এইরূপ অমঙ্গল চিন্তা করা এবং কল্পনা করাও অসমীচীন বিধায় উহা নলিনীকান্তের পক্ষে অপ্রীতিকর ও অসুখকর বলিয়াই তাঁহার মন মাঝে মাঝে অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। যদি এখন বাড়ী যান ও গিয়া দেখেন যে তিনি আর ইহজগতে নাই—তা'হলে? ভাবিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। অসম্ভব সে চিন্তা। মানসিক ভ্রান্তি বা দৃষ্টিভ্রম বলিয়াই মন হইতে ঐ চিন্তা উড়াইয়া দিয়া মন দৃঢ় করিলেন। ২।৩ দিন পরে দিনাজপুর হইতে নারায়ণপুর কাছারীতে ফিরিয়া আসিয়া পত্র পাইলেন যে বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রীর অসুখ। তখন মনটা পুনরায় কেমন যেন বাঁকিয়া বসিল—ভাবিলেন তা'হলে তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কি সে তাঁহাকে দেখা দিয়া গেল? কিন্তু পরলোক বা পরকাল কিছু না থাকিলে ত তাহার দেখা দেওয়া সম্ভব নয়। কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল। যদিও মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল, হয়ত বা আছে, কিন্তু যখন অসুখের সংবাদ আসিয়া পৌছিয়াছে তখন অসুখের এবং মৃত্যুর সহিত কেমন যেন একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যদি তাহাই হয় তবে যাওয়ার চেয়ে না যাওয়াই

ভাল। কারণ প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকে কেহ স্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদ দিতে আসিবে না এবং তিনি বাঁচিয়া আছেন, এই ক্ষীণ আশাও হৃদয়ের এক কোণে থাকিয়া যাইবে। স্থির করিলেন, এ সম্বন্ধে কাহাকেও কোন প্রশ্ন করা হইবে না। কাহাকেও পত্র লেখা হইবে না। তিনি বাঁচিয়া আছেন ইহা ভাবা তাঁহার পক্ষে সহজ নতুবা সব যেন গণ্ডগোল হইয়া যায়। অতঃপর স্থির করিলেন পূজার সময় ভিন্ন তৎপূর্ব্বে বাটীতে যাওয়া হইবে না। তখন যাহা হয় প্রত্যক্ষ হইবে।

স্ত্রী-বিয়োগ সংবাদ—অতঃপর কোনক্রমে ২০।২২ দিন কাটিয়া গেল, পূজা আসিয়া পড়িল, নলিনীকান্ত বাড়ী রওনা হইলেন। চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে নামিয়া অদূরে খেয়া-ঘাটে আসিয়া নদী পার হইলেন। দেখিলেন তাঁহাদের গ্রামের এক গাড়োয়ান গরুর গাড়ী লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। নলিনীকান্তকে দেখিয়া উক্ত গাড়োয়ান নিকটে আসিয়া বলিল যে তাঁহার এক ভগ্নীপতির আসিবার কথা আছে সেজন্য বাড়ী হইতে তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। অনন্তর একথা সেকথা বলিবার পর অতি দুঃখিত-স্বরে যে সংবাদটি শুনিতে তিনি মোটেই ইচ্ছুক নহেন সেই সংবাদটী গাড়োয়ান বলিয়া ফেলিল—তিন দিনের জ্বরে আজ ২০।২২ দিন হইল বড়ঠাকুরের স্ত্রী মারা গিয়াছেন। নলিনীকান্তের আপাদমস্তক যেন কেমন ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল, তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, গাড়ীতে গিয়া বসিলেন, কেমন এক অননুভূতপূর্ব্ব বিষাদভাব তাঁহার ভিতরে জাগিয়া উঠিল। অবশেষে ছায়ামূর্ত্তি দর্শন সত্য বলিয়া মনে ধারণা হইল—সেও ত এই ২০।২২ দিনের ঘটনা। মনে এইরূপ চিন্তা চলিতেছে এমন সময় ভগ্নীপতি আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গরুর গাড়ী খটাশ্ খটাশ্ করিয়া চলিতে লাগিল। ভগ্নীপতি মনের আনন্দে যাইতেছেন শ্বশুরবাড়ী—তাঁহার সবেমাত্র বিবাহ হইয়াছে,—কত কল্পনার ছবি তাঁহার মনের ভিতরে ফুটিয়া

উঠিতেছে, তিনি তাহা কোনমতেই চাপা দিতে পারিতেছেন না। নলিনীকান্ত সম্পর্কে তাঁহার শ্যালক, সুতরাং তাঁহার আদিরসাত্মক ভাবের বিনিময় করিয়া কিছু রসাস্বাদন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নলিনীকান্তের ঠিক তার বিপরীত ভাব—নৈরাশ্যের অবসাদ গোটা বুকখানা চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার বাক্‌রোধ করিয়া দিয়াছে। উভয়ের ভাবের মিল হইল না। এখনও রাত্রি আছে। দীর্ঘ ১৬ মাইল পথ অতিবাহন করিয়া যাইতে হইবে। ভোর হইলেই যে কোন অজুহাতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতে পারেন। একে ত রাত্রিকাল—রাস্তার উভয় পার্শ্বে লোকজনের বসতি নাই। তারপর বাঘের ভয় ত আছেই। সুতরাং তিনি নিশাবসানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কয়েক ঘণ্টা পরে মেহেরপুর আসিয়া ভোর হইলেই গরুর গাড়ীতে বসা বড় কষ্ট এই অজুহাতে নলিনীকান্ত গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাঁটিয়া যাইতে লাগিলেন। বেলা ৮॥ টার সময় কুতুবপুরে পৌঁছিলেন। কুতুবপুরে যে-ই তাঁহাকে প্রথম দেখিল সে-ই তাঁহার অনুগমন করিতে থাকিল। একজন, দুজন, তিনজন করিয়া ক্রমশঃ ২৪।২৫ জন লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। কিন্তু কেহ তাঁহাকে কিছুই বলিল না। স্ত্রীলোকগণ তাঁহাকে দেখিয়া কিছু না বলিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল। যাহারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল তাহারা মনে করিতেছিল যে নলিনীকান্ত বাড়ীতে গিয়া কি একটা কাণ্ডই না করিবে! তাহাদের ভিতর আবার কাহার কাহারও মনে তাঁহাকে প্রবোধ দিবার চিন্তাও জাগিতেছিল কিন্তু ক্রমশঃ যতই লোক জমিতে লাগিল নলিনীকান্তের মন ততই দৃঢ় হইতে থাকিল। অবশেষে তিনি বাটীতে পৌঁছিয়া বহির্ব্বাটীতে বসিলেন। কত লোক কত কথা বলিতে লাগিল—উহার চেয়ে ভাল বউ পাওয়া যাইবে—অমন কি আর জুটিবে না, এই মাসের ভিতরই বিয়ে দিব। প্রতিবাসিনীগণ বলিতে লাগিল—অমুকের

কেমন সুন্দরী মেয়ে আছে—তারা দিতে চাচ্ছে—অমুক গ্রামের অমুকের মেয়ের সম্বন্ধ নিয়ে ঘটক এসেছিল—যে গেছে সে গেছে, আর এমন কি-ই বা গুণবতী ছিল—সে কি আমাদের ছেলের যোগ্য মেয়ে ছিল গা, ইত্যাদি নানা কথা বলিবার পর যে যার বাড়ী চলিয়া গেল। কথাগুলি নলিনীকান্তের মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিতে লাগিল। সত্যই কি তাই? মানুষে মানুষে সম্বন্ধ জীবনাবধি হইলেও তাহার প্রীতিময়ী স্মৃতিটা ঠেলিয়া ফেলা যেন খুব নির্ম্মম বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। যাহা হোক লোকজন যখন দেখিল কিছু ঘটিল না, তখন সকলেই যে যার বাটীতে চলিয়া গেল। যদু পোদ্দার কিন্তু কিছুতেই উঠিল না। নলিনীকান্তের সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গও এখন নলিনীকান্তের অভিপ্রেত ছিল না। তিনি একটু নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহার স্ত্রীর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে ও শুনিতে চান। অবশেষে যদু পোদ্দারকে এড়াইয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া একাকী গভীর ভাবে তাহার বিষয় চিন্তা করিতে থাকিলেন। তখন সন্ধ্যাবেলা —দেবীর সপ্তমী তিথির পূজার আরতির বাজনা বাজিতেছে, আর সেই বাজনা যেন নলিনীকান্তের বুকের ভিতর আঘাত করিতেছে। সেই ঘর, তাহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সবই পড়িয়া রহিয়াছে। তার স্মৃতি উক্ত দ্রব্যাদির সঙ্গে সমস্তই যেন জড়িত রহিয়াছে। শুধু সে নাই। যেন সব স্বপ্ন—দু'দিনের সুখের ঘর আপনিই ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু কোথায় সে? মৃত্যুর পর সবই কি শেষ হইয়া যায়, না তার কিছু অবশিষ্ট থাকে? যদি না থাকে তবে তাহার ছায়ামূর্ত্তি দেখিলেন কেন? যদি পরলোক থাকে তবে তার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিবেন। তার অন্তিমকালে একটী কথাও তিনি শুনিতে পান নাই। নলিনীকান্তের মনের ভিতর যখন এই চিন্তাপ্রবাহ চলিতেছে তখন একটা ঝুন্ ঝুন্ শব্দ শুনিতে পাইলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী পায়ের

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে যে ঘুঙ্গুর পরিধান করিতেন এবং চলিবার সময় তার যেরূপ শব্দ হইত এ শব্দও ঠিক তদ্রূপ। কেহ যেন আস্তে আস্তে আসিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইল—শব্দও থামিয়া গেল। নলিনীকান্ত স্ত্রীকে যেন পার্শ্বে অনুভব করিতে লাগিলেন। তারপর আর কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার বিস্ময়ের উপর বিস্ময় জন্মিল, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। স্ত্রীর বিয়োগ সম্বন্ধে কাহারও নিকট কিছু শুনিবার সুবিধা হইল না। পিতা ভুবনমোহন বধূকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন ; তাহার বিয়োগে তিনি পথে পথে স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদিয়া বেড়াইতেন, সময়ে আহার করিতেন না, সময়ে স্নান করিতেন না। তিনি যেন পাগলের ন্যায় হইয়া গিয়াছিলেন সুতরাং তিনি কিছুই বলিলেন না। স্ত্রীর বিয়োগ সম্বন্ধে কেহ যদি বিনা প্রশ্নে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিয়া তাঁহার নিকট নির্জ্জনে বসিয়া কিছু বলে, তবে তাহা শুনিতে নলিনী রাজী আছেন। মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, কাহার কাছে ইহা জিজ্ঞাসা করা যায়? নলিনীকান্তের এক কাকীমা নলিনীর সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। তিনি নলিনীকে নির্জ্জনে পাইয়া কাছে আসিয়া বসিলেন এবং পুত্রবধূর মৃত্যু সম্বন্ধে বলিতে গিয়া আবেগভরে নিঃশব্দে কাঁদিতে থাকিলেন এবং ধীরে ধীরে বলিলেন, "তিনদিনের জ্বরে বউমা নিস্তব্ধ হ'য়ে গেছিল— তোর নাম শুন্‌লেই কেবলমাত্র সে সাড়া দিত নচেৎ নয়—তিন দিন পরেই সে আমাদিগকে ছেড়ে গেল। যখনই তার সাড়া পাবার চেষ্টা করেছি, তোর নাম বলেছি—তখনই সে চোখ চেয়েছে।" কাকীমা প্রাণের আবেগে কাঁদিতেছিলেন—সে দৃশ্য নলিনীকান্তের ভিতর হইতে অশ্রুস্রোত টানিয়া বাহির করিল। তখন আর তিনি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। কাকীমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিঃশব্দে উভয়ে কিছুক্ষণ কাঁদিলেন। অবশেষে যেটুকু বলার বাকী ছিল সেটুকুও কাকীমা

বলিলেন, "বউমা তোকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছে।" মৃত্যুর সময় যখন দশেন্দ্রিয় ছেড়ে যেতে থাকে তখন লোকের বাহ্যজ্ঞান থাকে না, কিন্তু যে প্রেমিকা—সে তাহার স্বামীর ভাগ কাউকে দিতে চায় না। নলিনীকান্ত সেই সমস্ত শুনিয়া আরও কাঁদিলেন। সেই দিনই মাত্র তার জন্য অশ্রুবর্ষণ করিয়া আবার মনকে দৃঢ় করিলেন। নবমী গেল, দশমী গেল, দেবী-প্রতিমা বিসর্জ্জন হইয়া গেল—নলিনীকান্ত নিজের ভিতর ভাবান্তর আনিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। নিজের হৃদয় হইতে প্রিয়তমা পত্নীর চিত্র অশ্রুর সঙ্গে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়া গ্রামবাসী সমবয়স্কদের সঙ্গে বেড়াইতে থাকিলেন।

দ্বিতীয়বার ছায়ামূর্ত্তি দর্শন—একদিন বাড়ী ফিরিতে রাত্রি প্রায় দশটা হইয়া গেল। অন্ধকার রাত্রি—গ্রামের ভিতর দুপাশে গাছতলা দিয়া সরু পথে বাড়ীর দিকে আসিতেছেন, হঠাৎ শিমূলতলায় আসিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন তাঁহার স্ত্রীর সেই ছায়ামূর্ত্তি—মুখখানি অতীব বিষাদমলিন। আজ নলিনীকান্তের শরীরটা কেমন যেন ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। তিনি ত্বরিত পদে গৃহে ফিরিলেন এবং পরকালের অস্তিত্বের বিষয় আর মন হইতে ঠেলিয়া ফেলিতে পারিলেন না। মনে করিলেন সত্বরই দিনাজপুর কর্ম্মস্থলে যাইয়া পরলোকতত্ত্ববিদের কাছে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যদি কোনও উপায় থাকে, তবে সেই উপায়ে তাহার অনুসন্ধান এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ করিতেই হইবে। কেন সে আসে—কি বলিতে চায়—ইহা অবশ্যই জানিতে হইবে। সুতরাং তিনি এ সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পরদিন কার্য্যস্থলে রওনা হইলেন।

স্ত্রীর জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিদর্শন—দিনাজপুরে আসিয়া কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন ও অবসর সময়ে সাধু সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণ যাঁহারা পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু সংবাদ রাখেন তাঁহাদের নিকট অনুসন্ধান

করিতে থাকিলেন। এমন সময় আবার একদা রাত্রে সেই ছায়ামূর্ত্তি নলিনীকান্তের সম্মুখে প্রকট হইল—এবার ঠিক ছায়ামূর্ত্তি নহে—দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি। পূর্ব্বের ন্যায় বিষাদের রেখামাত্র নাই। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই আনন্দময়ী মূর্ত্তি মিলাইয়া গেল। একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার এই ছায়ামূর্ত্তি দর্শনে পরলোক যে একটা আছে এ-বিষয়ে তাঁহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। লোকের আত্মীয়-স্বজন মরিয়া যায়, কিন্তু কে সেই পরলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিরহ বিধুরের স্মৃতি পুনরায় জাগাইয়া দিয়া বঞ্চিতকে অধিকতর কাতর করিয়া থাকে? এ পরলোকতত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিতে হইবে—এ রহস্য-জাল ভেদ করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইতেই হইবে। নানাপ্রকার লোকের নিকট অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলেন যে কলিকাতায় থিওসফিক্যাল্ সোসাইটীতে এই পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু গবেষণা চলিয়া থাকে এবং তাঁহারা পরলোক হইতে আত্মা আনিয়া তাহাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিয়া পরলোক সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। সুতরাং কলিকাতায় যাইয়া এ সমস্ত বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করিতে হইবে ভাবিতেছিলেন—ঠিক এমনি সময়ে তাঁহার সে সুযোগ উপস্থিত হইল। সদর হইতে খুলনা জেলার অন্তর্গত কুমিরা নামক স্থানে বদলি হইবার হুকুম আসিল। তিনি অবিলম্বে কুমিরা যাত্রা করিলেন।

পরলোক-তত্ত্বানুসন্ধানে মাদ্রাজ গমন—কুমিরায় যাইবার পথে কলিকাতায় আসিয়া কি প্রকারে মৃত ব্যক্তির আত্মা আনা যায় এবং কি প্রকারে কোথায় গিয়া সেই কৌশলাদি শিক্ষা করা যায় ইত্যাদি বিষয় অবগত হইয়া তিনি কুমিরায় গিয়া চাকরীতে যোগদান করিলেন। মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া থিওসফিক্যাল সোসাইটীর সভ্যদের সহিত আলাপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর অবগত হইলেন যে পরলোকতত্ত্ব প্রত্যক্ষভাবে জানিতে হইলে তাঁহাকে মাদ্রাজ সহরের নিকট এডিয়ারের থিওসফিক্যাল শাখাশ্রমে কিছুদিন রেভারেণ্ড লেড্‌বিটারের নিকট থাকিয়া এ বিষয়ে শিক্ষা করিয়া আসিতে হইবে। নলিনীকান্ত দুই মাসের ছুটী লইয়া মাদ্রাজে চলিয়া গেলেন। এডিয়ারে রেভারেণ্ড লেড্‌বিটারের নিকট অবস্থান করিয়া মৃতব্যক্তির আত্মা আনিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিলেন। কিন্তু আত্মা আনিবার যে সমস্ত কৌশল শিক্ষা করিলেন তাহা অসম্পূর্ণ বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। উক্ত সোসাইটীতে যাহা শিক্ষা করিলেন তাহাতে বুঝিলেন যে ঐ প্রণালীতে পরলোকতত্ত্বাংশ মাত্র তাঁহারা জানিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাহাও সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষভাবে বলা যায় না। কারণ মৃতাত্মাকে কোনও মিডিয়ামের ভিতর আনিয়া তাহার নিকট প্রশ্ন দ্বারা ঘটনাবলী জানিতে হয়। থিওসফিক্যাল সোসাইটীতে যে বিদ্যা অর্জ্জিত হয় তদ্দ্বারা মৃতাত্মাকে আকর্ষণে ভৌতিকমূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইয়া আনয়ন করা এবং প্রত্যক্ষভাবে তাহার সূক্ষ্মদেহের সহিত বাক্যালাপ করা অসম্ভব। সুতরাং অনেক স্থলে মিডিয়ামকে সম্মোহিত করিয়া তাহার ভিতর মৃতাত্মাকে আনা যায় ইহা সত্য এবং নলিনীকান্ত তাঁহার স্ত্রীর

আত্মাকেও তদ্রূপে আনয়ন করিয়া বহুপ্রকার প্রশ্নোত্তরে সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং মনে করিয়াছেন যে তাঁহার মৃত পত্নীর আত্মাই আসিয়াছে। যে সমস্ত গুপ্ত ঘটনার বিষয় তিনি মিডিয়ামকে প্রশ্ন করিয়া তাহার ঠিক ঠিক উত্তর পাইয়াছেন তাহা মাত্র তাঁহার স্ত্রীই অবগত ছিলেন। কিন্তু এইরূপ মিডিয়ামের ভিতরে আত্মা আনা গেলেও প্রতিবার মৃতাত্মা নাও আসিতে পারে, কারণ সম্মোহনের বলে মিডিয়ামকে ঘুম পাড়াইয়া দিলে অর্থাৎ অবচেতন অবস্থা (subconscious state) আনয়ন করিলে ঐ মিডিয়ামের নিজের আত্মার শক্তি জাগিয়া যায় এবং অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি হওয়ায় ঐ শক্তির বলেই সে প্রশ্নকর্ত্তার সমস্ত গুপ্ত কথার উত্তর দিতে সক্ষম হয়। থিওসফিক্যাল সোসাইটী এই মৃত আত্মাকে মিডিয়ামের ভিতর আনয়ন করিবার শক্তিটুকু মাত্র আয়ত্ত করিয়াছেন। তদতিরিক্ত কিছু অর্থাৎ প্রত্যক্ষ মৃতের সূক্ষ্মদেহের সহিত সাক্ষাৎ আলাপ করিবার কোন পন্থা না পাইয়া দুইমাস পরে তিনি এডিয়ার হইতে ফিরিয়া পুনরায় খুলনা জেলার অন্তর্গত কুমিরায় আসিয়া চাকরীতে যোগদান করিলেন।

বিন্ধ্যাচলের পূর্ণানন্দ স্বামীর উপদেশ—কুমিরায় থাকিয়া কার্য্য করিবার সময় তিনি কলিকাতায় কখন কোন্ বড় সাধু আসেন তাহার খোঁজ রাখিতেন। একদা তিনি শুনিলেন যে পূর্ণানন্দ স্বামী কলিকাতায় আসিয়াছেন। পূর্ণানন্দের পূর্ব্বাশ্রমের নাম পূর্ণচন্দ্র দত্ত এবং ইনি ডাফ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। পরে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া বিন্ধ্যাচলে আশ্রম করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং তৎকালে সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি জন্মিয়াছিল। সুতরাং নলিনীকান্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায় কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখেন যে বহুলোক তাঁহার নিকট বসিয়া আছেন। সুতরাং

তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করা সুদূরপরাহত। বিশেষতঃ তিনি যে কথা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন তাহা সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর কথা হইতে কিছু স্বতন্ত্রভাবের। সবাই আসিয়াছে কি করিয়া ভগবান লাভ হয়, কি করিয়া জ্ঞানলাভ হয় ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার কাছে সন্ধান লইতে। কিন্তু তিনি যে বিষয় লইয়া আসিয়াছেন তাহা তাঁহাকে বলাও বড় লজ্জাকর—এ যে অতি ছোট বিষয়! তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। আবার ভাবিলেন সাধু-সন্ন্যাসীর অন্যের মনোভাব বুঝিবার শক্তি আছে। ইনি যদি প্রকৃত মহাপুরুষ হ'ন তবে অবশ্যই তাঁহার মনোভাব বুঝিতে সক্ষম হইবেন ও তাঁহাকে এ বিষয় বলিবেন। সুতরাং এই প্রকার চিন্তা করিয়া তাঁহাকে কিছুই বলিলেন না। সবাই উঠিয়া পড়িল, তিনিও উঠিলেন। আবার মনে ভাবিলেন যে হয়ত তিনি সাধুকে প্রণাম করেন নাই তাই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। যে আসিতেছে সে বিনা বিচারে তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে। কেবলমাত্র তাঁহাতেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। আবার এ চিন্তাও মনে জাগে যে তিনি ব্রাহ্মণ আর পূর্ণানন্দ স্বামী কায়স্থবংশসম্ভূত সুতরাং ব্রাহ্মণ হইয়া কি প্রকারে তাঁহাকে প্রণাম করা যায়? যা' হক প্রথম দিন দর্শনের পর এইরূপ বিচার চলিতে থাকিল। পুনরায় পরদিন তাঁহার নিকট গিয়া বসিলেন, কিন্তু মানসিক চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি বাহ্যিক-ভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিলেন না। তথায় নানা লোকের সহিত পূর্ণানন্দের নানা প্রসঙ্গের কথাবার্ত্তার পর সময় হইলে সবাই উঠিয়া পড়িল। নলিনীকান্তও উঠিলেন। কোনরূপ সুযোগ-সুবিধা করিতে পারিলেন না। তৎপরদিন পুনরায় তাঁহার নিকট গিয়া উপবেশন করিলেন। অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও বহুলোক তাঁহার নিকট সৎপ্রসঙ্গ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তাঁহার মীমাংসা করিতেছেন এইরূপ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর পূর্ণানন্দ সবাইকে বলিলেন যে

অদ্য তাঁহার কিছু কাজ আছে। সুতরাং তাহাদের সহিত বেশীক্ষণ কথা বলিতে পারিবেন না, বরং তাহারা যেন পরদিন আসে। সকলেই উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে নলিনীকান্তও উঠিয়া পড়িলেন। এমত সময় পূর্ণানন্দ স্বামী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ওহে ছোক্‌রা! তুমি ব'স। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। তোমার বাসা ত নিকটেই।"

নলিনীকান্ত কিছু বিস্মিত হইলেন কারণ সত্যই ত তাঁহার বাসা নিকটে। কিন্তু তাহা তিনি কি প্রকারে বুঝিলেন? সুতরাং ইনি নিশ্চয়ই সাধুপুরুষ সন্দেহ নাই। তাঁহার মনোগত কথা তিনি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন। নতুবা সবাইকে উঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন কেন? এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় বসিয়া পড়িলেন। অন্যান্য সবাই যখন চলিয়া গেল, তখন পূর্ণানন্দ বলিলেন, "ক'দিন থেকে তোমাকে আসা যাওয়া করতে দেখ্‌ছি। তোমার কি বোল্‌বার আছে বল।"

নলিনী। আমার যা বলিবার আছে তাহা জনসাধারণ যে-সব জ্ঞাতব্য বিষয় লইয়া সাধুদের কাছে আসে তাহা অপেক্ষা কিছু স্বতন্ত্র ধরণের।

পূর্ণানন্দ। বেশ ত'! তুমি নিঃসঙ্কোচে বল।

নলিনী। ভগবান কি, কিভাবে তাঁকে পাওয়া যায় এ সব আমি আপনার নিকট জানিতে চাহি না। কারণ উহা আমি বিশ্বাস করি বা না করি, ভগবান আমার লক্ষ্য নহে।

পূর্ণানন্দ। সবারই যে ভগবান পাওয়া লক্ষ্য হবে, তাহার কিছু অর্থ নাই।

নলিনী। আমি পরলোক, পরকাল বা পুনর্জন্ম কিছু মানি না। কিন্তু আমার স্ত্রী-বিয়োগের পর আমি তাহাকে তিনবার দর্শন করিয়াছি সুতরাং পরলোক সম্বন্ধে আমার মতের কিছু পরিবর্ত্তন হওয়ায় মনে

একটু একটু বিশ্বাস জন্মিতেছে। যাহাকে হারাইয়াছি সে-ই আমাকে প্রত্যক্ষভাবে পরলোক দেখাইয়াছে। পরে এই তত্ত্ব জানিবার জন্য মাদ্রাজে জনৈক ব্রহ্মবিদের নিকট কিছুকাল অবস্থান করিয়া পরলোক সম্বন্ধে কিছু শিখিয়াছি। কিন্তু মিডিয়ামের ভিতরে মৃতাত্মাকে আনিয়া তৃপ্তিবোধ করিতে পারি নাই। মিডিয়ামের ভিতরে প্রতিবারই যে মৃতাত্মা আসিবে তাহার কোন প্রমাণ নাই। এইরূপাবস্থায় আমি আমার পরলোকগতা স্ত্রীর সহিত প্রত্যক্ষভাবে বাক্যালাপ করিতে চাই। আপনাদের শাস্ত্রাদিতে যদি এইরূপ কিছু থাকে যে সাধনার দ্বারা তাহাকে চাক্ষুষভাবে আনা যায়, আমি তাহাই মাত্র জানিতে চাই।

পূর্ণানন্দ। দেখ, আজ অনেক রাত্রি হইয়াছে। কাল তোমার সহিত এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিব। তুমি দ্বিপ্রহরে এস, তখন কেহ থাকিবে না, তোমাকে এ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিব।

নলিনী। আপনার দয়া। কিন্তু একটী কথা—আমি আপনার নিকট কিছু অপরাধী।

পূর্ণানন্দ। কিসে?

নলিনী। আমার ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি আপনাকে প্রণাম করিতে পারি নাই। যে-ই আসিতেছে সে-ই আপনাকে প্রণাম করিতেছে। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ, আর আপনি কায়স্থ। সুতরাং আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও আপনাকে প্রণাম করিতে পারি নাই। এটা একটা অপরাধ বলিয়া আমার মনে হইতেছে।

পূর্ণানন্দ। তুমি ঠিকই করিয়াছ। ইহাতে কিছু অপরাধ হয় নাই। নিজে না বুঝিয়া কোন অবস্থায়ই আত্মগৌরব নষ্ট করা উচিৎ নহে।

নলিনীকান্ত পূর্ণানন্দের সহিত আলাপে বিশেষ আশ্বস্ত হইয়া বাসায় ফিরিয়া গেলেন এবং তিনি যে একটা প্রকৃত পন্থার সন্ধান পাইতে পারিবেন ইহাও তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিল। কোনক্রমে সে রাত্রি বিশেষ

ব্যগ্রতা ও অস্থিরতার সহিত অতিবাহিত করিয়া পরদিন দ্বিপ্রহরে তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন। নলিনাকান্তের সহিত পূর্ণানন্দের উক্ত বিষয় লইয়া বহুক্ষণ আলোচনা হইল। অবশেষে তিনি বলিলেন, "তোমার স্ত্রীকে পৃথক্‌ভাবে উপাসনা বা আরাধনা করিয়া পাইবার কিছু উপায় আমি জানি না। তবে আমি যাহা তোমাকে বলিতে পারি তাহা জগজ্জননীর আরাধনা করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করা। জগতের যে কোন নারীই জগজ্জননীর অংশভূতা—তোমার স্ত্রী তাঁহাতেই মিশিয়া গিয়াছেন। তুমি যদি জগজ্জননীকে আরাধনা করিয়া সাক্ষাৎকার করিতে পার তবে তোমার স্ত্রাকে সহজেই পাইতে পার। তোমার স্ত্রীকে পৃথক্‌ভাবে উপাসনা করিয়া আনিবার পন্থা আমি জানি না। জগজ্জননীকে আরাধনা করিয়া জানিতে পারিলে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। স্ত্রীকে ত পাইবেই উপরন্তু জগজ্জননীকেও জানিতে পারিবে * * *।

নলিনীকান্ত। জগজ্জননীকে পাওয়ায় আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আমি আমার স্ত্রীকে পাইব বলিয়াই জগজ্জননীর সাধনা করিতে প্রস্তুত আছি। সুতরাং তার সাধন-প্রণালী আমাকে বলিয়া দিন।

পূ। তদ্রূপ দীক্ষা লইতে হইবে।

ন। বেশ, আমাকে দীক্ষা দিন।

পূ। আমি তোমার গুরু নহি। গুরু অনুসন্ধান করিয়া লও ও তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়া মহাশক্তির সাধনায় প্রবৃত্ত হও। জগজ্জননীই এই মহাশক্তি।

অতঃপর নলিনীকান্ত স্বামী পূর্ণানন্দের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কুমিরায় কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

মন্ত্রপ্রাপ্তি—একজন প্রকৃত সাধুর সংস্পর্শে আসিয়া স্ত্রীর চাক্ষুষ দর্শন লাভ করিবার প্রকৃত পন্থা অবগত হওয়ায় মনে একটা আশার সঞ্চার হইল। আহারাদি সম্পন্ন করিয়া মনের আনন্দে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। গভীর রাত্রে হিমাংশুর করসম্পাতে নিদ্রাভঙ্গ হইল। চোখ চাহিলেন—জ্যোৎস্নালোকে যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন।

দেখিলেন সম্মুখে জটাজূটবিমণ্ডিত দীর্ঘাকার এক সন্ন্যাসী—সস্মিত মুখমণ্ডল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "দীক্ষা নাও"। "দীক্ষা নাও" বলাতেই নলিনীকান্ত বাহু প্রসারিত করিয়া হাত পাতিলেন, যেন দীক্ষা হাত পাতিয়াই লইতে হয়। সন্ন্যাসী তাঁহার হাতের ভিতর কিছু দিলেন; কি দিলেন, কি করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। যন্ত্রচালিতবৎ শয্যা হইতে উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দ্রব্যটী দেখিতে গেলেন। দেখিলেন একটী বিল্বপত্রে রক্তচন্দনে একটী বীজমন্ত্র লেখা। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন—সন্ন্যাসী নাই। তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পুনরায় শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন; "হায় হায় কি করিলাম, কেন প্রদীপ জ্বালিতে গেলাম, তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না"—এইরূপ অনুতাপে রজনীর অবসান হইল। প্রাতে কয়েকজন ঘনিষ্ঠ লোককে এ সম্বন্ধে জানাইলেন। তাঁহারা বলিলেন উহা স্বপ্ন। কিন্তু নলিনীকান্ত স্বপ্নের সহিত ঘটনাটীকে খাপ খাওয়াইতে পারিলেন না। কারণ স্বপ্ন যদি হইবে, তবে বিল্বপত্রে রক্তচন্দনে বীজমন্ত্র কি প্রকারে আসিল এবং প্রদীপই বা কেন জ্বালিলেন? সবাই স্বপ্ন বলিয়া উহা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু এই ঘটনা যে স্বপ্ন

ইহা কিছুতেই নলিনীকান্ত বিশ্বাস করিলেন না। ইহা তাঁহার জীবনের এক প্রত্যক্ষ অতি মহান্ দৈব ঘটনা বলিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইল। তিনি কিছুদিনের জন্য ছুটীর দরখাস্ত করিয়া এই দৈবঘটনার প্রকৃত রহস্য জানিবার উদ্দেশ্যে পুনরায় কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

তান্ত্রিকগুরু অনুসন্ধান—কলিকাতায় আসিয়া বেলুড়মঠে ও পরে চট্টগ্রামের পূর্ণানন্দ স্বামীর নিকট গমন করিলেন। কিন্তু কোথাও নলিনীকান্ত ব্যক্তিগত সাধনার কোন সুবিধা দেখিলেন না। অতঃপর যশোহরের অন্তর্গত ইতনা নামক স্থানে এক সাধু আসিয়াছেন শুনিয়া সেখানে গেলেন। সেখানে গিয়া দেখেন যে তিনি বৈষ্ণব সাধক। কিন্তু তিনি যাহা পাইয়াছেন তাহা শক্তিমন্ত্র। সুতরাং তাঁহার কাছে বিশেষ কিছু লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া পুনরায় কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় আসিবার কিছুদিন পরে শুনিলেন যে বারাকপুরের নিকট চানক নামে এক গ্রামে সম্প্রতি একজন বড় সাধু আসিয়াছেন। নলিনীকান্ত আর কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিলেন। চানকে গিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে বিস্ময়বিমূঢ় হইলেন। সাধুটীর প্রসন্ন ও গম্ভীর মুখমণ্ডল; বিশুদ্ধ হিঙ্গুলের ন্যায় তাঁহার বর্ণ, তেজঃপূর্ণ বলিষ্ঠ তাঁহার শরীর। এক বৃক্ষনিম্নে তিনি বসিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে ৭।৮টী যুবতী; কাহারও বয়স ১৭ কাহারও বা ১৮ কিন্তু কাহারও কুড়ির উপর নহে। সবাই তাঁহার সেবার জন্য ব্যস্ত। কেহ ভিক্ষা করিয়া লইয়া আসিল—কেহ বা বাজার করিয়া আনিল। কেহ রন্ধন করিতে ব্যস্ত—কেহ বা তাঁহার অঙ্গে তৈল মর্দ্দনে রত, আবার কেহ বা স্নান করাইবার জন্য জল তুলিতেছে। তিনি কাহাকেও কোন আদেশ করিতেছেন না, সবাই যন্ত্রবৎ কার্য্য করিয়া যাইতেছে। সাধুটী বৃক্ষনিম্নে বসিয়া আছেন। তাঁহার কোনও পুরুষ শিষ্য নাই। নলিনীকান্ত এই ব্যাপার কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কারণ

হিন্দুদের শাস্ত্রানুযায়ী কোন সাধনায় যদি এতগুলি স্ত্রীলোকের প্রয়োজন হয় তবে তাহা ব্যভিচার ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সে স্থান হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন।

সিদ্ধিলাভের পর শ্রীশ্রীঠাকুর এই সাধুটীর স্বরূপ অবগত হইয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে ঐ সাধুটী যে একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ তাহা ক্রমশঃ পর পর সাধনান্তে তাঁহার প্রেমের স্ফূর্ত্তি হইবার পরই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কোনও সাধু স্ত্রীজন-সেবিত হইলে সাধারণ সামাজিক গৃহস্থগণের সাধু সম্বন্ধে যে সামাজিক আদর্শের সংস্কার আছে, তাহাতে আঘাত লাগায় তাঁহারই মত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া যে তাহারা ফিরিয়া আসিবে ইহা একটা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ সাধারণ লোক সাধু সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করিয়া থাকে এবং যে ভূমিতে তাহারা বিচরণ করে, সাধুরা তদপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরে অবস্থান করেন ও তাঁহারা মনুষ্যশৃঙ্খলিত সমাজের সমস্ত গণ্ডি ছিন্ন করিয়া সর্ব্ববন্ধনমুক্ত হইয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন। সুতরাং আপামর সাধারণ নিজেদের ধারণার সহিত মহাপুরুষকে খাপ খাওয়াইতে না পারিয়া একটী অতি হীন ধারণা লইয়া তাঁহাদের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকে। এ সমস্তই চিত্তশুদ্ধি এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবের জন্য। কারণ সাধারণ লোক তাঁহাদিগকে নিজ ভূমিতে আনিয়া বিচার করিতে চায়। রাবণ যেদিন সন্ন্যাসীবেশে সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতেই গৃহস্থগণ সন্ন্যাসীকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। প্রকৃত সাধুর স্বরূপ সাধারণের নিকট ধরা না পড়িলেও, অতীন্দ্রিয়দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট উহা ধরা পড়িয়া থাকে। যাহা হউক নলিনীকান্ত সাধুটীর উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারীর জ্ঞানেন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহাকে কাশীতে কেদারঘাটে গিয়া জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের

শিষ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। অতঃপর নলিনীকান্ত তাহাই করিলেন।

কাশী আসিয়া তাঁহার আশা পূর্ণ হইবার কোনও সম্ভাবনা দেখিলেন না। কাশীতে যাহার কথাই শ্রবণ করিতে থাকিলেন তাহারই নিকট গিয়া এই মন্ত্ররহস্য উদ্ঘাটনের আশায় সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তখন প্রিয়তমা পত্নীর সহিত এ জীবনে সাক্ষাতের আর কোন সম্ভাবনা দেখিলেন না। অতঃপর একদিন নৈরাশ্যের অবসাদ উপস্থিত হইল। তখন বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্টে বসিয়া জল্পনা কল্পনা করিয়া এই স্থির করিলেন যে যদি এ জীবনে পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সত্য লাভ করিতে না পারিলেন তবে আর জীবন রাখিয়া ফল কি? অতএব আত্মহত্যাই এ জ্বালা নির্ব্বাপিত করিবার একমাত্র পন্থা। তিনি পরলোকে অবিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু তাঁহার মৃতপত্নী পরলোকের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এখন আর তিনি পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে পারেন না। আত্মহত্যাজনিত মহাপাপের ফল হয়ত পরলোকে ভোগ হইতে পারে। কিন্তু সে ভোগ কি প্রকার এবং তাহার স্বরূপই বা কি তাহা তিনি অবগত নহেন। সুতরাং আত্মহত্যা করিতে হইলে নিখিল-পাপ-বিনাশিনী গঙ্গা-গর্ভে ঝম্প প্রদানেই আত্মহত্যা করিবেন এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। গভীর রাত্রে স্বপ্নে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হইল, তিনি তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতে থাকিলেন। বৃদ্ধের করস্পর্শে তাঁহার শরীর যেন শীতল হইয়া গেল। বৃদ্ধটী বলিলেন "বীরভূম জেলায় চণ্ডীপুর নামক একটী স্থান আছে। সেখানে তারাপীঠ বর্ত্তমান। সেই তারাপীঠে বামাক্ষেপা নামে প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধু তোমাকে তান্ত্রিক সাধনা প্রদানে সক্ষম। তুমি সেখানে যাও, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।" স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি পরদিন বীরভূম যাত্রা করিলেন।

৫

কয়েকদিন পর নলিনীকান্ত যখন বীরভূমের মল্লারপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলেন বেলা তখন ৮৷৯টা। তথা হইতে পদব্রজে চণ্ডীপুরে গেলেন। এই গ্রামের প্রান্তভাগে এক মহাশ্মশান। দুই ক্রোশ ব্যাপী মহাশ্মশানের পাদধৌত করিয়া দ্বারকা নদী উত্তরবাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই মহাশ্মশানের সাক্ষীস্বরূপ দশমহাবিদ্যার অন্যতমা তারাবিগ্রহের মন্দির দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে, পার্শ্বে নৃ-যজ্ঞের হোমকুণ্ড দিবানিশি অবিরতই জ্বলিতেছে। গৃধিনী, কাক, বাজ, শৃগাল ও কুকুর সেই মহাশ্মশান পাহারা দিতেছে। নৃমুণ্ড ও নৃ-কঙ্কালের অস্থিসমূহ যেখানে সেখানে পড়িয়া আছে। এই তারাবিগ্রহের মন্দির একটি সিদ্ধপীঠ। লোকে বলে কোন উগ্রতপস্বী যদি কোনও বিগ্রহকে স্বীয় সাধনাবলে জাগাইয়া তাঁহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন তবে তাহা সিদ্ধপীঠ বলিয়া গণ্য হয়। পরন্তু তাহা নহে। সিদ্ধপীঠ স্বয়ং সিদ্ধ। কেহ উহা প্রতিষ্ঠা করে না, উহা স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ। জনশ্রুতি আছে যে বশিষ্ঠ নামক একজন সাধক এই তারাপীঠে কিছুকাল সাধনা করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ বলিতে যদি আমরা রামচন্দ্রের মন্ত্রী ও গুরু বশিষ্ঠকে বুঝি তবে তান্ত্রিক যুগকে অনেক পিছাইয়া দিতে হয়। বৌদ্ধযুগে যে আর একজন বশিষ্ঠকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং তিনি চণ্ডীপুরে এই মন্দিরে আরাধনা করিয়াছিলেন কি-না, অথবা আটশত বৎসরের ভিতর অন্য কোন বশিষ্ঠ তথায় সাধনা করিয়াছিলেন কি-না তাহা ঐতিহাসিকদিগের বা প্রত্নতত্ত্ব-বিদের বিচার্য্য বিষয়। তবে ইহা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারা যায় যে বশিষ্ঠ নামে কোনও এক উগ্রতপস্বী এই পীঠে সিদ্ধিলাভ করায় ইহা সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মহাপীঠ বা সিদ্ধপীঠ

কাহারও প্রতিষ্ঠিত নহে, উহা স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ। যুগে যুগে দশমহাবিদ্যার অন্যান্য বিদ্যাপীঠগুলি যথা মহাবিদ্যা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, বগলা, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী প্রভৃতি কালপ্রভাবে গুপ্ত বা লুপ্ত হইয়া যায়। পরে যখন সময় হয় তখন কোনও সাধু সেখানে সিদ্ধিলাভ করায় সেই পীঠের মাহাত্ম্য বিঘোষিত হয়। ভারতে এরূপ কত শত তীর্থ যে গুপ্ত বা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সময়ে তাহা আবার প্রকট হইবে। এই বীরভূমে তারাপীঠের প্রসিদ্ধির হেতু তৎকালে বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক বামাক্ষেপার অপূর্ব্ব উগ্র সাধনা। সাধনাবলে চরমতত্ত্বকে তিনি মহাশক্তি বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে জানিয়াছিলেন এবং তন্ত্রোক্ত বিবিধ সাধনাসমূহ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মায়ের মন্দিরেই তিনি থাকিতেন এবং তান্ত্রিকগণের অনুষ্ঠানমূলক সাধনাসমূহের জন্য যে-সমস্ত দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয় যথা গৃধিনী, শিবা, সারমেয়, নরকপাল ও কঙ্কাল, শ্মশান, শব, নদীতট, সিদ্ধপীঠ ইত্যাদি সেই সকলের একই স্থানে সমাবেশ হওয়ায় সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রটা যেন এই স্থানে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল এবং স্বয়ং শিবরূপী বামাক্ষেপা এই মহাশ্মশান আগলাইয়া বসিয়া থাকিতেন।

এখানে আসিয়া স্থানটী যে তান্ত্রিক সাধনার সম্পূর্ণ অনুকূল তাহা নলিনীকান্ত বেশ উপলব্ধি করিতে পারিলেন। মন্দিরের সাধনানুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা দর্শনে তাঁহার মনটা যেন একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। দিগন্তপ্রসারী বসতিবিরল শ্মশানের দৃশ্যে মনের ভিতরে একটা ত্রাসের সঞ্চার হইল, শরীর যেন ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। তিনি আর একটু অগ্রসর হইলেন। দূর হইতে দেখিতে পাইলেন কতকগুলি কল্‌কে করবীগাছে ঘেরা একটী মন্দির। সেই গাছের একটী ডাল ধরিয়া এক ব্যক্তি রকের উপর আনমনে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দেহ কল্‌কে, করবীগাছের আড়ালে থাকায় সম্পূর্ণ দেখা না গেলেও সেই গাছের ফাঁক দিয়া তাহার চোখ দু'টী দেখা যাইতেছে। চোখ দু'টী বলিলে ভুল হয়,

যেন দু'টী আলো সেই গাছের ফাঁক দিয়া জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে। নলিনীকান্ত কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন না ঐ ব্যক্তি কে? তিনি মন্দিরের রকের উপর উঠিয়া তাঁহার পা দুইটী জড়াইয়া ধরিলেন। বামাক্ষেপা তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইলেন। দেখিলেন ত্রয়োবিংশ বর্ষীয় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ তরুণ ব্রাহ্মণ—পথশ্রান্তিহেতু সাতিশয় ক্লান্ত। তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। পথশ্রান্তি বিদূরিত হইলে বামাক্ষেপা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?"

নলিনীকান্ত স্ত্রী-বিয়োগজনিত ব্যথা বুকে লইয়া স্ত্রীকে পাইবার নিমিত্তই যে জগজ্জননীর সাধনা করিতে আসিয়াছেন সে সমস্ত কথা বাদ দিয়া বামাক্ষেপাকে মন্ত্রপ্রাপ্তির ব্যাপার, বেনারসে আত্মহত্যার সঙ্কল্প, দিব্য ব্রাহ্মণের স্বপ্নে আবির্ভাব ও তাঁহার নিকট গমনে আদেশ ইত্যাদি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিলেন ও তাঁহার কৃপা-ভিক্ষা চাহিলেন। নলিনীকান্ত যে তারার বীজমন্ত্র লাভ করিয়াছেন তাহাতে বামাক্ষেপা অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন ও তাঁহাকে অতীব ভাগ্যবান বলিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করতঃ সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

তান্ত্রিক সাধনায় বিধিনিষেধ—তন্ত্রোক্ত সাধনা যাহাকিছু তৎসমস্তই বিধিনিষেধের বশবর্ত্তী হইয়া করিতে হয়। সুতরাং তন্ত্রোক্ত কোন বিশেষ সাধনায় ব্রতী হইতে হইলে কালাকালের অপেক্ষা না করিয়া যখন-তখন আরম্ভ করিলে উহা কখনই ফলপ্রসূ হয় না। তজ্জন্য নলিনীকান্ত শ্মশানে সাধনার উপযুক্ত দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহাকে নানাবিধ নিয়ম-সংযম ও আচারপরায়ণ হইয়া থাকিতে হইল। তন্ত্রশাস্ত্রাদি পাঠ ও বামাক্ষেপার প্রমুখাৎ মহাশক্তির সাধনা সম্বন্ধীয় তথ্য অবগত হইতে থাকিলেন।

মহাশক্তিই সর্ব্বশক্তির মূলাধার—সাধনা মহাশক্তির। জগজ্জননীই এই মহাশক্তি। যিনি বিশ্ব প্রসব করিয়া—বিশ্বকে ধারণ

করিয়া—বিশ্বকে পালন করিতেছেন এবং সময়ে অণুপরমাণু-সংহতিরূপ জগৎকে আবার অণুপরমাণুরূপে আকাশে লয় করিতেছেন, যিনি অগণিত জীবদেহের রচনা করিয়া নিজ শক্তির দ্বারা সংহত করিয়া রাখিয়া তাহাদের চলচ্ছক্তি দিয়াছেন—তাঁহার সাধনা গুরুতর সাধনা। সমস্ত চরাচরে যাহা কিছু দৃশ্যমান সবই ত শক্তির বিভিন্ন বিকাশ—সবারই প্রসূতি জগজ্জননী। ক্ষিতির অণুপরমাণুসমূহ সেই শক্তির পরিণাম। রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ সমস্তই সেই বিরাট্ শক্তির বিভিন্ন উৎস। গ্রহ-উপগ্রহের আকর্ষণ-বিকর্ষণ-এর মূলেও সেই শক্তি। মানবের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি সবই সেই জগজ্জননীর শক্তি। সেই বিরাট্ শক্তিরূপা জগজ্জননীর সহিত সাক্ষাৎ যোগ হইলেই নিজ পত্নীর সাক্ষাৎ পাইবেন। কিন্তু এত বড় বিরাট্ যে জগজ্জননী, তাঁহার সহিত যোগ করিতে হইলে নিজের ভিতর তাঁহার শক্তি—যাহা ভিতরে সুপ্ত রহিয়াছে তাহার উদ্বোধন করিতে হইবে, ইহাই বামাক্ষেপার আদেশ। সে শক্তির উদ্বোধনের জন্য এই তারাপীঠই উপযুক্ত ক্ষেত্র। কিন্তু কেন ? সে শক্তির বিকাশ কি যেখানে-সেখানে হইতে পারে না ? —না।

তান্ত্রিক সাধনায় স্থানকাল বিচারের হেতু—যে সমস্ত জীবজন্তু বা দ্রব্যের বাহ্য সংস্পর্শে ভিতরে সুপ্তশক্তি জাগিয়া উঠে, তৎসমস্তই এই ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকায় সাধকের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়া থাকে। সর্পদেহে ভগবান্ হলাহলের সৃজন করিয়াছেন কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে আবার সম্মোহিনী শক্তিও দিয়াছেন। যে সমস্ত সাধক কোন তান্ত্রিক-গুরুর সন্নিধানে থাকিয়া সর্পের সহিত বসবাস করেন, সর্পের শ্বাস-প্রশ্বাসের ভিতর দিয়া সর্পের অণুপরমাণু সাধকের ভিতর যাওয়ায় এবং সর্পদেহ যে ধাতুতে গঠিত সাধকেও অনেকটা সেই ধাতু প্রবেশ করায় কিছুদিন পরে সর্পদংশনেও তাঁহাদের কোনপ্রকার যন্ত্রণা অনুভব হয় না এবং ঐ দংশনও ক্রিয়াশীল হয় না। সাধকের মনেও সম্মোহিনী শক্তির

সঞ্চার হয়। কারণ ঐ শক্তি সর্পদেহ হইতে তাঁহাদের ভিতর বহুল পরিমাণে প্রবেশ করে। অনেক সময় তাঁহারা আবার সর্পদষ্টও হন না, কারণ সমশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া সাধককে তাহারা দংশন করে না। নলিনীকান্ত তারাপীঠকে সর্পের এক আবাসস্থান দেখিলেন। অনবরত সর্পসকল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। ইহারা নাকি শিবসহচর।

শ্মশানে কুকুর হাড় লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে। কখন কখন পেচক ডাকিয়া উঠিতেছে। ইহারা শক্তিসাধনে বিশেষ উপকারী। কুকুরের ও পেচকের গভীর অন্ধকারেও দৃষ্টিশক্তির লোপ হয় না। অনবরত কুকুর ও পেচকের সহবাসে তাহাদের দেহ হইতে ঐ শক্তি সাধকের ভিতর প্রবেশ করায় শক্তিসাধকের বিনা সাধনায় অন্ধকার রাত্রেও দৃষ্টিশক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। শ্মশানে গৃধিনীগণ নরমাংস লইয়া দিবারাত্র টানাটানি, হুড়াহুড়ি করিতেছে বলিয়া সাধকগণ বহুল পরিমাণে উপকৃত হন। কারণ গৃধিনীগণের অসাধারণ দৃষ্টিশক্তি। ইহারা আকাশে বহুদূরগামী হইয়াও ৩।৪ মাইল দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পায়। ইহারা ৩।৪ মাস পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতে পারে এবং পচা মড়া প্রভৃতি দূষিত পদার্থ বা জীবাণু খাইয়া হজম করিতে পারে। সুতরাং যে হাওয়ার ভিতর ইহাদের চলাফেরা অত্যন্ত বেশী, সেই হাওয়ায় সাধকগণের প্রভূত পরিমাণে দৃষ্টিশক্তি, অনাহারে থাকিবার শক্তি ও ক্ষতিকর জীবাণু হজম করিবার শক্তি প্রভৃতি বহুল পরিমাণে অনায়াসেই লাভ হয়।

এই স্থানে শিবাগণ দিবা দ্বিপ্রহরেও যাতায়াত করিয়া শ্মশানের গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। একদা রাত্রে নলিনীকান্ত এইরূপ একটী শৃগালকে কিয়দ্দূর তাড়া করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। শৃগালটী কিয়দ্দূর দৌড়াইয়া গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল ও তাহার দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া একবার চীৎকার করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখবিবর হইতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। অন্ধকার রাত্রে সেই অগ্নির ভিতর

চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের রচনা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নলিনীকান্ত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন ও পরে মন্দিরে ফিরিয়া আসিয়া উহার তথ্য অবগত হইলেন যে ঐ শিবাটী "উল্কামুখী"। উহারা যে স্থানে অবস্থান করে সে স্থানে সাধকগণের সাধনার শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা প্রভৃত পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। ইহারা দৌড়াদৌড়ি করিবার সময় গাত্রের লোম হইতে যে বিশ্রী গন্ধ বাহির হয় তাহা সাধকে বিশেষ শক্তি সঞ্চার করে।

এই বিস্তৃত শ্মশানে চণ্ডালিনী, ধোবানী, নাপতিনী, গোয়ালিনী ও ব্রাহ্মণকন্যা প্রভৃতি 'কুলকন্যাগণের' শব অনবরত দাহ হইতেছে। কখনও বা অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া ফেলিয়া যাইতেছে এবং সেই সমস্ত শব হইতে ধাতু-সমুদয় সাধকের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার ভিতর কামভোগের শক্তি যেমন বৃদ্ধি করিতেছ তেমনি আবার সঙ্গে সঙ্গে নরকঙ্কালসমূহ সাধকের হৃদয়ে বৈরাগ্যের ভাব প্রতিষ্ঠা করিতেছে। এই প্রসঙ্গের বর্ণনাকালে গুরুগিরির সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন যে বিভিন্ন জাতির ভিতর ও বিভিন্ন জীবের ভিতর ভগবানের বিশেষ বিশেষ শক্তি নিহিত আছে। তাহা কোনপ্রকার যুক্তিতর্কের বলে বা স্বদেশহিতৈষণার প্রেরণায় একাকার করিবার চেষ্টায় উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না।

মহাশ্মশানে জগজ্জননীর সাধনা—নলিনীকান্ত কয়েকদিন এইস্থানে বসবাস করায় তাঁহার স্নায়ু ও শরীরের পেশীসমূহের ভিতর কেমন যেন এক অননুভূত তেজের অনুভব করিতে থাকিলেন। দিব্য সৌগন্ধ যেমন মানবের চিত্তে এক অভিনব ভাবের সঞ্চার করিয়া দেয় তেমনি এই শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে কয়েক দিন অপেক্ষা করায় তাঁহার মনে শক্তিসাধনার একটা মত্ততা আসিয়া গেল। উগ্র সাধনা ও সিদ্ধি এই দুইটী সঙ্কল্প তাঁহার সমস্ত চিত্তটা অধিকার করিয়া ফেলিল। অবশেষে নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইল। তখন বামাক্ষেপার আদেশে মহানিশায় জনবিরল

দিগন্তপ্রসারী মহাশ্মশানে উপস্থিত হইলেন। উত্তরসাধক বামাক্ষেপা শ্মশান-সাধনার অনুষ্ঠান করিয়া দিয়া অন্যান্য দেবতা উপদেবতাদির পূজা করিয়া বলিলেন, "মা বিশ্বরূপা। তিনি কাহাকে যে কিরূপে দেখা দিবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। ইষ্টদেবী যেরূপেই দেখা দিন না কেন তোমার সন্দেহ দূর করিতে তিনি অঙ্গীকার করিয়া বলিবেন যে তিনিই তোমার ইষ্টদেবী। অতঃপর তুমি প্রণাম করিবে। তিনি তখন তোমার শিরে পাদস্পর্শ করিবেন। ইষ্ট ভিন্ন অন্য দেবতা বা উপদেবতা কেহ সাধকের ললাটে পাদস্পর্শ করিতে সক্ষম হইবে না।" সাধন-বিষয়ে এইরূপ নানা প্রকার উপদেশ দিয়া উত্তরসাধক বামাক্ষেপা মন্দিরে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মহাভয়ঙ্কর শ্মশানে গভীর রাত্রে নলিনীকান্ত এখন একাকী; ঘোর তন্ময়তার সহিত মহাশক্তির সাধনায় প্রবৃত্ত। ঘন তমসায় প্রথমে ঘুট্ ঘাট্ শব্দ—দূরে শিবাগণের হুড়াহুড়ি। তারপর শব্দ ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। যেন খুব নিকটে কাহারা হী হী হাস্য করিয়া উঠিল—হাস্য যেন ক্রমশঃই নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল—ঝুম্ ঝুম্ করিয়া কাহারা যেন নাচিতে লাগিল। নলিনীকান্তের শরীর গরম হইয়া উঠিল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গভীর একাগ্রতার সহিত জপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হিংস্র জন্তুসমূহ তাঁহার শরীরের চতুর্দ্দিকে নিশ্বাস ফেলিতেছে ও গা শুঁকিতেছে এরূপ বোধ হইতে লাগিল। নলিনীকান্ত টলিলেন—সঙ্গে সঙ্গে উত্তরসাধক বামাক্ষেপার হুঙ্কার "ভয় নাই, ভয় নাই"-স্বর মন্দির হইতে কর্ণে প্রবেশ করিয়া নলিনীকান্তের ভিতর অপূর্ব্ব নূতন শক্তির সঞ্চার করিল। পুনরায় মন একাগ্র করিয়া জপ করিতে থাকিলেন। কিছুক্ষণ পরে আকাশের গায়ে যেন কড়্ কড়্ করিয়া মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল—দেখিতে দেখিতে নলিনীকান্তের চতুষ্পার্শ্বে যেন অশনিপাত হইতে থাকিল—শব্দ যেন তাঁহার কর্ণপটহ ভেদ করিয়া

যাইতে লাগিল। নলিনীকান্ত চোখ মেলিলেন। চপলা-চমকে মুহূর্ত্তের চাহনিতে যাহা দেখিলেন তাহাতে স্থির থাকা যায় না। দেখিলেন, গগনস্পর্শী উচ্চ কৃষ্ণকায় এক বিরাট্ ঐরাবৎ তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। শ্বেতদন্ত কৃষ্ণাঙ্গ নরছায়া ভূতপ্রেত হী হী করিয়া হাসিতেছে। দুগ্ধধবল নরকঙ্কাল সব নৃত্য করিতেছে। এস্থান হইতে পলাইবার পথ নাই। উত্তরসাধক বামাক্ষেপার ভীম ভৈরব মাভৈঃ মাভৈঃ রব তখনই নলিনীকান্তের মন হইতে সমস্ত ভয় বিদূরিত করিল। তিনি মনে করিলেন—একি মানসিক বিকার ? পুনরায় জপে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমেই বাহিরের সমস্ত উপদ্রব যেন প্রশমিত হইয়া যাইতে লাগিল। চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় বাহিরের আলো চোখের পাতার উপর পড়িলে যেমন রাত্রির অন্ধকার হইতে কিছু পার্থক্য বোধ হয় তদ্রূপ বোধে চোখ মেলিলেন। নলিনীকান্ত অবাক্ বিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহার শরীর হইতে স্নিগ্ধ ভাস্বর জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হওয়ায় চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া গিয়াছে—শরীরটা যেন জ্যোতিঃর প্রস্রবণস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্মুখে শূন্যে ঐ জ্যোতিঃ ঘনীভূত হইয়া মানবাকার ধারণ করিতেছে। ক্রমশঃ উহা একটী সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করিল। ঐ মূর্ত্তি ক্রমে পরিণতি লাভ করিয়া যে রূপ ধারণ করিল তাহাতে নলিনীকান্তের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। এ যে তাঁহারই পরলোকগতা স্ত্রী সুধাংশুবালা ! তবে তদপেক্ষা অধিকতর গরিমময়ী, মহিমময়ী ও লাবণ্যময়ী। দেবী নলিনীকান্তের দিকে তাকাইয়া হাসিলেন। নলিনীকান্তও হাসিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে একটী মহা দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি ত তারারই সাধনা করিতেছেন স্ত্রীকে পাইবার জন্য। তবে যে মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিতেছেন সে কি তাঁর স্ত্রী অথবা ইষ্টদেবী তারা ? নলিনীকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে ? সত্য বল"। দেবী বলিলেন "আমি তারা—তোমার ইষ্টদেবী"।

নলিনী। তোমার এ মূর্ত্তি ত গুরুর উপদিষ্ট মূর্ত্তি নয়। সত্য করে বল তুমি কে?

দেবী। আমি অঙ্গীকার করিয়া বলিতেছি আমিই তারা। তোমার স্ত্রীকে পাইবার নিমিত্ত আমার সাধনা করিতেছ; তোমার সাধনা ফলবতী হইয়াছে। তাই আমি তোমার মনোময়ীরূপে—যে রূপ তোমার হৃদ্য—যাহা দেখিলে তুমি তৃপ্তি পাইবে সেই রূপে দেখা দিয়াছি। আমার বেদময়ী রূপ দেখিলে তুমি সহ্য করিতে পারিবে না। আমি বিশ্বরূপা—আমাতেই সব—সবেই আমি—যে কোনও রূপে আমি দেখা দিতে পারি।

নলিনীকান্ত তখন পরীক্ষার্থে দেবীকে প্রণাম করিলেন। দেবী তাঁহার ললাটে বামপদ স্পর্শ করিয়া বলিলেন "সাধনার ফলস্বরূপ আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। যে কোন বর চাও—ত্রিলোকে যাহা কিছু তোমার অভীষ্ট থাকে বল। আমি তোমাকে সেই সব সম্পদে অধিকারী করিব।"

নলিনী। কি আর চাহিব? চাহিবার মত ত কিছু দেখি না। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ক'রে তোমার নিকট আসি নাই।

দেবী হাসিয়া বলিলেন, "জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য, ধনরত্ন, দেবকন্যা, অপ্সরী, বিদ্যাধরী, যোগিনী, রমণী যাহাকিছু?"

নলিনী। জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, ঐশ্বর্য্য, রমণী ইহাতে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই এবং প্রয়োজনও নাই। আমি কেবলমাত্র তোমাকেই চাই। যখন তোমাকে স্মরণ করিব তখনই তুমি এই মূর্ত্তিতে আমার নিকট আবির্ভূতা হবে। দিতে পার ত এই বর দাও।

দেবী হাসিয়া বলিলেন, "তাই হবে।"

নলিনী। কিন্তু তোমার বেদময়ী মূর্ত্তি—যে মূর্ত্তি সম্বন্ধে গুরু উপদেশ দিয়াছেন সেই মূর্ত্তি আমাকে একবার দেখাও।

তখন মনোময়ী মূর্ত্তি পুনরায় ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া জ্যোতিঃপুঞ্জে পরিণত হইয়া মণ্ডলাকার ধারণ করিল। মহাশূন্যে বিরাট জ্যোতির্ম্মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী সদ্যশ্ছিন্ন রক্তাক্ত নৃমুণ্ডমালিনী, রক্তনেত্রা, ঊর্দ্ধকেশা, খড়্গখর্পরধারিণী, রুদ্রনৃত্যপরা বামা সাধককে স্বরূপ দেখাইলেন। মহাশক্তির স্বরূপ দেখিয়া নলিনীকান্ত বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর বামাক্ষেপা যখন তাঁহার বাহ্য জ্ঞান আনয়ন করিলেন তখন নিশার অবসান হইয়াছে।

পত্নীরূপিণী মহাশক্তির সহিত প্রেমালাপ—সিদ্ধিলাভের পর নলিনীকান্ত দুই-এক দিন বামাক্ষেপার নিকট অবস্থান করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া কর্ম্মস্থল কুমিরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় ভিতরে তাঁহার অফুরন্ত আনন্দপ্রবাহ—বাহিরে কর্ম্মের বাহ্যিক আবরণ। কর্ম্মান্তে অবকাশমত কি দিবসে কি রাত্রে তিনি তাঁহার নির্জ্জন গৃহে মনোময়ীকে স্মরণ করিতেন—তিনিও তাঁহার সম্মুখে প্রকট হইতেন। বিশ্বপ্রসবিনী বিশ্বনিয়ন্ত্রী মহাশক্তি তাঁহাকে স্ত্রীরূপে দেখা দিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে যখন স্মরণ করিবেন তখনই দেখা দিবেন। দেবী সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া যখন বলিলেন "বরং বৃণু—বর নাও", তখন নলিনীকান্ত স্ত্রীর নিকট জ্ঞান ও ভক্তি কি চাহিবেন? প্রণয়ী যেমন প্রণয়িনীকে বলে, "যখন ইঙ্গিত করি তখনই যেন দেখা দিয়ে যেও।" নলিনীকান্তও তেমনি প্রেমিক স্বামীর ন্যায় বলিলেন—"যখনই স্মরণ করব তখনই এসে দেখা দিয়ে যেও।" প্রথম প্রথম পরীক্ষাচ্ছলে নির্জ্জন গৃহাভ্যন্তরে একবার দু'বার এমন কি তিনবার করিয়া তাঁহার সহিত মনের আনন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার এক জ্বালা উপস্থিত হইতে থাকিল। জগজ্জননী পত্নীরূপে দেখা দেওয়ায় নলিনীকান্তের ভিতর স্বামীর ভাব জাগিতে লাগিল। সেই আকৃতি—সেই প্রকৃতি—সেই বয়স—সেই চাহনি—সেই হাসি—সেই পাদক্ষেপ—সেই অঙ্গভঙ্গি—সেই সব। একই শয্যার উপর উভয়ে বসিয়া দুজনার অফুরন্ত অর্থহীন অসম্বদ্ধ কথা, যেন তার আর শেষ নাই।

নলিনীকান্তের নবীন বয়স—নূতন উৎসাহ। তাহাতে তান্ত্রিক সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন—বিশ্বধাত্রী তাঁহাকে স্বামীভাবে বরণ করিয়া

তান্ত্রিকসাধনায় সিদ্ধ মহাপুরুষগণের ভিতর অভিনব ও বরণীয় আসন প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং নূতন ভাবের উদ্দাম চাঞ্চল্যে নলিনীকান্তের বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হইতে থাকিল। জগজ্জননীর স্বরূপ তাঁহার নিকট কিভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল পরে তাহা নিজমুখে প্রকাশ করিয়াছেন, "মূর্ত্তি দেখে মা ব'লে মনে হ'ত না—স্ত্রী বলেই মনে হ'ত। তার কাছে তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করব কি? লজ্জাই হ'ত। স্ত্রীর কাছে আবার তত্ত্বকথা! মাঝে মাঝে জড়িয়ে ধরবার জন্য ইচ্ছা হ'ত।"

এদিকে ভিতরে ভিতরে নবদম্পতির প্রেমের কলহের ন্যায় কোন্দল হইতে লাগিল ও ধীরে ধীরে নলিনীকান্তের মানসিক ভাবের এক গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে থাকিল। একদা সবিস্ময়ে সবাই দেখিল যে নলিনীকান্ত পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। গেরুয়া মাটীর দ্বারা কি প্রকারে বস্ত্র রঙীন করিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন না। কেবলমাত্র জানিতেন কি প্রকারে লাল রং দ্বারা কাপড় ছোপাইতে হয়। তিনি তাহাই করিয়া আজ নূতন বেশ ধারণ করিয়াছেন। কুমিরানিবাসী হেমবাবু নামে জনৈক ভদ্রলোকের সহিত নলিনীকান্তের বিশেষ হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল; জমিদারী কাজকর্ম্ম এরূপ দক্ষতা ও সততার সহিত সম্পন্ন করিতেছিলেন যে তাহা সাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ইহা হেমবাবু বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং অতি দ্রুত যে নলিনীর আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইতেছিল ইহাতেও তাঁহার দৃষ্টি বেশ আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি মাঝে মাঝে নলিনীকে বলিতেন "প্রতিশ্রুত হও— যদি কখনও বড় লোক হও, তবে দেখা করিবে।" ইহাতে নলিনীকান্ত হাসিতেন, কিন্তু তাঁহার অজ্ঞাতসারে যে-সমস্ত পরিবর্ত্তন হইতেছিল তাহা তিনি নিজে বুঝিতে পারিতেন না।

ক্রমশঃ দিন অতিবাহিত হইতে থাকিল। স্ত্রীরূপে মহাশক্তিকে সাক্ষাৎ লাভ করিয়াও আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দই তাঁহার মনটা

অধিকার করিয়া ফেলিতে লাগিল। মহাশক্তি স্ত্রীরূপে আসিলেও—স্বরূপে ত তিনি আর স্ত্রী নন! সুতরাং ইদানীং তিনি আর তাঁহাকে দেখিতে চাহিতেন না। যদি কখনও মনের ভিতর ইচ্ছা জাগিত, মহাশক্তি স্ত্রীরূপে অতর্কিত ভাবে আবির্ভূত হইতেন। নলিনীকান্ত একবার মাত্র তাকাইয়া রুক্ষস্বরে বলিতেন "যাও"। তিনিও চলিয়া যাইতেন।

প্রকৃত স্বরূপের স্মৃতি ও বৈরাগ্যোদয়—অকস্মাৎ একদিন তাঁহার মনের অতি গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। তাঁহার মনে চিন্তার এক নূতন ধারা খুলিয়া গেল—"কে এই মহাশক্তি তারা—যে আমাকে স্ত্রীরূপে দেখা দিয়া প্রলুব্ধ করিতেছে—তাহার ধ্যানে অহরহ ডুবাইয়া দিতেছে—কেন তার রূপমোহে আকৃষ্ট হইয়া তাহার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতেছি? কে এই তারা? তার স্বরূপ কি? আর আমিই বা কে? আমারই বা স্বরূপ কি? আমার অস্তিত্বের হেতু কি? কেন আমি তারার চিন্তা করি? তারাপীঠে সাধনাকালীন অবস্থায় স্পষ্ট দেখিলাম যে—আমার শরীর হইতে জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া তাহাই ক্রমশঃ তারামূর্ত্তিতে পরিণত হইল সুতরাং আমার দেহ হইতেই ত তারার জন্ম" ইত্যাদি চিন্তা করিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে আর কখনও তারাকে স্মরণ করিবেন না। তিনি জানিবেন যে তারা কে? এবং তাঁহার সহিত তারার সম্বন্ধই বা কি? এই ভাব ও সঙ্কল্প ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে থাকিল। অবশেষে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পুনরায় চণ্ডীপুর রওনা হইলেন। চণ্ডীপুরে আসিয়া নলিনীকান্ত তারাপীঠে বিশ্রামান্তর বামাক্ষেপার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "তারা আমার ভিতর থেকে বেরিয়েছে। তারার জন্ম যদি আমা থেকে—তা'হলে আমি কে এবং আমার স্বরূপই বা কি দয়া করে আমায় বলুন।" প্রগল্‌ভ যুবকের মুখে ঈদৃশ অবান্তর বাক্য শ্রবণ করিয়া বামাক্ষেপা ক্ষিপ্ত

হইয়া রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন—নেত্রদ্বয় জবাফুলের ন্যায় লাল হইয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "বিশ্বপ্রসবিনী অনন্ত-শক্তিস্বরূপিণী মা'র জন্ম আমার শালা হ'তে? দূর হ!" তাঁহার মুখমণ্ডল প্রলয়ঙ্কর মেঘের ন্যায় গাঢ় অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। রুক্ষস্বরে ভৈরব হুঙ্কারে কদর্য্য ভাষায় "মহাশক্তির জন্ম আমার শালা হতে"—ক্ষেপার ঈদৃশ গর্জ্জনে তারার মন্দির কম্পিত হইয়া উঠিল। লুণ্ঠিতকেশ যুবক নলিনীকান্তের মনে হইল যেন সেই স্বরে ব্রহ্মাণ্ডকটাহ পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠিল। তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি যাহা বুঝিয়াছেন, যে প্রশ্ন তাঁহার ভিতর জাগিয়াছে তাহার সমাধান তিনি চান—তাহাতে যত বিপদই তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হউক না কেন?

ক্রোধভরে বামাক্ষেপা উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সারারাত্রি বামাক্ষেপা ক্ষিপ্ত রহিলেন—নিজে নিজে কত কথাই বলিতে থাকিলেন—কখনও অট্টহাসি, কখনও গালমন্দ। প্রত্যূষে নলিনীকান্তের নিকট আসিয়া বলিলেন "মায়ের কাছে তোমার প্রশ্নের বিষয় জানিয়াছি। তোমার স্বরূপ জানিতে হইলে তোমাকে সন্ন্যাসী হইতে হইবে।"

নলিনীকান্ত হৃষ্টচিত্তে বলিলেন "বেশ। আমাকে সন্ন্যাস দিন। আমাকে কি করিতে হইবে বলুন।"

বামাক্ষেপা। তোমাকে শঙ্করসম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হইতে হইবে। আমি অবধূত, স্থতরাং আমার দ্বারা উহা সম্ভবপর নয়। আমি মাত্র একটী পন্থারই সন্ধান জানি। অন্য পন্থার কোন সঙ্কেত আমি দিতে পারিব না। মার নিকট হইতে গত রাত্রিতে আমি জানিয়াছি যে মা তোমার দ্বারা অনেক কিছু করাইয়া লইবেন।

চাকুরি ত্যাগ—অতঃপর নলিনীকান্ত বামাক্ষেপার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কুমিরায় ফিরিয়া আসিয়া চাকুরিতে ইস্তফা দিলেন।

চাকুরিটী রাখিবার জন্য ম্যানেজার তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিলেন কিন্তু তাহাতে তিনি কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। তখন অগত্যা ম্যানেজার তাঁহার কাজকর্ম্মের প্রশংসাসূচক একখানি সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন, কারণ যদি ভবিষ্যতে কখনও কোন চাকুরির প্রয়োজন হয় তখন ইহা অনেক কাজে লাগিবে।

নলিনীকান্ত পিতা, ভ্রাতা বা আত্মীয়স্বজন কাহাকেও কিছু না বলিয়া কাশীধামে রওনা হইলেন। মনে হইল যেন তিনি কাহারও নহেন। দৈহিক সম্বন্ধসূত্র যেন আপনাআপনি ছিন্ন হইয়া গেল; দৈহিক সম্বন্ধ যাহা কিছু সব যেন "নাই" বলিয়া অস্বীকার করিলেই উহা অতি সহজেই শেষ হইয়া যায়। তাঁহার মন হইতে সমস্ত সম্বন্ধের ছাপ দূর হওয়ায় দৈহিক কোন সম্বন্ধের সূত্র খুঁজিয়া পাইলেন না। সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক বিচ্ছিন্ন মন একমুখী হইয়া এক চিন্তা "কোঽহং"—আমি কে?—এই চিন্তা লইয়া সর্ব্বপ্রথমে কাশীতে আসিলেন।

নলিনীবাবু চাকুরিতে জবাব দিয়া চলিয়া গিয়াছেন একথা সর্ব্বপ্রথমে ম্যানেজার জানিলেন, তৎপরে অধীনস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ। অবশেষে সমস্ত কুমিরাবাসী অবগত হইল যে সুপারভাইজারবাবু কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। ম্যানেজার মনে করিলেন যে প্রগল্ভ যুবক সাময়িক ভাবপ্রবণতা বশতঃ এমন সুন্দর চাকুরি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, ভবিষ্যতে কতই না উন্নতির আশা ছিল! অধীনস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ যথা নায়েব ও আমিনগণ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। যাহ'ক একটা চাকুরি খালি হইল—নিজেদের ভিতর হইত হয়ত কেহ এই চাকুরিটী পাইবে, না পাইলেও অন্ততঃপক্ষে অন্য যে-কেহ ঐ পদে আসুক না কেন সে এইরূপ কড়া হইবে না। উপরি পাওনাটা যে একদম বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সেটা এবারে কিছু সুবিধা হইতে পারে। নলিনীবাবু যে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া সন্ন্যাস লইতে কাশী চলিয়া গিয়াছেন একথা কুমিরার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া ক্রমে নদীয়া জেলায় কুতবপুর গ্রামেও পৌছিল।

সংসারত্যাগে আত্মীয়স্বজন—পুত্র নলিনীকান্তের সন্ন্যাস লইবার উদ্দেশ্যে চাকুরি ত্যাগ ও কাশীধাম গমনের সংবাদে বৃদ্ধ পিতা ভুবনমোহন চিন্তায় শোকে একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। আত্মীয়স্বজন ম্রিয়মাণ হইলেন, প্রতিবেশী যাহাদের হৃদয়ে তিনি স্নেহের আসনে আসীন ছিলেন, তাহাদের গৃহে রন্ধন চড়িল না। মনে হইল আজ তাহাদের মধ্য হইতে যেন কাহাকেও জন্মের মত হারাইয়া ফেলিয়া তাহারা অতি দীনাতিদীন হইয়া পড়িয়াছেন। ছোট ছোট ভাইগুলি যেন আজ পিতা বর্ত্তমানেও কার্য্যক্ষম জ্যেষ্ঠভ্রাতার অভাবে আশ্রয়হীন হইয়া অন্যের সহানুভূতির পাত্র হইয়াছে। প্রতিবেশীগণ, আত্মীয়-

স্বজনগণ সবাই ভুবনমোহনের বাটীতে সমবেত হইলেন। নানা জন নানা কথা বলিয়া বৃদ্ধ ভুবনমোহনকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল। কেহ বলিল নলিনী অবশ্যই ফিরিয়া আসিবে, কেহ বলিল যদি সন্ন্যাস লইয়া থাকে তবে আর ফিরিতে পারিবে না, কেহ বলিল যদি একান্তই যায় তবে পিতার নিকট হইতে অনুমতি লইয়া যাইতে হইবে। সকলের বাদানুবাদ ও আলোচনার ভিতর বৃদ্ধের চক্ষু হইতে প্রবল ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "আমার তো মনে হয় না যে সে আর ফিরিবে। আমার নলিনী দেবতা ব্রাহ্মণ মানে না বটে, কিন্তু সে আমাকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করে। জীবনে কখনও সে আমার অবাধ্য হয় নাই। একদিনও আমাকে মনঃপীড়া দেয় নাই। আজ যদি তাহার গর্ভধারিণী বেঁচে থাকৃত তবে ভাগ্যবতী এ আঘাত সইতে পারত না। কত ব্রত পার্ব্বণ ক'রে কত পূজা আহ্নিক ক'রে নলিনীকে পেয়েছিল" বলিয়া বৃদ্ধ কাঁদিতে লাগিলেন। জ্ঞাতিভ্রাতা যুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায় ভুবনমোহনকে বুঝাইতে থাকিলেন "নলিনী তোমার অকৃতজ্ঞ সন্তান নয়। এ বৃদ্ধ বয়সে সংসারের বোঝা তোমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে যে সে চলে যাবে, এ কখনই সম্ভবপর নয়। হয়ত খেয়ালের বশে চলে গিয়েছে, আবার দু'দিন পরেই ফিরে আস্‌বে।"

ভুবনমোহন। অকৃতজ্ঞের কথা কিছু নয় যুধিষ্ঠির! প্রকৃতই যদি তার বৈরাগ্যের উদয় হ'য়ে থাকে, তবে সংসারের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কতটুকু? সত্যই যদি তার ভিতর সে তত্ত্ব জেগে থাকে তবে সে ভাগ্যের কথা, কিন্তু বাপের প্রাণ—তাই বুঝে না। নলিনী যে আমার কোনদিন কষ্ট সইতে পারে না। সে কোনদিন ময়লা কাপড় জামা পরতে পারে না। ময়লা বিছানায় তার ঘুম হয় না। রাত্রে বের হ'তে হলে একজন দাঁড়াতে হয়। একদিন চুল না আঁচ্‌ড়ালে তার মাথা ধরে, সে কি আমার সন্ন্যাসের কষ্ট সইতে পারবে?

যুধিষ্ঠির। কে যে কি পারে আর না পারে তা কিছু বলা যায় দাদা? বুদ্ধদেব রাজার ছেলে ছিলেন, কি কষ্টই না তিনি স'য়েছিলেন! চৈতন্যদেব অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে ছিলেন, তিনিও কি কম কষ্ট স'য়েছেন?

ভুবন। আচ্ছা যুধিষ্ঠির! একবারও কি আমার কথা তার মনে হয় না? মা বলতে বাপ বলতে উভয়ই ত আমি তার। ছোট ছোট ভাইগুলির কথাও কি তার একবার মনে পড়ে না? নলিনী! একেবারেই নিষ্ঠুর হ'লি? আমি যে এতদিন একসঙ্গে মাতৃ-পিতৃস্নেহে তোকে ভালবাসলাম, মানুষ করলাম, তার প্রতিদান কি এই দিলি নলিনী? বাবা আমার—আর কি ফিরে আস্‌বি না? উৎকট বৈরাগ্য যুধিষ্ঠির!" বলিয়া বৃদ্ধ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তারাপদ পিতাকে এরূপভাবে কাঁদিতে দেখিয়া বলিলেন, "বাবা! দাদাকে একবার খুঁজে দেখলে হ'ত না? কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে যেখানে যেখানে সাধুসন্ন্যাসীগণ থাকেন প্রায় সব স্থানেই আমাদের পরিচিত লোক আছে, সুতরাং তাদের কাছে টেলিগ্রাম করলে আমরা জান্‌তে পারি বর্তমানে দাদা কোথায় কিভাবে আছেন? আমাদের কথা তাঁর মনে পড়িয়ে দিলে স্নেহবশে হয়ত বা ফিরতেও পারেন। আর না ফিরলেও তিনি যে সুস্থ আছেন ইহা জান্‌লেও আমরা নিশ্চিন্ত থাকৃব। দাদার সৎকাজে আমরা বাধা দেব না।

প্রতিবেশী। ভারি সৎকাজ! ছোটবেলা থেকে এত দিন ধরে মানুষ ক'রে বিয়ে থা দিয়ে শেষে বৃদ্ধ পিতার উপর সংসারের ভার ফেলে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করা—বড় সৎকাজ?

ভুবনমোহন। না না, তা ব'লো না। যদিও সে আমাকে ছেড়ে গিয়েছে তথাপি সৎকাজ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালে দু'টি পুত্রসন্তান থাকৃলে পিতামাতা একটীকে সন্ন্যাস নিতে পাঠা'ত।

প্রতিবেশী। কিন্তু শাস্ত্রে আছে যারা বৃদ্ধ পিতামাতাকে ফেলে চ'লে যায় তাদের অনন্ত নরক হয়।

ভুবন। সে এক পুত্রের সম্বন্ধে হ'তে পারে ভাই! আর এক পুত্র স্থলেও যাদের উৎকট বৈরাগ্য হবে তা'দের সম্বন্ধে শাস্ত্র অন্য বিধান দিয়েছেন। তাদের কোন বন্ধন নাই। তারাপদ, তুমি টেলিগ্রাম কর।

জ্ঞানীগুরু অন্বেষণ—এদিকে নলিনীকান্ত চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া প্রথমেই কাশীধামে উপনীত হইলেন। কাশীতে আসিয়া শঙ্করসম্প্রদায়ভুক্ত গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীগণের সহিত মিশিয়া সন্ন্যাসের সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। এই সময় কাশীতে কৃষ্ণানন্দ স্বামীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি খুব বেশী। নলিনীকান্ত তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ সম্বন্ধে গভীরভাবে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিলেন। কৃষ্ণানন্দের নিকট যাতায়াতে তিনি নলিনীকান্তকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন এবং তাঁহার ভিতর যে অসামান্য প্রতিভা সুপ্ত রহিয়াছে তাহার সন্ধান পাইয়া নলিনীকান্ত যে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইবেন ইহাও ব্যক্ত করিলেন। ভাস্করানন্দ স্বামীর সহিতও নলিনীকান্ত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া নিজের গুরুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এই সময় তিনি বুঝিতে পারিলেন যে বহুলোক কাশীতে তাঁহার অনুসন্ধানে তৎপর রহিয়াছে। কেহ কেহ তাঁহার আকৃতির বিবরণ পাইয়া তদনুযায়ী অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ঠিক তাঁহাকেই ধরিয়া ফেলিয়াছে এবং পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া যাহাতে এই গুরুতর পরিবর্তনের দিকে না গিয়া গৃহে সদ্ভাবে থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন সেইরূপ যুক্তিতর্কেরও অবতারণা করিতে থাকিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে কাশীতে থাকা আর যুক্তিযুক্ত বোধ না হওয়ায় তিনি তথা হইতে ফেরারী আসামীর ন্যায়

পলাইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন, যাহাতে ভবিষ্যতে সাংসারিক বিষয়-বিষের সম্পর্কে কেহ আর তাঁহার কর্ণে কোন কথা তুলিতে না পারে।

বৃন্দাবনে আসিয়াও তিনি 'গুরু অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। বৃন্দাবনে অনেক বাঙ্গালী আছেন। সুতরাং এখানে আসিয়া জল, মাটি ও হাওয়ার পার্থক্য বোধ করিলেও সহানুভূতিসম্পন্ন বাঙ্গালী-হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া বিশেষ কিছু অসুবিধা বোধ করিলেন না, বরং নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা ও মাঝে মাঝে প্রলোভন আসিয়া জুটিতে লাগিল। একে বাঙ্গালী যুবক—সুন্দর সুপুরুষ, তাহাতে আবার সাধুমহলে তাঁহার উপর অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল সুতরাং এক বৈষ্ণব মোহন্ত তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন ও তাঁহার সর্ব্ববিষয়ে সুবিধার জন্য তদারক করিতে থাকিলেন।

প্রকৃত জ্ঞানীর সন্ধান তাঁহার বৃন্দাবনেও মিলিল না। বরং নানাপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, ভাবের ঢং চং, নানাপ্রকার প্রেমের অভিনয়ের সাধনা তাঁহার রুচিকর নহে বলিয়া উহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কারণ শঙ্করসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হইতে হইলে তদ্রূপ সাধুর শরণাপন্ন হওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবার কোন আশা দেখিলেন না। এদিকে নানাপ্রকার ভোজবিদ্যা, যাদুবিদ্যা, রোগ-নিরাময়কারী মন্ত্রাদি, মন্ত্রপূত তপ্ত তৈলে হস্তপদাদি ডুবাইয়া দেওয়া, ছাইকে চিনি করা, লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করা, অগ্নি নির্ব্বাপিত করা, সর্পদংশন নিষ্ফল করার কৌশল ও মন্ত্রাদি সাধুগণ উপযাজক হইয়া তাঁহাকে শিখাইতে লাগিলেন। তিনিও অবসর সময় কাটাইবার জন্য উহা শিখিলেন। কিন্তু কৌতূহলবশে উহ শিখিয়া পরে তাঁহার মনে একটী ধিক্কার জন্মিল—কেন ইহা শিখিলাম, ইহাতে ফল কি? ইহার সহিত অধ্যাত্ম তত্ত্বের সম্বন্ধ কি? শঙ্কর শিউলির নিকট বৃক্ষশির অবনত করিবার মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন শুধু খেয়ালের বশে বা কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য, কিন্তু পরে অতি গুরুতর প্রয়োজনের সময় উহা

সবিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। নলিনীকান্তেরও যে উহা কি উদ্দেশ্যে শিক্ষা করিতে হইয়াছিল তাহা তখন না বুঝিলেও উহা যে তাঁহার জীবনে বিশেষ প্রয়োজনে লাগিয়াছিল তাহা আমরা পরে যথাস্থানে দেখিতে পাইব।

অতঃপর বৃন্দাবনে আশ্রয়দানকারী পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণববাবাজীর ও তাঁহার বয়স্থা অবিবাহিতা কন্যার অত্যধিক আদর-আপ্যায়ন বড়ই অপ্রীতিকর হইয়া উঠিল। একদা বৈষ্ণববাবাজী নলিনীকান্তকে নিভৃতে ডাকিয়া তাঁহার বড় আদরের কন্যাটীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহার মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না। নলিনীকান্ত বাবাজীর এই অযাচিত দান গ্রহণে অসমর্থ হইয়া অগত্যা তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া হরিদ্বার, কন্‌খল্, হৃষীকেশ প্রভৃতি নানা তীর্থ ঘুরিয়া অবশেষে রাজপুতনায় আজমীরে গিয়া উপনীত হইলেন এবং তথাকার এক বাঙ্গালী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের আশ্রয়ে অবস্থান করিতে থাকিলেন।

নানা তীর্থে নানাপ্রকার সাধুর আখ্‌ড়ায় আড্ডা দিয়া নলিনীকান্ত যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন, তাহাতে নৈরাশ্যে তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। সাধুর স্বরূপ যাহা দেখিলেন তাহাতে তাহারা নিতান্ত দয়ার পাত্র বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। কোন সাধু ভাত খায়, কোন সাধু খায় না; কেহ সাতদিন অন্তর খায়, কেহ সারাদিন রৌদ্রে থাকিতে পারে, কেহ বা প্রচণ্ড শীত সহ্য করিতে পারে, কেহ বা একপায়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, কেহ বা সারাদিন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারে, কেহ একহস্ত ঊর্দ্ধ করিয়া রাখিতে পারে ইত্যাদি। তান্ত্রিকদের যে ভীতিপ্রদ বিভৎস আচরণ দেখিলেন তাহাতে প্রকৃত সাধুজীবন সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা বিকৃত হইয়া গেল। তিনি কাশী হইতে রাজপুতনার দিকে আসিবার পূর্ব্বে বিন্ধ্যপর্ব্বতে পূর্ণানন্দের সহিত

সাক্ষাৎ করিয়া জানিয়াছিলেন যে অতি সত্বরই তাঁহার শঙ্করসম্প্রদায়ভুক্ত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী-গুরুপ্রাপ্তি ঘটিবে। এই ভবিষ্যৎ বাণীর উপর আস্থা স্থাপন করিয়া তিনি আজমীরে অবস্থান করিতে থাকিলেন। তত্রত্য প্রবাসী বাঙ্গালীগণ তাঁহাকে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। তিনিও তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া নানা নূতন স্থান দেখিতে ও সাধু-সন্ন্যাসীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একদা শুনিলেন নিকটেই এক সাধুর বক্তৃতা হইবে সুতরাং বন্ধুদিগকে বলিলেন "আজ এক সাধুর বক্তৃতা শুনিতে যাই।"

প্রবাসী বাঙ্গালী বৃটিশ সরকারের উচ্চপদে আসীন হইয়া প্রভুত্ব করিতেছেন। সুতরাং খোট্টা সাধুর বক্তৃতা শুনা তাঁহাদের মনঃপূত হইল না। দ্বারোয়ান শ্রেণীর লোক-প্রদত্ত বক্তৃতা শ্রবণ তাঁহাদের রুচিবিরুদ্ধ। বিশেষতঃ খৈনির থুতুর ভিতর গিয়া বসিয়া বাঙ্গালীর পক্ষে বক্তৃতা শ্রবণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। নলিনীকান্তকে তাঁহারা যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। কারণ বাঙ্গালীর পক্ষে সেখানে যাওয়াটা সম্মানহানিজনক ব্যাপার। নলিনীকান্ত কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া যেস্থানে বক্তৃতা হইবে তথায় উপস্থিত হইলেন।* দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে এক বাঁশের মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া জটাজূটমণ্ডিত এক সাধু বক্তৃতা করিতেছেন এবং সহস্র সহস্র লোক অবহিত হইয়া সেই বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছে। আর একটু অগ্রসর হইয়া নলিনীকান্ত থমকিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার মনে পড়িল সুদূর বঙ্গের এক পল্লীগৃহের ভিতর রাত্রে জটাজূটমণ্ডিত যে সাধুকে দেখিয়াছিলেন তাঁহার কথা।

* মতান্তরে, আশ্রয়দাতা বন্ধুরাই নলিনীকান্তকে বক্তৃতা শুনিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

জ্ঞানীগুরু লাভ—তারপর কে যেন অবশ করিয়া তাঁহার দেহকে সজোরে সেই সহস্র সহস্র লোকের ভিতর দিয়া লইয়া গিয়া বাঁশের মঞ্চের উপর সাধুর চরণতলে ফেলিয়া দিল। যখন তাঁহার চেতনা আসিল তখন দেখিতে পাইলেন শ্রোতারা সব চলিয়া গিয়াছে। পার্শ্বে সাধুটী বসিয়া আছেন, দু'একটী চেলা এদিকে ওদিকে ঘুরিতেছে। নলিনীকান্তের সংজ্ঞালাভের পর সাধুটী জিজ্ঞাসা করিলেন "কেয়া মাঙ্গ্‌তা হ্যায় ?"

নলিনীকান্ত বলিলেন, "আপকো সাথ যায়েঙ্গে।" সাধু রুক্ষস্বরে বলিলেন, "কব্‌ভি নেহি, বাঙ্গালী ভোগী হ্যায়, সাধু হো নেহি শক্‌তা।"

তখন নলিনীকান্ত কুমিরায় গৃহাভ্যন্তরে রাত্রে তাঁহার দর্শন ও তাঁহার নিকট হইতে বিল্বপত্রে বীজমন্ত্র প্রাপ্তির বিষয় উক্ত সাধুটীর নিকট নিবেদন করিলেন ও তদবধি তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতেছেন জানাইয়া মিনতিপূর্ণ নয়নে তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"সব ঝুটা বাৎ। ভাগ্‌ শালে মছ্‌লীখোর"—এই প্রকার গালি দিয়া সাধুটী গাত্রোত্থান করিয়া দীর্ঘপাদবিক্ষেপে চলিতে থাকিলেন। অনুচরবর্গ লোটা কম্বল লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। নলিনীকান্ত সাধুর নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। তাঁহার জিনিষপত্র যাহা ছিল সমস্তই আজমীরে বাঙ্গালীদের আশ্রয়ে পড়িয়া রহিল।

আশ্রমজীবন—নলিনীকান্ত উক্ত সাধুটীর সহিত পুষ্করে আসিলেন। সাধুটীর নাম স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী। পুষ্করেই তাঁহার আশ্রম। আশ্রমে আসিলে সচ্চিদানন্দ প্রথমে অনেক অকথ্য গালমন্দের দ্বারা নলিনীকান্তকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু নলিনীকান্ত তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হইয়া তথায় রহিয়া গেলেন ও আশ্রমের কঠোরতায় নিজেকে অভ্যস্ত করিতে লাগিলেন। কাঠ কাটা, বাসন মাজা, গরুর ঘাস কাটা, পাক করা ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্য নীরবে করিয়া

এবং প্রায় প্রত্যহই তাঁহার অসহ্য বাক্যবাণ সহ্য করিয়াও তিনি সাধুর কৃপা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। আশ্রমের আহার্য্য ছিল প্রতিদিনই ভূষির রুটী, খাট্টা ও মাঠা। গরুতে যে ভূষি খায় অনেকটা তদ্রূপ ভূষিব দ্বারা রুটী তৈয়াবী হইত - তাহার সহিত খাট্টা। খাট্টা অর্থে লঙ্কার তীব্র ঝালের সহিত উৎকট টক এবং মাঠা অর্থাৎ ঘোল। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রকার আহার্য্যের ব্যবস্থা ছিল না। বাঙ্গালীর পক্ষে এইরূপ কঠোর জীবনে অভ্যস্ত হওয়া যে কি ভয়ানক ব্যাপার তাহা আধুনিক সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থগণ একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন।

যাহা হউক এইরূপভাবে কঠোরতা সহ্য করিবার শক্তি দেখিয়া সাধুটীর মন ক্রমেই নলিনীকান্তের প্রতি স্নেহশীল হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন তিনি নলিনীকান্তকে অবসর সময় হিন্দুদর্শনশাস্ত্রাদি পাঠ করিতে আদেশ দিলেন। আদেশানুযায়ী নলিনীকান্ত অবসর সময় শাস্ত্রাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যখন অশ্লীল ভাষায় গালি দিতেন তখন তাহা সহ্য করিতে নলিনীকান্তের অতিশয় কষ্ট হইত। মনের গতি ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইত। তখন আশ্রমজীবনযাপনে ইচ্ছা হইত না। ভাবিতেন, যাঁহারা সাধু বা মহাপুরুষ তাঁহাদের ভাষা এরূপ কদর্য্য কি প্রকারে হইতে পারে? ভাষাদুষ্টির জন্য তাঁহার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করায় সাধুটীর অন্যতম শিষ্য ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে তিনি যেন সেরূপ সঙ্কল্প না করেন। কারণ আশ্রমজীবন যাপন করিতে হইলে সন্ন্যাসী দেহে বাঁচিয়া থাকিবে কিন্তু অন্তরে জীবের জীবত্ব কিছু থাকিবে না। তজ্জন্য তাঁহার পক্ষে এই কঠোর ব্যবস্থা। যেদিন তিনি এই অকথ্য বাক্যবাণ সহ্য করিতে সক্ষম হইবেন, মনে হয় সেইদিন হইতে আর গালি দিবেন না। সুতরাং নলিনীকান্ত আশ্রমত্যাগের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন কিন্তু ব্রহ্মানন্দের এই যুক্তির সারবত্তা অনুধাবন করিতে পারিলেন

না। কারণ জীবের জীবত্ব নাশ করিতে হইলে যে অকথ্য ভাষায় গালি সহ্য করিতে হইবে এ কেমন ব্যবস্থা! অন্যভাবে কি হইতে পারে না? পরক্ষণে আবার চিন্তা জাগিল—শব্দ ব্রহ্ম। শব্দের দ্বারাই মনে ভাব সংক্রামিত হইয়া তাহার শক্তি সঞ্চার করে। যেমন "শালা" বলিলে যে কোন লোক চটিয়া যায় আবার "বাবা" বলিলে আনন্দ পায় সুতরাং সন্ন্যাসের দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় পৌছিতে হইলে এ সমস্তের উর্দ্ধে যাইতে হইবে।

যাহা হউক নলিনীকান্ত তখন সচ্চিদানন্দ পূর্ব্বাশ্রমে কি এবং কোথায় ছিলেন তাহা জানিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অতঃপর অবগত হইলেন যে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে যখন কাবুলের দোস্তমহম্মদ খাঁ ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তখন লর্ড অকল্যাণ্ডের অধীনে সিপাহীদের ভিতর তিনি জনৈক হাবিলদার ছিলেন। পেশোয়ারে ইংরেজগণ যখন ছাউনি ফেলিয়াছিলেন, তখন সচ্চিদানন্দ প্রতি রাত্রে পাহাড়ের উপর হইতে একটী আলো দেখিতে পাইতেন। এই আলোর কথা তিনি উর্দ্ধতন শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীকে জ্ঞাপন করেন। শত্রুগণ ঐ পাহাড়ের উপরে লুক্কায়িত থাকিয়া আক্রমণের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে মনে করিয়া সচ্চিদানন্দ কাপ্তেনকে সঙ্গে লইয়া উক্ত পাহাড়ের দিকে রাত্রে অগ্রসর হন। এইরূপে কিছুদূর অগ্রসর হইলে আলো আর দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসেন। ২।৩ রাত্রে পুনঃপুনঃ অগ্রসর হইয়া পরে আলো দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। একদা রাত্রে পুনরায় ঐ আলো দেখিতে পাইয়া সচ্চিদানন্দ একাকী একটী বন্দুক লইয়া আলো লক্ষ্য করিয়া পাহাড়ের উপর উঠিলেন। এইরূপ কয়েক ঘণ্টা অনবরত পর্ব্বতারোহণের পর অবশেষে সেই আলোর সন্নিকট হইলে দেখিতে পাইলেন, এক গুহার দ্বারে এক অতি শীর্ণকায় কঙ্কালসার বৃদ্ধ সেই আলো দেখাইতেছেন। সচ্চিদানন্দকে নিকটে পাইয়া ডাকিয়া বলিলেন, "আমি তোমার জন্য

অপেক্ষা করিতেছি। আমার দেহত্যাগের সময় আসিয়াছে। এখন আমার এই আসন তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং তদুদ্দেশ্যে তোমার সৈনিকের বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সাধুর জীবন যাপন করিতে হইবে এবং বেদান্তোক্ত সাধনচতুষ্টয়ের সাধনাদি করিতে হইবে।” অতঃপর সচ্চিদানন্দ সৈনিকের বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সাধু হন এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করেন।

স্বামী সচ্চিদানন্দের মুখে এই অপূর্ব্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া নলিনীকান্ত তখনই বুঝিতে পারিলেন যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী হইলেও সহজাত সংস্কার ও বৃত্তির সংস্কার কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হয় না এবং সেইজন্যই তাঁহার ভাষা এত কদর্য্য। ভাবের পরিবর্ত্তন হইলেও হাবিলদারের ভাষার কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। তখন বুঝিলেন ভগবানকে না চাইলেও হঠাৎ কাহারও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে ভাগ্যে ঘটিয়া যায়। শ্রুতিতে তিনি পড়িয়াছেন “যমেবৈষ বৃণুতে”—তিনি যাহাকে বরণ করেন, সে-ই তাঁহাকে পায়। ইহা পুস্তকে পাঠ করিলেও প্রত্যক্ষ বোধ করিতে পারেন নাই। ভাবিয়াছিলেন সচ্চিদানন্দ কতই না সাধনা করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানী হইয়াছেন! কিন্তু এখন বুঝিলেন, মহাসুকৃতিশালী পুরুষগণকে ভগবান্ এইরূপভাবে গুরুর ভিতর দিয়া কৃপা করেন। নলিনীকান্ত নিজের ক্ষুদ্র জীবনের কথাও তখন এক নিমেষের মধ্যে ভাবিয়া লইলেন। তাঁহার জীবনেই বা কি হইতেছে? স্ত্রীকে খুঁজিতে গিয়া জগজ্জননীর সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তারপর জগজ্জননী তাঁহার ভিতর থেকে বেরিয়েছেন ব'লে “আমি কে” জানিতে চাহিতেছেন; অতঃপর কি হয় কে জানে? তখন হইতে নলিনীকান্ত গালিকে আর গালি বলিয়া বোধ করিতেন না। আশ্রমজীবন সম্বন্ধে পরে তিনি আমাদিগকে নিজমুখে বলিয়াছেন “আমি সচ্চিদানন্দকে ভালবাসিয়াছিলাম। তিনিও আমাকে ভালবাসিতেন; তাই তাঁর অকথ্য

অত্যাচারও অনেক সহ্য করিতাম। শিষ্যদিগের ভিতর আমি ছিলাম ব্রহ্মচারী, সুতরাং আশ্রমজীবনের শেষের দিকে আমাকেই রন্ধন করিতে হইত। একদিন উনুনে হাঁড়ি চাপাইয়া দিয়া অন্তরাল হইতে তাঁহার ব্রহ্মজ্যোতিঃ বিভাসিত মুখের দিকে অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া বসিয়া আছি, রন্ধনের কথা ভুলিয়াই গিয়াছি; এদিকে ভাত পুড়িয়া গন্ধ বাহির হইল। তাহার পর অকথ্য তিরস্কার। আমি আর কোন কথা বলিলাম না, কেবল মনে মনে বলিলাম 'যদি তুমি বুঝিতে—যদি জানিতে, কেন ভাত পুড়িয়া গেল?'

"কিছুদিনের জন্য আবার ধার্য্য হইল ঘাস কাটা। সচ্চিদানন্দের একটা গরু ছিল—তার জন্য। সেই পাহাড়িয়া ঘাসের ভিতর একপ্রকার বড় বড় জোঁক থাকিত—জোঁকে আমার বড় ভয় ছিল। ঐগুলি আমাকে দেখিবামাত্র আক্রমণ করিত। অতঃপর মনে মনে বিচার করিলাম জোঁকে আমার এত ভয় কেন? জোঁক ত আমাকে গ্রাস করিতে পারিবে না। একদিন কতকগুলি জোঁক ধরিয়া গায়ে লাগাইয়া দিয়া বসিয়া রহিলাম। ক্রমে আমার সে ভয় দূর হইল। যখন হইতে আমার সে ভয় গেল তখন হইতে আমার ঘাস কাটা বন্ধ হইয়া গেল। তখন অন্য কাজের ভার পড়িল। কাঠ আহরণ আরম্ভ করিলাম। একদিন কুঠার-আঘাতে পা কাটিয়া গেল—রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল। তারপর সে কার্য্য ফুরাইল। অতঃপর ডিউটি হইল পুতুলমাজা। পরম বৈদান্তিকের লোকদেখান পুতুলপূজা—শুধু আত্মগোপনের জন্য। আমি বৈদান্তিক; পুতুল মাজিতাম আর পিতলের সেই নারায়ণ-বিগ্রহের দু'গালে জোরে জোরে চপেটাঘাত করিতাম। সে ছিল এক আনন্দের দিন। একদিন সচ্চিদানন্দ আমার স্কন্ধে এক বড় বোঝা চাপাইয়া দিয়া রাস্তায় বাহির হইলেন, রাস্তায় বড় কাদা; নিজে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া আগে আগে চলিলেন। আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ

চলিলাম। মাঝে মাঝে একটু দাঁড়াইয়া আনন্দাতিশয্যে এদিকে ওদিকে তাকাইয়া সেই কাদার ভিতর দুই একবার নাচিয়া লইলাম। আবার পথ চলিতে থাকিলাম।”

সচ্চিদানন্দের অন্য একটী প্রবল সংস্কার ছিল—ধূনির কাঠ কেহ ডিঙ্গাইতে পারিবে না। ডিঙ্গাইলে আর রক্ষা নাই। ইহার জন্য নলিনীকান্তের অনেক অকথ্য তিরস্কার সহ্য করিতে হইয়াছে। অবশেষে তিনিও জবাব দিতে আরম্ভ করিলেন। অধিক দিন একত্র বাসের ফলে ও স্নেহের দাবীর উপর সাহস সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাস দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পিতামাতার অনুমতি না হইলে সচ্চিদানন্দ শাস্ত্রানুযায়ী তাঁহাকে সন্ন্যাস দিতে পারিবেন না বলিলেন। তখন তাঁহার যুক্তি খণ্ডাইতে নলিনীকান্ত বলিলেন “কোন পিতা বা মাতা তাহার পুত্রকে সন্ন্যাস নিতে অনুমতি দেয় না। ব্যাস জগদ্‌গুরু, তিনি তাঁহার পুত্র শুকদেবকে সন্ন্যাস নিতে অনুমতি দিতে পারেন নাই ; শঙ্করকে তাঁহার মাতা স্বেচ্ছায় অনুমতি দেন নাই। আইনের চেয়ে নজির বড়।”

সচ্চিদাননন্দ হাসিয়া বলিলেন—“আরে তোম্‌সে বচনমে কৈ সাধু নেহি শকেগা।”

ব্রহ্মচারীদের সন্ন্যাসের দিকে লইয়া যাইতে হইলে জ্ঞানীগুরুগণ আশ্রমজীবনের কঠোরতার ভিতর দিয়া জীবের জীবত্ব নিষ্পিষ্ট করিয়া তাহাদের ভিতর আত্মার শক্তির স্ফুরণ করাইতে চেষ্টা করেন। সেই কঠোরতা সহ্য করিয়া যে-সমস্ত ব্রহ্মচারী হাসিমুখে, প্রফুল্লান্তঃকরণে, নির্ব্বিকারচিত্তে গুরুর আদেশ পালন করে—এমন কি গুরুর আদেশে যাহারা ব্যাঘ্রের লাঙ্গুল ধরিয়া আনিতে বলিলে মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা না করিয়া সেই আদেশ পালন করে, যাহারা কঠোরতা সহ্য করিতে করিতে এরূপ সহনশীল হইয়া যায় যে একখানা হাত কাটিয়া ফেলিলেও তাহারা

অশ্রুবিন্দু মাত্র বর্ষণ করে না, এইরূপ ব্যক্তিগণই জ্ঞানপন্থী সন্ন্যাসের একমাত্র অধিকারী হয়। আশ্রমের কঠোরতা, বিশেষতঃ খোট্টা গুরুর শাসনে নলিনীকান্তের জীবত্ব এইরূপ ভাবে নিষ্পিষ্ট হইয়াছিল যে তাঁহার আত্মার শক্তি সন্ন্যাসের পর কিরূপভাবে স্ফুরিত হইয়াছিল তাহা আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব।

সন্ন্যাস গ্রহণ—অনন্তর কয়েকদিন পর সচ্চিদানন্দ নলিনীকান্তকে সন্ন্যাস দিবার ইচ্ছা আপনা হইতেই প্রকাশ করিলেন। ১৩০৯ সালের ১১ই ভাদ্র দিন স্থির হইল। সন্ন্যাস লইবেন এই আনন্দাধিক্যে নির্জ্জনে কতক্ষণ নৃত্য করিলেন এবং আনন্দাতিশয্যে তাঁহার দৃষ্টি খুলিয়া গেল। চোখ বুজিলে ও চোখ মেলিলে একই প্রকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আজ যেন নাচিয়া উঠিতে লাগিল। মাথায় এতদিন যে জটাভার বহন করিতেছিলেন তাহা মুণ্ডন করিয়া ফেলিবার পর জলে দেখিতে পাইলেন যে জটার ঝাপটার ভারে কাণ আবৃত থাকায় উক্ত স্থান সাদা হইয়া গিয়াছে। নলিনীকান্তের মস্তকে পৃথক্ পৃথক্ জটা ছিল না। চুলের একটাই মাত্র ঝাপটা ছিল। মস্তক মুণ্ডন করিবার পর ভাল করিয়া স্নান করিলেন, পরে যাজ্ঞিক অনুষ্ঠান হইয়া গেল। নলিনীকান্ত নিগমের গূঢ় রহস্য অতি সত্বর আয়ত্ত করায় সচ্চিদানন্দ তাঁহাকে "**নিগমানন্দ**" নাম প্রদান করিলেন। নলিনীকান্ত সন্ন্যাসী হইলেন।

সন্ন্যাসী কাহাকে বলে এখন ইহাই আমাদের বিচার্য্য বিষয়। গুরু-শব্দ জ্ঞান বা ব্রহ্মবোধক। জ্ঞান অর্থে বিশ্বচৈতন্য বুঝাইলে অধিকতর পরিস্ফুট ও সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে। প্রত্যক্ষ চৈতন্যই কোন শুদ্ধসত্ত্বময় দেহকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া অপরকে সন্ন্যাস দেন। সন্ন্যাস দিলে কি হয়? উচ্চ অধিকারীকে সন্ন্যাস দিলে তাহার আমিত্ব ব্রহ্মসত্তায় ডুবিয়া যায়। তাহার নিজের কিছুমাত্র পৃথক্ অস্তিত্ববোধ বা

স্বাতন্ত্র্য থাকে না। এইরূপ ভাবের স্ফুরণ না হইলে অর্থাৎ নিজের পৃথক্ অস্তিত্ববোধ বিলুপ্ত না হইয়া গেলে তাহাতে ত্যাগ বা বৈরাগ্যের ভাব কখনই স্ফুরিত হইতে পারে না এবং সে কখনও প্রকৃত সন্ন্যাসী হইতে পারে না। কেবল উপযুক্ত গুরু হইলেই যে কোন শিষ্যের তদ্ভাব স্ফুরিত হইবে ইহা কখনই সম্ভব নহে। যেমন উপযুক্ত গুরু হওয়া চাই, তদ্রূপ উচ্চাধিকারী শিষ্য হওয়া চাই। কেবল তখনই গুরু নমস্তভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমোনমঃ" বলিলে অর্থাৎ যখন ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ শিষ্যকে প্রণাম করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে উচ্চাধিকারী শিষ্যে তদ্ভাব স্ফুরিত হওয়ায় সে আর ক্ষুদ্র থাকিবে না, গুরুর সমান হইয়া যাইবে। এই বোধ প্রকৃত ও প্রত্যক্ষভাবে না হইলে গুরুর প্রণাম গ্রহণ করিয়া শিষ্যকে কেবলই মলিন হইতে হয়। বন্ধনের প্রতীক যাজ্ঞিক সূত্র ভস্মীভূত করিলে উচ্চাবিকারীর সর্ব্ব বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়।

নিগমানন্দের সম্বন্ধে এই সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণ মিলিয়া গেল। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি তাঁহাকে প্রণাম করিবা মাত্র বাড়ী-ঘর, পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী এমন কি তাঁহার দেহের যাবতীয় বস্তুর সম্পর্কবোধ তথাকথিত সমস্ত সংস্কার স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া গিয়া প্রকৃত স্মৃতি— যাহাকে ব্রহ্মস্মৃতি বলে তাহাই জাগিয়া উঠিল। প্রত্যক্ষ মনে হইল যেন বিরাট সত্তার ভিতর অনন্ত সমুদ্রে ভাসমান দ্বীপপুঞ্জবৎ তাঁহাতে এই সমস্ত জগৎ ভাসিতেছে— তাঁহারই আলোকে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী উদ্ভাসিত হইতেছে। এইভাবে তাঁহার পৃথক্ ক্ষুদ্র অস্তিত্ববোধ লুপ্ত হইয়া গেল। অফুরন্ত ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দমাত্র সত্তা অনুভব করিয়া নিজেকে অনন্ত বলিয়া তাহার প্রত্যক্ষবোধ জাগিয়া উঠিল।

সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্ত্তী অবস্থা—১৩০৯ সালের ১১ই ভাদ্র সেই স্মরণীয় দিন—যে-দিন সন্ন্যাসের আনন্দোৎসব সহস্রমুখী হইয়া নিগমানন্দকে আত্মহারা করিয়া দিল। তখন হইতে তাঁহার এক নূতন

কাজের আরম্ভ হইল। প্রতিদিন তাঁহাকে কিছু না কিছু ভিক্ষা করিয়া আনিতেই হইবে এবং তদ্দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিতে হইবে। ভিক্ষা করিতে হইবে ঠিক ততটুকুই, যতটুকু তাঁহার একদিনের জন্য প্রয়োজন। দু'দিনের ভিক্ষা এক দিনে সঞ্চয় করা সন্ন্যাসীর অকর্ত্তব্য; সুতরাং দু'দিনের ভিক্ষা যে একদিনে করা যাইবে তাহাও নহে। আবার গৃহস্থের পাকে খাওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ। অথচ তাহাদের নিকট ভিক্ষা কিছু লইতেই হইবে। নিগমানন্দ গৃহস্থের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন, যাচ্ঞা করিবার পূর্বে যদি কেহ কিছু দিয়াছে তাহাই লইয়া আশ্রমে ফিরিয়াছেন। তাঁহার ভিক্ষার ঝুলি দেখিয়া যদি কেহ মুখ ফিরাইয়াছে, তিনি শূন্য ঝুলি লইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। গুরু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "ভিক্ষা লে আয়া ?" যদি উত্তর হইল "না" তবে "বাঙ্গালী অভিমানী, শালে মছ্‌লীখোর, ভোগী হ্যায়; ভোগ বহুত আ যায় গা, মগর্ আভি শালে কাহাছে আয়গা ?" ইত্যাদি নানাপ্রকার শ্লেষপূর্ণ উক্তি শুনিতে হইয়াছে। অপরের নিকট ভিক্ষা লওয়া তিনি কোন দিনই পছন্দ করেন নাই, ইহা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। পুরাকালের গুরুগৃহের কঠোরতার ন্যায় নিগমানন্দের আশ্রম-জীবনের কঠোরতা কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। বর্ত্তমানকালের সন্ন্যাসীগণ এ কঠোরতার বিন্দুমাত্রও অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবেন না।

চারিধাম পরিভ্রমণ ও ব্রহ্মবিচার—অতঃপর চারিধাম পরিভ্রমণ করিয়া চারি মহাবাক্যের বিচার করিতে গুরুর আদেশ হইল। চারিধাম পরিভ্রমণ করিয়া প্রতি ধামের প্রতিপাদ্য প্রত্যেক মহাবাক্য আত্মার ভিতর জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থগুলির ভিতর চারিটি ধাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বদরিকাশ্রম ত্যাগক্ষেত্র বলিয়া সন্ন্যাসীদের সর্ব্বপ্রথম বদরিকাশ্রম গমন করিয়া ত্যাগের সাধনার দ্বারা পার্থিব জগতে যাহা কিছু লোভনীয় আছে তাহার উপর হেয়জ্ঞান আনিতে হইবে।

চিরতুষারাবৃত হিমাদ্রিশিখরে যাইতে হইলে ত্যাগের ভাব স্বতঃই ভিতরে ফুটিয়া উঠে। জনবিরল হিমাদ্রির বুকের উপর আরোহণ করিলে ভিতর হইতে আপনি ধ্বনিত হয়—আমি কার, কে আমার! আমি কে? আত্মা। আত্মার স্বরূপ কি? 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। সুতরাং মুসুরির পথে বদরিনারায়ণ গমনে প্রস্তুত হইয়া কৌপীনমাত্রৈকসম্বল যুবক-সন্ন্যাসী নিগমানন্দ দীর্ঘ চিম্‌টা গুরুর পদতলে রাখিয়া নতজানু হইলেন। অশ্রুভারাক্রান্ত নয়ন তুলিয়া ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির ব্রহ্মজ্যোতি-উদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকাইলেন। মুখে ভাষা নাই—হৃদয়ের ভাব চায় গুরুর নিকট বিদায়ের চরণাশীর্ব্বাদ। চারিদিকে বাতাস যেন নিশ্চল হইয়া গেল, কলরব যেন সব থামিয়া গেল। একটা বিষাদের ছায়া সর্ব্বত্র ছাইয়া গেল, রবিরশ্মি যেন ম্লান হইয়া গেল। দয়ামায়াহীন নির্ব্বিকার চৈতন্যরূপী গুরুর হৃদয় দ্রব হইল। কে বলে সন্ন্যাসী ব্রহ্মজ্ঞের হৃদয় কাঁদে না শিষ্যকে বিদায় দিতে? ঋষি নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ; তিনি মুখ ফিরাইলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "ঠার্ যাও আভি।" নিগমানন্দের আর যাওয়া হইল না। কারণ গুরুর অনুমতি হইল না। কিন্তু তিনি তো সন্ন্যাসী। কে তাঁর গুরু? কিসের অনুমতি? তিনি তো আশ্রমী সন্ন্যাসী নন যে গুরুর কৃপার উপর নির্ভরশীল? তাঁহার নাকি বন্ধন নাই? এ যে দারুণ বন্ধন! যাঁহাকে একদিন ক্রোধভরে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, আজ সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহার নিকট এ কি দারুণ বন্ধনে আবদ্ধ? এ বন্ধন যে প্রেমের বন্ধন। গুরু যে তাঁহার হৃদয় জয় করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি জানিয়াছেন "সর্ব্বতীর্থময়ো গুরুঃ।" তিনি জানেন তাঁহার মুহূর্ত্তের কৃপায় সব স্ফুরিত হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু সে কৃপার অপেক্ষায় তিনি তো আর বসিয়া থাকিবেন না। হাসিমুখে তাঁহার বিদায়-আশীর্ব্বাদ-কবচ বুকে বাঁধিয়া সাধনা করিলেই তাঁহার সিদ্ধি।

অবশেষে কয়েক দিন পরে সচ্চিদানন্দ বলিলেন, "হাম্ ভি তোমারা সাথ যায়েঙ্গে।" আশ্রমের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া সচ্চিদানন্দ তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। পুষ্কর হইতে মুস্থরির দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলেন। এই পথে তিনি বদরিকাশ্রম যাইবেন এরূপ প্রকাশ করিলেন। সন্ন্যাসীর ভিতর জাতি কুল বিচার না থাকিলেও পশ্চিমা সাধুদের নিকট দেশভেদে জাতিবিভাগ হয়; এজন্য নিগমানন্দকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। পশ্চিমা সাধুগণ সন্ন্যাসী হইলেও তাঁহাদের সংস্কার এত প্রবল যে বাঙ্গালী সন্ন্যাসীদের সহিত তাঁহারা এক পঙ্‌ক্তিতে আহারে বসিতেন না। সুতরাং গুরুর সহিত পথপর্য্যটনে নিগমানন্দের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। পশ্চিমা সাধুগণ "বাঙ্গালী মছ্‌লীখোর" বলিয়া যখন তাঁহাকে এক পঙ্‌ক্তিতে লইয়া ভোজনে নারাজ হইত তখন নিগমানন্দও তাহাদিগকে পাল্টা জবাব দিতেন, "আমিও দায়োয়ান শ্রেণীর লোকের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে আহার করিব না। ইহারা আমাদের দেশে মাটী কাটে ও পাথর ভাঙ্গে।" এই বিষয় লইয়া পশ্চিমা সাধুদের সহিত তাঁহার প্রায়ই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইত। তখন সচ্চিদানন্দ তাঁহার সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতে বসিতেন ও চুপি চুপি বলিতেন, "ঘাবড়াও মৎ লেড়কা, খানাকা বাস্তে এ সব লোক সাধু হুয়া, আস্‌লি নেহি।" সচ্চিদানন্দ তাঁহাকে "শালে মছ্‌লীখোর" বলিয়া গালি দিতেন বটে, আবার তাহার অসাক্ষাতে বাঙ্গালীর ভূয়সী প্রশংসাও করিতেন। এই হিন্দি বলিতে বলিতে নিগমানন্দের জিহ্বা যেন পুরু হইয়া গিয়াছিল বলিয়া তাঁহার মনে হইত। কখনও বাঙ্গালীর দেখা পাইলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতেন। যাহা হউক, এইরূপ ভাবে পথ চলিতে চলিতে উভয়ে একটী আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ আশ্রমে একটী পালিতা কন্যা ছিল। তখন সে বয়স্থা ও বিবাহযোগ্যা হইয়াছে। তাহার বিবাহ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া সচ্চিদানন্দ

নিগমানন্দকে রাগাইয়া রঙ্গ দেখিবার জন্য বলিলেন, "আরে লেড়্‌কা, তোম্‌ লেড়্‌কীকো সাদি কর্‌ লেও।" নিগমানন্দও ঠিক তার পাল্টা জবাব দিলেন, "আপ্‌ সাদি কর্‌ লিজিয়ে"। খুব খানিকটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। তখন আশ্রমে আর একটি আকুমার ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া সচ্চিদানন্দ বলিলেন, "উস্‌কো সাথ সাদি হো জায়গা।" ব্রহ্মচারী উত্তেজিত হইয়া সচ্চিদানন্দকে খুব গালাগালি দিল। সচ্চিদানন্দ হাসিতে লাগিলেন। ঐ আশ্রমে ২।৪ দিন অবস্থানের পর পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন।

মসুরি পার হইয়া পাহাড়ের গায়ে বনকুসুমের প্রাণমাতান সৌরভ ও সুষমা ভোগ করিতে করিতে—নানা জাতীয় অদৃষ্টপূর্ব্ব মনোহর বনবিহঙ্গ-গণের শ্রুতিবিনোদনকারী কলকূজনে বিশ্বের সৌন্দর্য্যসম্ভারে মুগ্ধ হইতে হইতে—পাহাড়ের গায়ে বনস্থলীর মাঝে ছোট ছোট সহরে সুধাধবলিত সৌধশ্রেণী দর্শন করিতে করিতে উভয়ে পথ চলিতে থাকিলেন। পাহাড়ের বুকের উপর দিয়া আঁকাবাঁকা সর্পগতি কাঁকরময় পথে কোথাও উঠিয়া কোথাও নামিয়া কোথাও বা মাথা নত করিয়া চলিয়া মাঝে মাঝে জনবিরল চটীতে বা গাছতলায় অবস্থান করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সচ্চিদানন্দ পশ্চিমা সাধু, নগ্নপদে তাঁহার পথচলা অভ্যাস ছিল। আর নিগমানন্দ বাঙ্গালা, কিন্তু জ্ঞানলাভের পিপাসায় এই সমস্ত কষ্টে তাঁহার আদৌ খেয়াল ছিল না। তাঁহার পায়ের নখগুলির ভিতর রক্ত জমিয়া কাল হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালী ননীগোপাল সন্ন্যাসীগণ যাঁহারা কেবল বহুদর্শিতার জন্য পাহাড় অতিক্রম করেন তাঁহারা তাঁহাদের সুকোমল চরণগুলি চর্ম্মপাদুকার দ্বারা সুরক্ষিত করেন ও সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ লইয়া যান। নিগমানন্দ এ সব করিতে পারিতেন না বা ঐ সবে তাঁহার খেয়ালও ছিল না। কারণ জীবত্বনাশই তাঁহার সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য! সুতরাং দেহের প্রভাবকে কোনওমতে তাঁহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার

করিতে তিনি প্রশ্রয় দেন নাই। গায়ে একটী মাত্র কম্বলই তাঁহার সম্বল। শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই সহ্য করিয়া দ্বন্দ্বাতীত হইতে হইবে। সুতরাং একে নিগমানন্দ বাবু অর্থাৎ বাঙ্গালী, তারপর আবার বাবু সাজিলে সন্ন্যাসের সং সাজিয়া পরিণামে রম্ভা চুষিতে হইবে ভাবিয়া সচ্চিদানন্দ সর্বদা সতর্ক প্রহরীর মত গাভীর ন্যায় বৎস নিগমানন্দের পিছু পিছু ছুটিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের কোনই প্রয়োজন ছিল না। কেবলমাত্র শিষ্যের প্রয়োজনেই তিনি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন। সদ্‌গুরুর কী অসীম দয়া! শিষ্যের জন্য তিনি কী না করিতে পারেন? অনাহারে ও কৃচ্ছ্রতায় নিগমানন্দের শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিল। ছাতুখোর গুরুর সহিত পথ চলায় তাঁহাকেও ছাতুখোর হইতে হইয়াছিল, কারণ কোনওক্রমে রসনাবৃত্তি যেন তীক্ষ্ণ হইয়া না উঠে। রসনাবৃত্তি তীক্ষ্ণ হইলে তার সঙ্গে সঙ্গে সব বৃত্তিগুলিই মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে।

বদরিকাশ্রম ত্যাগভূমি। সুতরাং যাহা কিছু মানবের জীবত্ব তাহা ত্যাগ করিতে করিতে বদরিকাশ্রমে পৌঁছিলে অর্থাৎ ত্যাগ সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য তাহাতে সত্য হইবে, ইহাই ঐ মহাবাক্য বিচারের তাৎপর্য্য। পাঠকগণ বদরিকাশ্রমের পথের বিবরণ বা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত অনেক মহাপুরুষের জীবনচরিতে পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং তাহা সন্নিবিষ্ট করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এই ভ্রমণে যতটুকু সাধুত্বের বিকাশ তাহাই আমরা লিপিবদ্ধ করিব ও তৎপ্রসঙ্গে বিশেষ ঘটনাগুলি পাঠকের গোচরীভূত করিব। যাহা হউক এইভাবে পথ চলিতে চলিতে একস্থানে দিবাকর অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িলেন। সুবিধামত স্থান বা চটী না থাকায় সচ্চিদানন্দ বলিলেন, "এ স্বামীজি! আভি কাহা যায়েঙ্গে; বহুৎ আন্ধি

নিগমানন্দ। হাম্ বিল্‌কুল্ নয়া আদ্‌মি। কুছ্ নেহি জান্‌তা।

সচ্চিদানন্দ। আউর দু'ক্রোশ ফারাক্‌মে বহুৎ বড়িয়া এক আউরাত মোহান্তকা আস্তানা হ্যায়। আভি চল্‌নে শাকেগা ?

আউরাত সাধু আবার কি প্রকার ? স্বামী নিগমানন্দ একটু কৌতূহলবশে বলিলেন, "কাহে নেহি ?"

গৌরীমার আশ্রম—অতঃপর গুরু শিষ্য উভয়ে চলিতে থাকিলেন। গভীর রাত্রে পার্বত্য অন্ধকারে কোলের মানুষকে পর্য্যন্ত চেনা যায় না। কোনও প্রকারে পথ চলিতে চলিতে অবশেষে তাঁহারা গৌরীমার আশ্রমে উপনীত হইলেন। পাহাড়ের বুকের ভিতর আশ্রমটী সর্ববিধ সাড়া-শব্দহীন। গৌরী যেখানে থাকেন তাহা হইতে অনতিদূরে তাঁহার শিষ্যদের থাকিবার স্থান। লতাপাতা ঘেরা ক্ষুদ্রায়তন চারি কুঠ্‌রীযুক্ত একটী ক্ষুদ্র গৃহে তিনি থাকেন। সচরাচর তিনি নগ্নাই থাকেন, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে মাত্র বস্ত্র পরিধান করেন। বয়স তাঁহার কত কেহ বলিতে পারে না, কিন্তু দেখিতে ঠিক বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের দেহের গঠনের ন্যায়, বয়স অনুমান ২৭।২৮। সচ্চিদানন্দ বলিয়াছেন যে তিনি সাধু হওয়া অবধি তাঁহাকে এইরূপই দেখিতেছেন। তাঁহার বয়স যাহা শুনিয়াছি তাহা সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য নহে। যাহা হউক এখানে বিনা অনুমতিতে পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই। গৌরীর সহিত সচ্চিদানন্দের পরিচয় ছিল। সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি হইলে স্বামী নিগমানন্দও তাঁহার অনুগামী হইলেন। সচ্চিদানন্দের সহিত গৌরীর কি কথাবার্ত্তা হইল তাহা বুঝা না গেলেও তিনি বাঙালী তরুণ সন্ন্যাসীর দিকে একবার কিছুক্ষণের জন্য তাকাইলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না।

বদরিকাশ্রম—অতঃপর গৌরীর নিকট বিদায় লইয়া নানা স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে চিরতুহিনাবৃত রজতকান্তি প্রদেশে আসিয়া

উপনীত হইলেন। এই সেই ত্যাগভূমি বদরিকাশ্রম—যেখানে একদিন এক বদরীবৃক্ষের নিম্নে বসিয়া মহামুনি ব্যাস তাঁহার তপঃপ্রভাবে সমগ্র ভারতকে পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই সেই পূত ভূমি, যে-স্থানে স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" উপলব্ধি করিতে সন্ন্যাসী মাত্রকেই সঙ্কেত করিয়া গিয়াছেন। এই সেই ভূমি—যেখানে ইহলোকের বাসনা-কামনা দূরে ফেলিয়া মানব তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে আইসে। এখানে গুরুর সহিত স্বামী নিগমানন্দ বিমল শান্তি অনুভব করিতে থাকিলেন এবং কয়েকদিন অবস্থান করিয়া আত্মধ্যান করিতে লাগিলেন। অতঃপর কয়েকদিন পরে মানস সরোবর দর্শনে যাত্রা করিলেন।

মানস সরোবর—কয়েকদিন পথাতিবাহনের পর তাঁহারা মানস সরোবরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কী অপূর্ব সৌন্দর্য্য—মরজগতে হিমাদ্রির নিভৃত নিলয়ে এমন নয়ন-মনবিমোহনকারী দৃশ্য লুক্কায়িত আছে তাহা ইতিপূর্বে নিগমানন্দ কখনও কল্পনায় আনিতে পারেন নাই। বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ নীলাম্বু—সুবৃহৎ পদ্মপত্র ও তদ্রূপ প্রস্ফুটিত পদ্মের অপূর্ব শোভা—দুগ্ধধবল অসংখ্য কলহংসের শ্রুতিমধুর কাকলি সরোবরের নিভৃত সুষমা বৃদ্ধি করিতেছে। এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্যে আনন্দাধিক্যবশতঃ অকস্মাৎ নিগমানন্দের পূর্বের ন্যায় দৃষ্টি খুলিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, সরোবরের অপর তীরে বহুসংখ্যক যৌবনভারাবনতা সুন্দরী তরুণী নগ্নকায়ে সরোবরে সন্তরণ করিতেছে। এইস্থানে দেবকন্যাগণ ভিন্ন আর কাহার পক্ষে স্নান করা সম্ভব? সুতরাং কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া নিগমানন্দ তাঁহার গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কোন্ আস্নান করতে হে?" সবিস্ময়ে সচ্চিদানন্দ বলিলেন, "আরে স্বামীজী! তোমারা আঁখ্ খুল্ গিয়া! দেখ্‌লেও, আউর বহুৎ দেখ্‌নোকো চিজ্ হ্যায়। এ সব অপ্সরী হ্যায়।" এই প্রসঙ্গে স্বামী নিগমানন্দ আমাদিগকে বলিয়াছেন—সপ্তলোকের প্রতি লোকেই সাতটী করিয়া স্তর আছে। এই উনপঞ্চাশ স্তরে উনপঞ্চাশ

বায়ু। লোকসমূহের উৎকর্ষ অপকর্ষ অনুসারে বায়ুরও তারতম্য আছে। পৃথিবীতে যে সপ্ত স্তর আছে উহার ভিতর নিম্নস্তরের জীব উচ্চস্তরের জীবকে দেখিতে পায় না। কেবল যাহাদের দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছে তাহারাই মাত্র দেখিতে পায়। যোগীদের অতীন্দ্রিয়দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। যাহাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয় নাই তাহারা লোকালয়ে যাহা দেখে, হিমালয় প্রভৃতি স্থানেও তদধিক কিছুই দেখিতে পায় না।

অতঃপর তাঁহারা তথা হইতে আরও অগ্রসর হইতে থাকিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন এক বিরাট সর্প এক স্থানে কুণ্ডলী করিয়া মিটি মিটি তাকাইতেছে। সাধু-সন্ন্যাসীগণ বলিল, "এ সর্প-আটা ময়দা ভিন্ন আর কিছুই আহার করে না।" পরম হিংস্র জীব—স্থানমাহাত্ম্যে তাহাতে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই সর্প প্রসঙ্গে সচ্চিদানন্দ বলিলেন, "আরে বাচ্চা কেয়া তোম্ দেখেগা, আর কেয়া হাম্ বোলেগা ? এ সাঁপ পরমহংস হো গিয়া।" স্বামী নিগমানন্দ চমৎকৃত হইলেন। গুরুর পিছনে নিজের অবশ দেহরথ চলিতে লাগিল। হিমাদ্রি তাহার বুকে যে কি অমূল্য সম্পদ ধারণ করিয়া আছে তাহা ধারণা করিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। স্বামী নিগমানন্দের দৃষ্টিপথে আরও কত শত দৃশ্যপট যে খুলিয়া গিয়াছিল তাহার বিবরণ দেওয়া বৃথা প্রয়াস মাত্র। পথাতিবাহনহেতু শ্রান্তির জন্য অতঃপর তাঁহারা পুষ্করে ফিরিতে মনঃস্থ করিলেন।

সচ্চিদানন্দের উপর গৌরীর আদেশ—পুষ্করে ফিরিবার পথে গৌরীমার আশ্রমে সশিষ্যে সচ্চিদানন্দ পুনরায় আসিয়া উপনীত হইলেন। গৌরীমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইবার সময় স্মিতমুখে নিগমানন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গৌরী সচ্চিদানন্দকে বলিলেন, "অগর্ তোমারা সাগ্‌রেৎ কভি নির্ব্বিকল্পমে আ যায়, উছ্‌কো মেরা পাছ্‌ ভেজ্‌ দেনা।" কথাটী গৌরী এরূপভাবে বলিলেন যে উহা

নিগমানন্দের কর্ণে পৌছিল। অতঃপর ঐ প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে করিতে তাঁহারা আশ্রম হইতে বাহির হইলেন ও নানা চটীতে বিশ্রাম করিতে করিতে আর একটি আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বদরিকাশ্রম যাইবার সময় এই আশ্রম হইয়া গিয়াছিলেন। তখন সেই আশ্রমে যে পালিতা কন্যাটীকে ঐ আশ্রমভুক্ত একটী ব্রহ্মচারীকে সচ্চিদানন্দ "সাদি" করিতে বলিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন তাঁহার সেই কথাটী খাঁটি হইয়া গিয়াছে। ঐ ব্রহ্মচারীটী তাহাকে বিবাহ করিয়া স্বামী-স্ত্রী ভাবে বসবাস করিতেছে। তাহাদের এই নূতন গৃহস্থালিতে অনেক জিনিসপত্রের অভাব দেখিয়া সচ্চিদানন্দ কয়েকখানি থালা বাসন কিনিয়া তাহাদিগকে উপঢৌকন দিলেন। এই আশ্রম হইতেই সচ্চিদানন্দ নিগমানন্দকে অন্যান্য ধাম একাকী পরিভ্রমণ করিবার জন্য বিদায় দিলেন। অতঃপর নিগমানন্দ দ্বারকা-অভিমুখে রওনা হইলেন ও পদব্রজে বহুদিন পথাতিবাহন করিয়া দ্বারকায় আসিয়া উপনীত হইলেন।

দ্বারকা— দ্বারকা ঐশ্বর্য্যক্ষেত্র। এখানে ভগবান্ এক নরলীলায় যতটা সম্ভব ঐশ্বর্য্যের লীলাখেলা করিয়া গিয়াছেন। ভারতের অন্য কোথায়ও ঐরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হয় নাই। এই স্থানে শঙ্কর সারদা মঠ স্থাপন করেন। এই স্থানে সামবেদের "তত্ত্বমসি"—সেই তুমি হও অর্থাৎ তিনি যে আমি—তাঁহারই প্রকাশ আমার ভিতর দিয়া অথবা তিনি ও আমি চিদংশে এক, এই সমস্ত ভাব হৃদয়াভ্যন্তরে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। তিনিই যে প্রতি জীবের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছেন ইহা পুস্তকাদির সাহায্যাপেক্ষা, এই ভাবে তদ্ভাববোধক তীর্থে গিয়া বিচার করায় সহজে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দিকে লইয়া যায়। কারণ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী জ্ঞানপন্থী। নিগমানন্দ ঐ সময়ে আসিয়া দেখিলেন যে উক্ত মঠে কোন মোহান্ত নাই। মঠের কর্ত্তৃত্ব যাহা কিছু

সমস্তই একটি বৃদ্ধার হস্তে। কিয়দ্দিবস তথায় অবস্থান করায় বৃদ্ধাটী তাঁহার উপর আকৃষ্ট হইলেন। স্বামী নিগমানন্দও তাঁহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় বিশেষ আদর যত্ন যে কেন করিতেন তাহার উদ্দেশ্য এই যে উক্ত মঠে কোনও মোহান্ত না থাকায় বৃদ্ধা তাঁহাকে দ্বারকা মঠের মোহান্ত করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। দ্বারকা মঠে বেশ কিছুদিন আরামে অবস্থিতি করিতেছেন এমন সময় একদা এক ভৈরবী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। ভৈরবীটী পূর্ণ-যৌবনা, হস্তে ত্রিশূল। তাহার সহিত স্বামী নিগমানন্দের সাক্ষাৎ হইল। তখন হইতেই ভৈরবী ক্রমশঃ তথায় যাতায়াত করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে নিগমানন্দ জানিতে পারিলেন যে সে যশোহর জেলার জনৈক ব্রাহ্মণের কন্যা। ভৈরবীটী নিগমানন্দের সন্ন্যাসের পন্থা যে ভুল এবং তাহার অবলম্বিত পন্থাই যে কলিকালে সত্য তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানাপ্রকার তন্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ ও যুক্তিতর্কের অবতারণা করিল। ভৈরবীটী একে সুন্দরী, তাহাতে যুবতী। ইহা ছাড়াও তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য সচরাচর ভৈরবীদিগের ভিতর দৃষ্টিগোচর হয় না। সে যাহা হউক ভৈরবীটীর ক্রমাগত যাতায়াতে স্বামী নিগমানন্দ তাহার নারীত্বে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন। সে তখন নিগমানন্দকে যুক্তি দিল যে তন্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে তাহাদের শৈব বিবাহ পর্য্যন্ত হইতে পারে। নিগমানন্দ তখন তাহার নারীত্বে মুগ্ধ হইয়া এইরূপ বিবাহে মত দিলেন। ভাবিলেন মন্দ কি, মঠের কর্ত্রী তাহাকে মোহান্ত মনোনীত করিয়াছে। সুতরাং মঠের মোহন্তগিরি করাও যাইবে এবং তন্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে বিবাহ করিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করাও হইবে। ধর্ম্মাচরণ করিতে গিয়া উভয়দিক্ বজায় থাকায় এইরূপ শৈব বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গেল। বিবাহের পূর্বদিন রাত্রে মন দৃঢ় করিয়া তিনি নিদ্রিত হইলেন। নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, ভৈরবীর সহিত

তাঁহার বিবাহ। ভৈরবী তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছে। স্বপ্নে তাঁহার মনের ভিতর নববধূ সমাগমে যেরূপ কৌতুকময় ভাব আইসে ঠিক সেইরূপ ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। গুরুদেব স্বামী সচ্চিদানন্দের হাঁটিবার সময় তাঁহার হস্তস্থিত ৪॥ সের ওজনের চিম্‌টায় যেরূপ ঝন্ ঝন্ শব্দ হইত, নিগমানন্দ যেন তদ্রূপ শব্দ শুনিতে পাইলেন ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাঁহার মনের ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখিতে পাইলেন যে ভৈরবীর সর্ব্বাঙ্গ মাখনের মত গলিয়া পড়িতেছে। সর্ব্বাঙ্গ গলিয়া গিয়া অবশিষ্ট রহিল তাহার কঙ্কালরাশি। তখন সেই কঙ্কালটী দুই বাহু-বেষ্টনীতে নিগমানন্দকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল ও সঙ্গে সঙ্গে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িলেন ও অবিলম্বে তাঁহার লোটা কম্বল লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। মঠের কর্ত্রী বৃদ্ধারও তাঁহার চীৎকারে নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিয়া নিগমানন্দের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল যাহাতে তিনি মঠ ত্যাগ করিতে না পারেন। কারণ বৃদ্ধা যে তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু নিগমানন্দ তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দৌড়াইলেন। এমন দৌড় দিলেন যে কোথায় কতদূর গিয়া তাঁহার দৌড় থামিল তাহার ঠিক ছিল না। স্বামী নিগমানন্দ এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন "সদ্‌গুরু অধিকাংশ সময় স্বপ্নের ভিতর দিয়া শিষ্যদিগকে পরিচালিত করিয়া থাকেন।"

অতঃপর তিনি করাচী হইয়া কতিপয় সাধুর সহিত উষ্ট্রপৃষ্ঠে হিম্‌লাজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হিম্‌লাজে দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র পতিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত। সমাধি অবস্থায় যে-প্রকার জ্যোতিঃ দর্শন হয়, এই কূপ মধ্য হইতে তদ্রূপ স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতে দেখা যায়।

এই পীঠস্থানে তিনি বহু সাধু-সন্ন্যাসীকে অবস্থান করিতে দেখিলেন। এখানে বহু মুসলমান ফকিরকেও দেখিতে পাইলেন। ইহারা স্থফি নামে পরিচিত। ধর্ম্মলাভের উদ্দেশ্যে একই স্থানে হিন্দু মুসলমান—এই ভেদবুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া গিয়া সবাই এক ভগবানকে পাইবার জন্য মিলিত হইয়াছে দেখিয়া বড়ই তৃপ্ত হইলেন। তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া পুনরায় করাচীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বরদা—অতঃপর তিনি বরদা রাজ্যের ভিতর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। বরদা রাজ্যে মঠের বা দেবালয়ের খাতির খুব বেশী। ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া যে সমস্ত মোহান্তগণ হিন্দুধর্ম্মের "প্রতীক" বলিয়া সমাজে পরিচিত হইতেছেন তাঁহাদের আধ্যাত্মিক দৈন্য দর্শনে হিন্দুধর্ম্মে কত যে আগাছা জন্মিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া দুঃখিত হইলেন। আফিংএর নেশার ঘোরে তাহাদের দিবানিশি অতিবাহিত হয়। ব্যভিচার দোষদুষ্ট জীবন অতিবাহনে তাহাদের চোখের চারিদিকে কাল হইয়া গিয়াছে—এমন কি লোকজনের সহিত বাক্যালাপ করিবার সময়ও তাহারা ঝিমাইতে থাকে। এই সব দেশে দেবদাসীর প্রথা এখনও প্রচলিত। দেবসেবার জন্য পিতামাতা কর্ত্তৃক তাহাদের কন্যার জীবন উৎসর্গীকৃত হয়। দেবালয়ের মোহান্তের শিক্ষার প্রভাবে তাহাকেই দেবতা মনে করিয়া কন্যাগণ দেহের দ্বারা তাহার ইন্দ্রিয়ে ইন্ধন যোগাইয়া তাহার ও নিজের ইহপরকালের সর্ব্বনাশ সাধন করে। অবশ্য এই সমস্ত মোহান্তগণ ছান্দোগ্যোপনিষদের পোষক সূত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়াই ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকে। নিগমানন্দ বরদা রাজ্যের যতই দক্ষিণে যাইতে থাকিলেন ততই তিনি দাক্ষিণাত্যবাসীদের তামিল ভাষা বুঝিতে অপারক হইয়া অত্যন্ত অসুবিধার ভিতর পতিত হইতে থাকিলেন। সাধু দেখিলে এতদ্দেশীয়গণ সমাদর করে, অযাচিতভাবে ভিক্ষা দেয়। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে ভিক্ষালব্ধ চাউল, ডাইল, লবণ,

লঙ্কা, আলু, পটল প্রভৃতি যাহাই পাইয়াছেন সবই একসঙ্গে সিদ্ধ করিয়া তিনি কোনমতে উদরপূর্ত্তি করিয়াছেন। সন্ন্যাসজীবনে রসনাবৃত্তিকে কখনই প্রশ্রয় দেন নাই। এইরূপ ভাবে দেহজ স্থূলপ্রভাবকে ক্লিষ্ট করিতে করিতে রামেশ্বরে উপনীত হইলেন।

রামেশ্বর—রামেশ্বর কর্ম্মক্ষেত্র। ভগবান ত্রেতাযুগের নরলীলায় এই স্থানকে কর্ম্মক্ষেত্ররূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন বলিয়া জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য রামেশ্বরে শৃঙ্গেরী মঠ স্থাপন করেন। এই মঠে আসিয়া বৈদিক সন্ন্যাসীগণ যজুর্ব্বেদের "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্য ধ্যান অর্থাৎ আমি দেহাতিরিক্ত বস্তু আত্মা এবং সেই আত্মাই অনন্ত অসীম, ইহাই ধ্যান করিয়া নিজের সত্তাকে ব্রহ্মসত্তায় নিমজ্জিত করিয়া ব্রহ্মভাবে ভরপুর রহিবেন, ইহাই এই মঠে আসিয়া বিচারের তাৎপর্য্য। নিগমানন্দ এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া মাদ্রাজের ভিতর দিয়া শ্রীক্ষেত্রে উপনীত হন।

শ্রীক্ষেত্র—শ্রীক্ষেত্র ভোগক্ষেত্র এবং পুরুষোত্তমতীর্থ। পুরুষোত্তম জগন্নাথের বাহ্যিক ভোগের বহরটা পুরীতে যেরূপ স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তদ্রূপ আর কোথায়ও দেখা যায় না। এই ভোগ-ক্ষেত্রে শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন মঠ স্থাপিত হয়। ঋক্‌বেদের মহাবাক্য "প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম" এই স্থানে বিচার্য্য। অন্তঃকরণবৃত্তিকে ব্যাপিয়া যে চৈতন্য—যে চিৎসত্তা সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত—সর্ব্ববস্তুতে অনুস্যূত, আমাদের অন্তরেও বিরাজিত—যাহা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ—তাহা প্রজ্ঞান বা ব্রহ্ম। এই প্রজ্ঞান বা ব্রহ্মকে জানিবার অনুভব করিবার —সেই সত্তাতে পরিণত হইবার বিষয়ই ধ্যেয় ও বিচার্য্য। পূর্ব্বোক্ত মঠত্রয়ে আত্মার সহিত ব্রহ্মের ঐক্যই বিচার্য্য ছিল। এইক্ষণে ব্রহ্মের স্বরূপ বিচার্য্য ও ধ্যেয়।

নিগমানন্দ বৈদিক সন্ন্যাসী। তিনি আচার্য্য শঙ্কর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাস সাধনের কেন্দ্রস্বরূপ মঠচতুষ্টয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য

দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। প্রথমটী যোশীমঠ; বদরিকাশ্রম চিরতুহিনাবৃত রজতকান্তি উত্তুঙ্গ পর্ব্বতে আসিয়া শিরোপরি অসীম মুক্তাকাশের নিম্নে দিগন্তবিস্তারী বরফের শ্বেতবিস্তার ও অপর মঠত্রয় সমুদ্রতীরবর্ত্তী হওয়ায় ব্রহ্মের ব্যাপকত্বের ও গুরুত্বের আভাস আপনা হইতে ফুটিয়া উঠে দেখিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মহিমায় ও করুণায় মুগ্ধ হইতে হইতে পুষ্করে গুরু সচ্চিদানন্দের আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইবার পর যে যে স্থানে গিয়াছিলেন এবং যে স্থানে যে যে বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে তৎসমস্তই তাঁহাকে নিবেদন করিলেন।

অতঃপর দেশপর্য্যটনজনিত শ্রান্তি বিদূরিত হইলে নিগমানন্দ সচ্চিদানন্দকে বলিলেন, বেদান্তদর্শন পাঠ করিয়া ও চারিধাম পরিভ্রমণ করিয়া তিনি যে ব্রহ্মতত্ত্বকে বিচারের দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন ঐ সমস্তই পরোক্ষ জ্ঞান। এইক্ষণে তিনি ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে চান।

ইহাতে স্বামী সচ্চিদানন্দ সাতিশয়পুলকিত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছি বাৎ হ্যায়।" কিন্তু নিগমানন্দকে বুঝাইলেন যে তিনি যে পন্থায় উক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন সেই পন্থারই মাত্র তিনি সন্ধান রাখেন। উক্ত পন্থা বড়ই দুরূহ ও কষ্টসাধ্য। কৃচ্ছ্র সাধনার ক্লেশ তিনি সহ্য করিতে পারিলেও ঐ পন্থায় সত্যলাভ করিতে নিগমানন্দের বহুদিন প্রয়োজন হইবে। তিনি যেরূপ বুঝিয়াছেন ও দিব্য দৃষ্টিতে যাহা দেখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মনে হইতেছে যে পঞ্চকোষ-বিবেকী কোন যোগীগুরুর অনুসন্ধান করিয়া যোগসাধনা করিলে অতি অল্প সময়ের ভিতরেই পরমাত্মতত্ত্ব নিগমানন্দের উপলব্ধি হইবে এবং তখনই বিনা আয়াসেই ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ব্বিকল্প সমাধির ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিবে— "নির্ব্বিকল্প আপ্‌সে আ যায় গা।" অর্থাৎ সোজা কথায় একজন যোগীগুরুর প্রয়োজন।

আবার গুরু অনুসন্ধান। নিগমানন্দ যেন কিরূপ একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন। তাঁহার মুখখানি ছাইয়ের ন্যায় পাংশু হইয়া গেল। সাক্ষাৎ ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ পরমজ্ঞানীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া পুনরায় গুরু অন্বেষণ যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা মনে চিন্তা করায় একটা হতাশার ছায়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। স্বামী সচ্চিদানন্দ তাঁহার এতাদৃশ বিষণ্ণভাব দর্শনে বলিলেন, "ঘাবড়াও মৎ লেড়কা, যোগীগুরু জরুর মিল্ যায় গা—বহুৎ তুরন্ত্ মিল্ যায় গা।" নিগমানন্দ একবার মনে ভাবিলেন যে বর্ত্তমান জ্ঞানীগুরুর পন্থায়ই সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন, কিন্তু সে নাকি বহুদিন সাধনসাপেক্ষ; তাঁহার যে তত বিলম্ব সহে না। সুতরাং যোগীগুরুর অন্বেষণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া তিনি গুরুর আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তে বিদায় লইলেন। একান্ত দুঃখিতান্তকরণে সচ্চিদানন্দ নিগমানন্দকে বিদায় দিলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দৃষ্টিপথে দেখা যাইতে লাগিল—সতৃষ্ণ নয়নে সচ্চিদানন্দ তাঁহার পথের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর নিগমানন্দ স্থূলদৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িলেন।

কোটা রাজ্যে পথভ্রান্তি ও যোগিনীর আশ্রয়—গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিগমানন্দ ঘুরিতে ঘুরিতে কোটা রাজ্যের শেষ সীমায় আসিয়া উপনীত হইলেন। কোটা করদরাজ্য—পার্ব্বত্যপ্রদেশ—বন্ধুর পথ—দণ্ডীর নগ্নপদে অনতিক্রমণীয়; শ্বাপদসঙ্কুল পার্ব্বত্যপ্রদেশ। দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভিতর জনবিরল সঙ্কীর্ণ পথ, উভয়দিকে উচ্চ পর্ব্বত। যতই অগ্রসর হন সে পথের যেন আর সীমা নাই। বুঝিলেন তাঁহার পথভ্রান্তি হওয়ায় বিপথে চলিয়াছেন। কিন্তু যতদূর আসিয়াছেন ততদূর ফিরিয়া গিয়া পুনরায় পথানুসন্ধান করা তাঁহার শ্রান্ত শরীরে অসম্ভব; তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ, নগ্ন পদ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তরঞ্জিত। প্রখর আতপ তাপ সহ্য করিয়া সেই পার্ব্বত্য জঙ্গলের এক বৃক্ষবিরল প্রদেশে আসিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে চাহিলেন কোন ঝরণা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন না। তখন আকাশে সূর্য্য ঢলিয়া পড়িয়াছে—আসন্ন সন্ধ্যা। এমন সময় অদূরে একটী যুবতীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পাইলেন। বিজন গহন বনে লোক দেখিয়া কতকটা আশ্বস্ত ও কতকটা বিস্ময় বোধ করিলেন। স্ত্রীলোকটী আগন্তুককে দেখিয়া তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিল, "নিগমানন্দ!" যেন কতকালের পরিচিত সে। সহজ সরল তাহার আহ্বান—যেন সর্ব্বপ্রকার সঙ্কোচ ও ভয়শূন্য। বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে নিগমানন্দ তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। এই জনবিরল জঙ্গলে স্ত্রীলোক, এ যে বড় অদ্ভুত! উপরন্তু এ ত আর পার্ব্বত্য বা জঙ্গলী কোল-ভীলের ন্যায় আকৃতিসম্পন্ন নয় যে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিবে না এবং ডাকিল একেবারে তাঁহার নাম ধরিয়া। নাম সে কি প্রকারে জানিল? এইরূপ কৌতূহলোদ্দীপক নানা প্রশ্নের উত্থানবিলয় হইতে হইতে নিগমানন্দ তাহার সমীপস্থ হইলে যুবতীটী বলিল "তোমার বড় পিপাসা পেয়েছে, আর একটু এগিয়ে যাও, তথায় একটী পর্ণকুটীর দেখ্‌তে পাবে।

সেখানে ঝরণাও আছে, ইচ্ছা হ'লে বিশ্রাম করে যেতে পারবে।" যুবতীর বাক্য অনুসারে ত্বরিতপদে নিগমানন্দ চলিতে থাকিলেন, কারণ সন্ধ্যা আগতপ্রায়। তৎপূর্ব্বে জঙ্গল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে হইবে। সুতরাং প্রশ্নের সমাধান দূরে থাকুক, আরও বহুতর প্রশ্ন তাঁহার মনের ভিতর জাগিতে লাগিল। এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে প্রায় আধমাইল দূরে তিনি একটী পর্ণকুটীর দেখিতে পাইলেন, বুঝিলেন এই সেই পর্ণকুটীর। আর একটু অগ্রসর হইলেই পূর্ব্বোক্ত সেই যুবতীটীকে পর্ণকুটীরের নিকট দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। সে নিগমানন্দের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল "এখানে বিশ্রাম কর, কুটীরাভ্যন্তরে তোমার জন্য সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা আছে।"

নিগমানন্দ প্রায় আধ মাইল দূরে যুবতীটীকে দেখিয়া আসিয়াছেন, অথচ সে তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই কি প্রকারে এখানে উপস্থিত হইল ইহা চিন্তা করিতে করিতে কুটীরের ভিতর গিয়া দেখিতে পাইলেন যে কয়েকটী চিনির সন্দেশ, একটু ফল ও কন্দমূল একখানি রেকাবির উপর তাঁহার জন্য সাজান রহিয়াছে। তিনি আহার করিলেন। কিন্তু এদিকে রাত্রি হইয়া গেল, কি করিবেন এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময় যুবতীটি বলিল, "আজ রাত্রে এখানে অবস্থান কর, প্রত্যুষে চলিয়া যাইও। কারণ বাঘ ভালুকের বড় উৎপাত এবং তুমি পথও চেন না।" অবশ্য ইহা ভিন্ন তখন কোন গত্যন্তর ছিল না। তিনি তাহাতেই রাজী হইলেন। যুবতীটী তখন সেই পর্ণকুটীরে দু'খানি বড় কুশাসন পাশাপাশি বিস্তার করিয়া একটীতে তাঁহাকে শুইতে বলিল, অপরটীতে সে নিজে শুইল। উভয়ের শয্যার মধ্যে পার্থক্য রহিল মাত্র এক হাত ভূমি। একে বিস্তীর্ণ গভীর জঙ্গলের ভিতর একটী পর্ণকুটীর, তাহাতে পার্ব্বত্য অন্ধকার—ভীষণ নিস্তব্ধতা, মাঝে মাঝে পাখীর ডানা নাড়ার পৎ পৎ শব্দ সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। কুটীরাভ্যন্তরে দণ্ডী সন্ন্যাসীর পার্শ্বে

যুবতীর শয্যা, ইহা সন্ন্যাস-ধর্ম্মবিরোধী। নিগমানন্দের নিদ্রা আসিল না। মনের ভিতর নানাপ্রকার কৌতূহল ও বিস্ময়ের উদয় হইতে লাগিল। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও যখন তাঁহার নিদ্রা আসিল না তখন যুবতীটি বলিল—"তোমার নিদ্রা আস্‌ছে না, পায়ে বড় বেদনা হয়েছে, টিপে দেবো কি?" নিগমানন্দ তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন "আমি বাহিরে গিয়া শয়ন করি"। যুবতীটি তাহাতে আপত্তি জানাইয়া স্থানটি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থল বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিল এবং বলিল, "আমিই না হয় বাহিরে গিয়ে শয়ন করি, তুমি ঘুমাও।" অতিথি গৃহস্থকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া সুখে নিদ্রা যাইবে ইহা বড় অশোভন ব্যাপার। সুতরাং নিগমানন্দ তাহাকে খোলাখুলি বলিলেন "কয়েকটী বিষয়ে আমার বড় কৌতূহল হইয়াছে। সেই সব বিষয় তোমার নিকট জানিতে পারিলে আমি নিদ্রা যাইতে পারি।" যুবতীটি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিল না। সুতরাং যুবতীটির সহিত পথিমধ্যে দেখা হওয়ার পর সে কি প্রকারে তাঁহার অগ্রে আসিল, কি প্রকারে তাঁহার নাম জানিল এবং সে কেনই বা সেখানে ঐরূপভাবে অবস্থান করিতেছে ইত্যাদি বিষয় জানিতে চাহিলেন। যুবতীটি বলিল "পূর্ব্বে যে যুবতীটিকে দেখিয়াছ সে আমি নহি। সে আমারই সঙ্গী। আমরা উভয়ে একই কুটিরে বাস করি। আমরা কাশ্মীরী ব্রাহ্মণকন্যা। শৈশবে উভয়েই ঘটনাচক্রে এক যোগীর হাতে আসিয়া পড়ি। সে আজ অনেক দিনের কথা। তাঁহার কৃপায় আমরা উভয়ে যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া এখানে অবস্থিতি করিতেছি।" নিগমানন্দ মনে মনে ভাবিলেন—তবে ত ভালই হইয়াছে, তিনিও ত যোগীগুরু অন্বেষণ করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "অনেক দিনের কথা বলিতেছ? সে কত দিন? তোমাদের বয়স ত অতি অল্প। এত শীঘ্র যোগসিদ্ধি কি প্রকারে লাভ করিলে?" যুবতীটি হিসাব করিয়া বলিল তাহার বয়স ৮০ বৎসর। নিগমানন্দের বিস্ময়ের

আর অবধি রহিল না। ৮০ বৎসর বয়স অথচ কেহ তাহাকে ষোড়শী ভিন্ন সপ্তদশী বলিতে কুণ্ঠিত হইবে। তিনি বলিলেন "আমিও যোগীগুরু অন্বেষণ করিতেছি। তোমার নিকটে ত উহা শিক্ষা করিতে পারি।" সে বলিল যে স্ত্রীলোকের নিকট যোগশিক্ষা তাঁহার সুবিধা হইবে না। তিনি কলিকাতার দিকে গেলে যোগীগুরু সন্ধান করিতে পারিবেন। ইহাতে তিনি বুঝিলেন স্ত্রীলোকের নিকট যোগ শিক্ষায় চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বহু কষ্টে পায়ে হাঁটিয়া কলিকাতা হইতে এই পর্যান্ত আসিয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসী, সুতরাং পুনরায় পায়ে হাঁটিয়া কলিকাতা যাওয়া যে কি কষ্ট তাহা বুঝান যাইবে না। তখন যুবতী বলিল "ভাড়াটা ত ? সে আমি তোমাকে দিব। এবং এই জঙ্গল হইতে কাল সোজা পথে বাহির করিয়া রেল ষ্টেশনের পথ দেখাইয়া দিব।"

অতঃপর কৌতূহল নিবৃত্তির পর তাঁহার নিদ্রা হইল। নিশাবসানে নিদ্রাভঙ্গ হইলে হাত মুখ ধুইয়া তিনি যোগিনীর সহিত বহির্গত হইলেন এবং একটি সোজা পথ ধরিয়া জঙ্গলের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। জি. আই. পি. রেলপথের একটী ষ্টেশনে যে পথে যাইতে হইবে সেই সোজা পথ দেখাইয়া যোগিনী বলিল "এই তোমার গাড়ীভাড়া নাও।" টাকা কয়েকটী লইয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে নিগমানন্দ বিদায় হইলেন। যাইতে যাইতে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, যোগীগুরু হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিলেন ইহা ঠিক হইল না। ষ্টেশনের দিকে একটু একটু অগ্রসর হইতেছেন, আর মাঝে মাঝে পিছন ফিরিয়া দেখিতেছেন যে যোগিনী ঠিক তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া। অতঃপর আর একটু চলার পর নিগমানন্দ যোগিনীকে আর দেখিতে পাইলেন না। ষ্টেশনে গিয়া কলিকাতার টিকিটের ভাড়া কত জিজ্ঞাসা করিয়া যোগিনীপ্রদত্ত টাকা কয়েকটী গণিয়া দেখিলেন যে একটি পয়সাও বেশী বা কম নহে, ঠিক ভাড়াটা দিয়াছে।

ডঃ বেসান্তের পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বক্তৃতা—স্বামী নিগমানন্দের গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিবার সময় কলিকাতায় তাঁহার স্থায়ী আড্ডা যেটী ছিল সেখানে এবার যাওয়া ঠিক নহে, কারণ তিনি এখন সন্ন্যাসী, বিশেষতঃ বঙ্কিমবাবু তখন আর ইহজগতে নাই। সন্ন্যাসীর পূর্ব পরিচয়ও প্রকাশ হওয়া অবাঞ্ছনীয়। এই সব কারণে তিনি বড়বাজার ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলেন। দুই চারদিন পরে বড়বাজার ধর্ম্মশালায় এক ব্যক্তির নিকট একটি সংবাদপত্রে দেখিলেন যে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবিদুষী (Theosophist) ডঃ অ্যানি বেসান্ত (Dr. Annie Besant) কৃষ্ণনগরে পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন। নূতন কোন তথ্য প্রকাশ করিবেন কি-না এবং বেদান্ত-দর্শনের সহিত তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতায় কত ব্যবধান, লেড্‌বিটারের নিকট এডিয়ারে অবস্থান করিয়া যাহা জানিয়াছিলেন তদপেক্ষা কিছু বেশী তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে কি-না জানিতে নিগমানন্দের বিশেষ কৌতূহল হইল। তিনি তাঁহার লোটা কম্বল ও চিমটাখানি লইয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। হাতে পয়সা নাই অথচ ট্রেনে যাইতেও ইচ্ছা আছে, কিন্তু ফাঁকি দিয়া তিনি কোনও দিন ট্রেনে চাপেন নাই, এখনও চাপিবেন না। সুতরাং কি করিবেন ইতস্ততঃ করিতে থাকিলেন। এখনকার মত তখন এত কড়াকড়ি ছিল না। সাধু-সন্ন্যাসীকে বিনা টিকিটে ট্রেনে চাপিতে দেখিলে রেল কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নামাইয়া দেওয়া হইত না কিন্তু উপযাচক হইয়া প্রার্থী হইতে হইবে ইহাও তিনি কোন দিন পারিয়া উঠেন নাই। সুতরাং কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমত সময় কৃষ্ণনগরযাত্রী জনৈক ভদ্রলোক আপনা হইতেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তিনি কৃষ্ণনগরে যাইবেন। অতঃপর ভদ্রলোকটী গার্ডকে সন্ন্যাসীর কথা বলিলে গার্ড

তাহাতে কোন আপত্তি করিল না। তখন তিনি গাড়ীতে চাপিলেন। ঐ দিন গাড়ীতে অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল কারণ বহুলোক কৃষ্ণনগরে ডঃ বেসান্তের বক্তৃতা শুনিতে যাইতেছিল। কৃষ্ণনগর পৌছিয়া তিনি পরমেশ্বর লাহিড়ী নামক জনৈক উকিলের বাসায় অতিথি হইলেন ও সভারম্ভে গৃহস্বামীর সহিত বক্তৃতা শুনিতে গেলেন। বক্তৃতা আরম্ভ হইল, লোকে লোকারণ্য—অদ্ভুত বক্তৃতাশক্তি—শাস্ত্রগত বিদ্যায় অগাধ পাণ্ডিত্য। কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায়গত মত হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তির বাহিরে বলিয়া নিগমানন্দের মনে হইতে থাকিল। ডঃ বেসান্ত বক্তৃতা প্রদানান্তে বলিলেন যে তাঁহার বক্তৃতায় যদি কাহারও কোন সন্দেহ থাকে বা বক্তৃতার কোন অংশ সম্বন্ধে কোন সমালোচনা থাকে, তাঁহার বাসায় গেলে তিনি তাহা শুনিবেন ও মীমাংসা করিয়া দিবেন।

স্বামী নিগমানন্দ পূর্ব্বোক্ত উকিল মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া ডঃ বেসান্ত যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন তথায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন "আপনি আপনার বক্তৃতায় যে অংশে বলিলেন যে মৃত্যুর পরে প্রত্যেক ব্যক্তিরই পৃথিবীতে জীবিতাবস্থায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার প্রত্যেক ঘটনাটীই মনে থাকে, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?"

ডঃ বেসান্ত। কেন পারিবে না? প্রত্যেক ঘটনাই তাহার মনে থাকিবে।

স্বামী নিগমানন্দ। প্রত্যেক ঘটনাটী যদি প্রত্যেকের মনে থাকে তবে তাহার আর পুনরায় জন্ম হইতে পারে না।

ডঃ বেসান্ত। কেন পারিবে না? অবশ্যই পারে।

স্বামী নিগমানন্দ। সদসৎ ঘটনা সবই যদি পরকালে মনে হয় এবং তাহাদের ফলাফল যদি সবারই স্মৃতিপটে উদিত হয় তবে মন্দ পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিই ক্রম-মুক্তির পথে ধাবমান হইয়া উপরে

উঠিতে থাকে, তার আর জন্ম হয় না। কুকার্য্যের কুফলে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া উক্ত কার্য্যে এত বিরক্ত হইয়া পড়ে যে সে মন্দ পথ কখনও গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং পরলোকে সুকার্য্যের ও কুকার্য্যের ফলের কথা মনে করিয়া সে সুপথ বাছিয়া লইয়া দেবযানে গমন করিবে।

স্বামী নিগমানন্দের প্রত্যেকটী যুক্তি শ্রবণ করার পরেই ডঃ বেসান্ত রাগিয়া উঠিতে থাকিলেন ও বলিলেন "তবে কি বলিতে চান?"

স্বামী নিগমানন্দ। আমি বলিতে চাই যে মৃত ব্যক্তির কেবলমাত্র জাগতিক প্রবল আসক্তির বস্তুর কথাই স্মরণপথে উদিত হয়। যে ব্যক্তি বিষয়ী বা অসৎ, সে সেই বস্তুর আকর্ষণে প্রবৃত্তির পথে বা পুনরাবৃত্তির পথে জগতে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি সৎ অর্থাৎ যে ব্যক্তি সারা জীবনটা ভগবদন্বেষণ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার প্রবলাসক্তি, সে সুপথে গমন করিবে, তাহার আর জন্ম হইবে না। সে ক্রম-মুক্তির পথে যাত্রা করিবে। সুতরাং আপনার যুক্তিতে প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক ঘটনা স্মরণ থাকিবে ইহা ভ্রমপূর্ণ, অবৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবিরুদ্ধ। মানুষ জীবিতাবস্থায়ই কত কথা ভুলিয়া যায়। আর মৃত্যু একটা ভীষণ পরিবর্ত্তনের অবস্থা। এই সময় যে অধিকাংশ ঘটনা লোক ভুলিয়া যায় না এবং কেবল প্রবলাসক্তির বিষয় মনে থাকে না, ইহা আপনি কি প্রকারে জানিলেন?

ডঃ বেসান্তের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি রুক্ষস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন "My knowledge, My knowledge, My knowledge." অর্থাৎ আমার জ্ঞান, আমার অভিজ্ঞতা।

বাদানুবাদ একপক্ষে কেবল চীৎকারে পরিণত হইতে লাগিল দেখিয়া উকিল পরমেশ্বর লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন—"আপনি যাঁহার সহিত তর্ক করিতেছেন তিনি আপনার বয়সের তুলনায় বালক হইলেও সন্ন্যাসী—বৈদান্তিক। ইনি কিছুদিন এডিয়ারে রেভারেণ্ড লেডবিটারের নিকট

অবস্থান করিয়া পরলোকতত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন। ইঁহার কথা শুনিয়া আপনার কোন যুক্তি থাকিলে তাহা বলুন।"

ডঃ বেসান্ত তখন পূর্ব্বভাবটা একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইলেন। ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"বেশ বলুন।"

স্বামী নিগমানন্দ। **Knowledge** অর্থাৎ জ্ঞান বলিতে নানা ভাবের জ্ঞান বুঝা যায়। কাহারও নিকট শুনিয়া জ্ঞান লাভ হইতে পারে, কিংবা পুঁথি পড়িয়া জ্ঞান লাভ হইতে পারে—অথবা নিজে সাধনা করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হইতে পারে। এই তিন ভাবের জ্ঞানের ভিতর আপনি কিভাবে পরলোকতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যদ্দ্বারা আপনি বলিতেছেন যে প্রতি ঘটনাটীই মৃত্যুর পর মনে থাকে? ইহাই আমার শেষ প্রশ্ন।

ডঃ বেসান্ত। আমাদের ব্রহ্মবিদ্যা সমিতির (**Theosophical Society**) শীর্ষদেশে যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগকে "মাষ্টার" বলে। তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ, হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে অবস্থান করিয়া লোকহিত চিন্তা করেন মাত্র। তাঁহাদের ইঙ্গিতেই এই বিরাট প্রতিষ্ঠান চলিতেছে। আমাদের ভিতর যাঁহারা উন্নত ও শুদ্ধাত্মা, তাঁহারা মাঝে মাঝে এই সমস্ত মাষ্টারদিগের সাক্ষাৎ পান ও তাঁহারাই এই সমস্ত বিষয় প্রকাশ করেন। আমাদের জ্ঞান সমস্তই তাঁহাদিগের নিকট হইতে শ্রুত।

সুতরাং নিগমানন্দ বুঝিলেন যে ডঃ বেসান্ত যে সমস্ত বিষয় মাষ্টারের প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন তদতিরিক্ত অন্য কোন বিষয়ে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি-সম্পন্ন জ্ঞান নাই।

অতঃপর স্বামী নিগমানন্দ তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া উকিল পরমেশ্বর লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। দুই এক দিন সেখানে থাকিলেন কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া অনেকে বলিতে লাগিল—"মহাশয়! আপনি যে এই দেশেরই লোক তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ

নাই। আপনাকে পরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে।" এই সমস্ত প্রশ্নকারী ব্যক্তিদিগকে নিগমানন্দ যে একেবারে না চিনিতেন তাহা নহে। তবে চেহারা এবং বেশের পরিবর্ত্তন হেতু তাহারা তাঁহাকে পূর্ণমাত্রায় চিনিতে পারেন নাই। যাহা হউক কৃষ্ণনগরে আর থাকা যুক্তিযুক্ত না হওয়ায় তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

কলিকাতায় আসিবার পরে একটী বড় মজার ঘটনা ঘটিল। তখন অম্বুবাচী আসন্না, কামাখ্যাগমনকারী অনেক সাধুকে রাস্তায় দেখিতে পাইলেন। তিনিও কামাখ্যায় যাইবেন কি-না ভাবিতে ভাবিতে বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে মেডিক্যাল কলেজের দিকে যাইতেছেন। এমন সময় প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট ও কলেজ ষ্ট্রীটের জংশনের নিকট একটী শিবমন্দিরের সিঁড়ির উপর এক ভৈরবীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পাইলেন। তার চোখে চোখ পড়িয়া গেল। তাকে দেখিয়া তার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া পুনরায় শিবমন্দিরের সম্মুখ দিয়া দু'চার বার যাতায়াত করিতে থাকিলেন ও তাহার দিকে তাকাইয়া মাঝে মাঝে তাহাকে দেখিতে থাকিলেন। ভৈরবীটী তাঁহাকে দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। তখন তিনি ভাবিলেন, "একি? আমি কি সম্মোহিত হইতেছি—আমি এখান হইতে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছি কেন?" তিনি থমকাইয়া দাঁড়াইলেন এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করতঃ বুঝিলেন যে তিনি সতত আত্মভাবস্থ না হইয়া অন্যমনস্ক থাকার সুযোগে এই ভৈরবীটী তাহাকে সম্মোহিত করিতে চেষ্টা পাইতেছে। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলেন এবং বিচার করিলেন যে আত্মদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত অথবা সাধকাবস্থায় দারুময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শনও নিষিদ্ধ। সাধিকাগণের পক্ষেও তদ্রূপ। সাধনাকালে তাহাদেরও পুরুষের মূর্ত্তি দর্শন করা সাধনার পক্ষে ভাবভঙ্গকারী। সাধকদিগের লোকালয়ে—বিশেষতঃ কলিকাতার

ন্যায় জনপদে থাকা মোটেই সমীচীন নহে, এই মনে করিয়া কামাখ্যাযাত্রী কতিপয় সাধুর সহিত আসাম যাত্রা করিলেন।

স্বামী নিগমানন্দ কামাখ্যায় আসিয়া দেখিলেন অসম্ভব সাধুসমাগম। এই সময় কামাখ্যায় শক্তিসাধকগণের সকাম সাধনা যথা মারণ, উচাটন এবং যোগিনী, ভূত, প্রেত, পরী প্রভৃতি বশীকরণের সিদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকে। এই স্থানে দেবীর যোনি পতিত হইয়াছিল বলিয়া প্রতি বৎসর অম্বুবাচীর সময় পীঠদেশ দিয়া অজস্র রজঃস্রাব হইয়া থাকে এইরূপ যে জনশ্রুতি আছে তাহার সত্যতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পাণ্ডাকে প্রতি রাত্রে দুই টাকা করিয়া দিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে গিয়া যোনি-পীঠের মধ্যে হাত দিয়া দেখিয়াছেন যে ঐ জনশ্রুতি সর্ব্বৈব মিথ্যা। অর্থলোভী পাণ্ডাগণ ছাগরক্তে বস্ত্র সিক্ত করিয়া উহার টুকরা লোকের নিকট বিক্রয় করে। তবে ঐ স্থানে একটী পারদের প্রস্রবণ আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। অম্বুবাচীর পরে কিছুদিন ঐ স্থানে থাকিয়া পরশুরাম তীর্থ দর্শনে তাঁহার ইচ্ছা হয়। বর্ষাকালে তথায় যাওয়া যায় না বলিয়া ঐ স্থানে শীতকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া অবশেষে পরশুরাম তীর্থে যাত্রা করেন। গৌহাটী হইতে ষ্টিমারে ডিব্রুগড়ে আসিয়া পরে ট্রেনে সদিয়ায় পৌঁছেন। তথা হইতে প্রায় ২০৷২৫ জন সাধু-সন্ন্যাসীর সহিত দুর্গম শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমি ও পার্ব্বত্য টীলা অতিক্রম করিয়া পরশুরাম তীর্থে উপনীত হইলেন।

অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য প্রবল জ্বর ও আমাশয় রোগে তিনি তথায় আক্রান্ত হইলেন। সন্ন্যাসীগণ তাঁহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া কার্য্য-সমাপনান্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। ব্রহ্মকুণ্ডের অনতিদূরে অসভ্য পার্ব্বত্য জাতির একটী ক্ষুদ্র বস্তী ছিল। স্বামী নিগমানন্দ নিরুপায় হইয়া তাহাদের নিকট কাতরে আশ্রয় ভিক্ষা চাহিলেন। তাহারা আশ্রয় দান করিল। তাহাদের আশাতীত সেবাযত্ন ও শুশ্রূষার ফলে

প্রায় ১ মাসের ভিতর তিনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া একদা অপরাহ্নে পাহাড়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে একাকী বনমধ্যে ভ্রমণে বাহির হইলেন। বহুক্ষণ ভ্রমণ করায় শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং একটী পাথরের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতে থাকিলেন। চক্ষু তাঁহার নিদ্রালস হইয়া আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। পরে যখন জাগিলেন তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, বনমধ্যে হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার আর কোন উপায় নাই। তখন নিরুপায় হইয়া একটী বিরাট বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া নয়ন মুদ্রিত অবস্থায় ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে রাত্রিযাপন করিতে থাকিলেন। অতঃপর ঐ ভাবে বসিয়াই সেই বৃক্ষকোটরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন ভোর হইয়াছে।

যোগীগুরুর সাক্ষাৎ—বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিবার নিমিত্ত যেমন নিম্নে তাকাইলেন—দেখিলেন গৌরকান্তি প্রশস্তললাট একটী সন্ন্যাসী বৃক্ষনিম্নে বসিয়া গাঁজা সাজিতেছেন। উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইলে সন্ন্যাসীটি স্বামী নিগমানন্দকে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। স্বামী নিগমানন্দ তদনুযায়ী বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক উপত্যকায় আসিয়া সন্ন্যাসী পর্ব্বতগাত্র হইতে একখানি বৃহদায়তন প্রস্তর কৌশলে অপসারিত করিলে নিগমানন্দ দেখিলেন তথায় একটী সুন্দর গহ্বর। তখন সন্ন্যাসী বলিলেন যে তিনি যোগীগুরু সুমেরদাস এবং তাঁহারই জন্য তিনি বৃক্ষনিম্নে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

যে স্বল্পায়তন গহ্বরটীতে যোগী সুমেরদাসজী থাকিতেন উহা দেখিয়া স্বামী নিগমানন্দের মনে হইল যেন বহু পূর্ব্বে পর্ব্বতগাত্র খোদিত করিয়া এই গহ্বরটি কিছু সম্পদ লুকাইবার জন্য তৈয়ারী হইয়াছিল, নতুবা সন্ন্যাসীর থাকিবার জন্য পার্ব্বত্য প্রদেশে এরূপ গুপ্ত গহ্বরের প্রয়োজন কি? কেননা এরূপ জনহীন প্রদেশে সমাধিসুখের ব্যাঘাত জন্মাইবার

কেহ নাই। গহ্বরটীতে বহুসংখ্যক হস্তলিখিত পুরাতন পুস্তক স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত ও সুরক্ষিত আছে। এই সমস্ত পুস্তকাদি, দুই একখানি আসন ও একটা কমণ্ডলু ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যসম্ভারে গহ্বরটী সমৃদ্ধ নহে।

. বনভূমিতে ভ্রমণ করিতে আসিয়া চিরবাঞ্ছিত ধনপ্রাপ্তিতে স্বামী নিগমানন্দের মন অতিশয় প্রফুল্ল হইল ও তিনি অননুভূতপূর্ব্ব প্রশান্তি বোধ করিতে থাকিলেন এবং আরও মনে করিলেন যে যাহার উদ্দেশ্য মহৎ এবং যে ভগবান লাভের জন্য ব্যাকুল, উপযুক্ত সময়ে তিনিই তাহাকে দর্শন দিয়া তাহার পথ দেখাইয়া দেন। গহ্বরাভ্যন্তরে আহার করিবার তৈজসপত্র কিছুই দেখিলেন না অথচ তখন তাঁহার দারুণ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। সুমেরদাসজী নবাগতকে নিকটে একটী ঝরণা দেখাইয়া দিয়া সেখান হইতে স্নান করিয়া আসিতে বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি তথায় ফিরিয়া আসিয়া নিগমানন্দকে কিছু কন্দমূল আহার করিতে দিলেন। এখানকার ইহাই আহার্য্য। কন্দমূল ও বন্য ফলের অভাব নাই। তবে নিগমানন্দের জন্য তিনি ৭।৮ দিন অন্তর পর্ব্বতের বাহিরে গিয়া বস্তী হইতে চাউল লইয়া আসিতেন। সপ্তাহে একবারই তাঁহার কন্দমূল সিদ্ধ ও ভাত খাওয়া হইত।

প্রথমে সুমেরদাসজী নিগমানন্দকে হস্তলিখিত যোগশাস্ত্র পাঠ করিতে দিলেন। দেশে যেসব গ্রন্থ স্বরোদয়শাস্ত্র বলিয়া প্রচলিত আছে, এখানকার হস্তলিখিত স্বরোদয়শাস্ত্রের সহিত উহার বিশেষ কিছু মিল নাই। প্রথমে দেহতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, নাড়ীতত্ত্ব প্রভৃতি যাহা যোগশাস্ত্র ও স্বরোদয়-শাস্ত্রের মর্ম্মকথা সুমেরদাসজীর নিকট উহার মৌখিক বিশ্লেষণ ও তৎসঙ্গে সেই সমস্ত অত্যদ্ভুত প্রক্রিয়াগুলির চাক্ষুষ দর্শনে নিগমানন্দের বিস্ময়ের উপর বিস্ময় জন্মিল। ভাব ও ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠিল। মাঝে মাঝে তাঁহার বিগত জন্মের কথা যাহা যোগীশ্বর

সুমেরদাসজীর প্রমুখাৎ অবগত হইলেন তাহা চিন্তা করিয়া নিগমানন্দ তাঁহার নিজের বর্ত্তমান জীবন ও আত্ম-বিস্মরণ চিন্তা করিয়া অবসন্ন ও দুঃখিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎ যাহা সুমেরদাসজীর মুখে শুনিলেন, তাহাও অতিশয় শ্রুতিসুখকর ও চমকপ্রদ। তবে সে অবস্থা অনেক দূরে। কেমন যেন সব অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলে পরমজ্ঞানীর যে এরূপ অজ্ঞান অবস্থা আসিয়া যায়-- আবার তাহা দূর করিতে যে এত চেষ্টার প্রয়োজন হয় ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। এবার একেবারে জন্ম রোধ করিতে হইবে। ব্রহ্মানন্দ গিরি নামক যে প্রসিদ্ধ সাধুর কথা তিনি আশৈশব শুনিয়া আসিতেছেন, এখন শুনিলেন যে তিনিই এই দেহে "নিগমানন্দ"।

যোগসাধনা সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা ও উপদেশ—নিভৃতে সুমেরদাসজী তাঁহাকে যোগশাস্ত্রের কূটস্থানগুলির বিশদ ব্যাখ্যা এবং ঐ সব প্রক্রিয়া করিয়া দেখাইতেন এবং যোগের সমাধি আসিলে সর্ব্বপ্রথম যাহা যাহা করা কর্ত্তব্য তাহা শিখাইতেন। সমাধি অবস্থায় দেহে কিরূপ চিহ্নসকল প্রকট হয় তাহাও তাঁহাকে দেখাইলেন। যাঁহারা প্রকৃত যোগী তাঁহারা গিরিগুহায় ভিন্ন লোকালয়ে নাই তাহাও বুঝাইলেন।

প্রারব্ধই মানুষকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায় কিন্তু মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না। সে মনে করে এক, হইয়া দাঁড়ায় অন্যরূপ। নিগমানন্দ তীর্থদর্শনে আসিয়াছিলেন, পরে পার্ব্বত্য বনশোভা দেখিতে বাহির হইয়াছিলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রারব্ধ তাঁহাকে যে উদ্দেশ্যে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে তাহা হাতে হাতে দেখিতে পাইলেন। ঠিক এইরূপভাবেই সুমেরদাসজীতেও সাধুত্ব বিকশিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে তাঁহার এ সকল সঙ্কল্প ছিল না। সুমেরদাসজী গল্পচ্ছলে একদিন বলিলেন যে তিনি পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের সভাসদ্ ছিলেন। রণজিতের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দিলীপসিংহের নানা ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে। পরে দিলীপসিংহের

বিলাত গমনকালে সুমেরদাসজীকেও তাঁহার সঙ্গে যাইতে হয়। বিলাতে গিয়া নানা কারণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তিনি রাশিয়ায় গমন করেন। তথা হইতে চীন দেশ হইয়া তিব্বতে অবস্থানকালে এক সাধু তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া এই স্থানে লইয়া আসেন এবং তাঁহারই কৃপায় যোগসিদ্ধ হইয়া পূর্ব্বোক্ত গুহায় রক্ষিত সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত শাস্ত্রসমূহের রক্ষক হইয়া রহিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে একদা বলিলেন যে ভারতের ব্রহ্মবিদ্যা সমিতির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রকৃতপক্ষে কোন অধ্যাত্ম কারণবশতঃ তিনি আত্মসম্প্রসারণ করিয়া ম্যাডাম ব্ল্যাভাস্কী (Madame Blavatsky) সহিত একটী জাহাজে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া তিনিই এই দেশে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম আনয়ন করিয়াছিলেন। নতুবা ভারত পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে নিজেদের সম্পদের কথা ভুলিয়া যাইত। সুতরাং ঋষিদের এই বিষয়ে বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহাদের দ্বারা যে সব পন্থা অবলম্বিত হইয়াছিল এইক্ষণে তাহার সুফল ফলিবার সময় আসিতেছে।

অবসর সময়ে নিগমানন্দ সুমেরদাসজীর সঙ্গে পার্ব্বত্য বনভূমির শোভা সন্দর্শন করিতে বাহির হইতেন। এই সময় নানাপ্রসঙ্গের নানা কথা তাঁহার সহিত হইত। ইহাতে নিগমানন্দ বুঝিলেন যে যোগীগণ গিরিগুহায় বাস করিলেও জগতের যে কোনও খুঁটিনাটি সংবাদ তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকে না। সংবাদপত্রে যেমন প্রতিদিনের সংবাদ প্রকাশিত হয়, যোগীগণ ইচ্ছা করিলে শুধু এ জগতের কেন, অপরাপর জগতেরও সংবাদ রাখিতে পারেন ও রাখিয়া থাকেন। কারণ সিদ্ধ হইবার পর তাঁহারা জগতের কল্যাণের জন্যই নিজেদের স্থূল দেহ ধারণ করেন।

একদা অপরাহ্নে সুমেরদাসজীর সঙ্গে নিগমানন্দ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। অকস্মাৎ উভয়ের ভিতর কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল ; এক

বিরাটকায় ব্যাঘ্র সুমেরদাসজীর সম্মুখে দেখা দিল। সুমেরদাসজী থমকাইয়া দাঁড়াইলেন। ব্যাঘ্রের চক্ষুর উপর তাঁহার স্বীয় চক্ষু স্থাপিত করিলে ঊর্দ্ধলাঙ্গুল ব্যাঘ্রটী তাহার লাঙ্গুলটী পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয়ের ভিতর লইয়া জড়সড় হইয়া পড়িল। অতঃপর তাঁহার দৃষ্টি অপসৃত করিলে ব্যাঘ্রটী অতি দ্রুত প্রস্থান করিল। ব্যাঘ্র পলাইয়া গেলে নিগমানন্দ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহাকে কি যোগ বলে?" অতঃপর সুমেরদাসজী নিগমানন্দকে এই ত্রাটক যোগের উপদেশ প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে মানুষের ভিতর সমস্ত শক্তিই বিদ্যমান—একটু জাগাইয়া দিলে সে সমস্ত পৃথিবীকে করায়ত্ত করিতে পারে।

অতঃপর এইভাবে এই পার্ব্বত্য প্রদেশে নিগমানন্দের কিঞ্চিদধিক তিনমাসকাল যোগসাধনার প্রাথমিক ক্রিয়াগুলি আয়ত্ত হইয়া গেলে অন্যান্য ক্রিয়াগুলির সাধনায় এই বনভূমি অনুকূল নহে বলিয়া সুমেরদাসজী বলিলেন যে এখন লোকালয়ে গিয়া কোনও সাত্ত্বিক প্রকৃতির ধনীর আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া নিগমানন্দকে এই রাজযোগের সাধনা করিতে হইবে। রাজযোগ সাধনাকালে রাজার ন্যায় দুধ ঘি খাইবার প্রয়োজন হইবে, প্রতি ক্রিয়ার পর শরীরের ক্ষয় পরিপূরণ করিবার জন্য —যাহাতে শ্বাস, কাস, ক্ষয় প্রভৃতি রোগগ্রস্ত না হইতে হয়।

সুমেরদাসজীর ভবিষ্যদ্বাণী—গৃহত্যাগ করিবার পর বেদান্তচর্চ্চা করিবার ফলে নির্ব্বিকল্প অবস্থার উপর নিগমানন্দের একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। সুতরাং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে যোগসাধনার চরমাবস্থা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি—ঐ অবস্থা লাভের পর নির্ব্বিকল্প অবস্থার জন্য পুনরায় সাধনা করিতে হইবে কি-না? সুমেরদাসজী বলিলেন, "অসম্প্রজ্ঞাত আ যানেসে নির্ব্বিকল্প আপ্‌সে আ যায়গা।"

নিগমানন্দ আশ্বস্ত হইলেন। বিদায়ের প্রাক্কালে সুমেরদাসজী তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশদ উপদেশ প্রদান করিলেন এবং প্রফুল্লচিত্তে

তাঁহাকে পূর্ব্বের পার্ব্বত্য বস্তীতে পৌছাইয়া দিলেন। নিগমানন্দ পূর্ব্ব-পরিচিত বস্তীতে আসিলে তত্রত্য অধিবাসিগণ অত্যন্ত উল্লসিত হইল, কারণ তাহারা নিগমানন্দকে কয়েকদিন পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য বনভূমিতে অনুসন্ধানেও যখন কোন সন্ধান করিতে পারে নাই, তখন মনে করিয়াছিল যে তাঁহাকে ব্যাঘ্রে উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। এইক্ষণে তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তাহারা নিরতিশয় আনন্দিত হইল। তিনিও কয়েকদিন তাহাদের সহিত বাস করিয়া বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আসাম হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া নানাস্থানে ধনীর আশ্রয় অন্বেষণ করিতে করিতে অবশেষে পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে* আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিপুর গ্রামে আসিয়া পৌছিতে রাত্রি হইল। কোথায় বিশ্রাম করিবেন? অজ্ঞাতকুলশীল—সে সন্ন্যাসী হউক, ব্রহ্মচারী হউক কিম্বা গৃহস্থ হউক—কেই বা রাত্রে আশ্রয় দিয়া থাকে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ঐ গ্রামে একটী দেবালয় দেখিতে পাইয়া তিনি তাহার বারান্দায় আসিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। প্রত্যূষে গাত্রে করস্পর্শ অনুভূত হওয়ায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং দেখিতে পাইলেন, জনৈক মধ্যবয়স্ক ব্রাহ্মণ তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। উক্ত ব্রাহ্মণই যে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইয়াছেন একথা তিনি ব্রাহ্মণের কথায় জানিলেন। আগন্তুক ব্রাহ্মণ আরও বলিলেন যে তাঁহার নাম সারদা-প্রসাদ মজুমদার এবং এই দেবালয় তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। গতরাত্রে তিনি স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন যে এই দেবালয়ে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তাঁহার যোগসাধনার আনুকূল্যে যতপ্রকার সাহায্যের প্রয়োজন হইবে তাহা অকাতরে করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিতে হইবে। এই স্বপ্নের

* মতান্তরে—মেদিনীপুর জেলার হরিপুর গ্রামে। (জীবনী ও বাণী ৫৮ পৃঃ)

সত্যতা পরীক্ষার জন্য এত প্রত্যূষে তিনি মন্দিরে আসিয়াছেন এবং উক্ত সন্ন্যাসীই যোগসাধনার জন্য কোন গৃহস্থের আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছেন কিনা জানিতে চাহিলেন।

নিগমানন্দ তাঁহাকে জানাইলেন যে তদুদ্দেশ্যেই তিনি নানাস্থানে সাধনার স্থান এবং আশ্রয় অন্বেষণ করিয়া ঘুরিতেছেন কিন্তু কোনই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। যদি উপযুক্ত স্থান মিলিল তবে উপযুক্ত গৃহস্থের আশ্রয় পাইলেন না। আশ্রয় যদি জুটাইতে পারিলেন তবে সাধনানুকূল স্থান মিলিল না। তাঁহার কথা শুনিয়া সারদাবাবু বলিলেন যে যতপ্রকার সাহায্যের প্রয়োজন হয় তিনি তাহা করিতে রাজি আছেন—অবশ্য স্থান দেখিয়া যদি উহা সাধনানুকূল বলিয়া সন্ন্যাসীর মনে হয়। তাঁহার বাড়ীর পশ্চাতে বাড়ীরই সংলগ্ন একটী উদ্যান আছে। উহা তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক হইতে পারে কিনা তিনি তাহার সঙ্গে আসিয়া দেখিতে পারেন। নিগমানন্দ বলিলেন যে তাঁহার সহিত স্থান দেখিতে এবং পছন্দ হইলে তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া যোগসাধনা করিতে রাজি হইতে পারেন যদি একটি সর্ত্তে তিনি সম্মত হন। সর্ত্তটি এই—তিনি যে তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া যোগসাধনা করিতেছেন একথা লোকে যেন জানিতে না পারে। সারদাবাবু তাহাতে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর সংলগ্ন উদ্যানে লইয়া গেলেন। উদ্যানের ভিতর একটি পুষ্করিণীও আছে দেখিতে পাইলেন। স্থানটা নিগমানন্দের মনোনীত হওয়ায় সারদাবাবুকে সেখানে একটি ছোট ঘর করিয়া দিতে বলিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই সারদাবাবু একখানি ছোট ঘর করিয়া দিলেন। সারদাবাবু স্থানীয় জমিদার, সাত্ত্বিকভাবাপন্ন এবং সংসারে অভাব-অভিযোগ তাঁহার কিছুই ছিল না। তিনি সকল প্রকার ঐকান্তিক চেষ্টা করিতে লাগিলেন যাহাতে তাঁহার পক্ষ হইতে সন্ন্যাসীর যোগসাধনায় কোন প্রকার ত্রুটি না হয়। অতঃপর নিগমানন্দ

গৃহমধ্যে আসন স্থাপন করিলেন। সুমেরদাসজীর আদেশ ছিল যোগসাধনা করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমেই শরীর যাহাতে সাধনার উপযুক্ত হইতে পারে তজ্জন্য প্রথম ভিত্তি করিতে হইবে হঠযোগের ষট্‌সাধন দ্বারা শরীরকে শোধন করিয়া। হঠযোগ ও লয়যোগ সম্পূর্ণ পৃথক্। হঠযোগের দ্বারা শরীর ৪০০ বা ৫০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়—শরীরের কসরৎ দেখান যায়। কিন্তু লয়যোগের সহিত হঠযোগের কোন সম্বন্ধ নাই। লয়যোগের দ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মায় লয় হয়। সুতরাং একমাত্র লয়যোগ দ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু এই লয়যোগের সাধন-প্রণালীতে হঠযোগের ষট্‌সাধনার সাহায্য লইতে হয় শুধু শরীরকে শোধন করিতে, নতুবা লয়যোগের পর পর সাধনাগুলি ক্রিয়াশীল হয় না। হঠযোগের ষট্‌সাধন বলিতে ধৌতি, বস্তি, নেতি লৌলিকি, ত্রাটক ও কপালভাতি বুঝায়।

১। ধৌতি ঃ—

অন্ত্র ধৌতি—বাতসার, বারিসার, বহ্নিসার, বহিষ্কৃতি।

দন্ত ধৌতি—দন্তমূল, জিহ্বামূল, কর্ণমূল, কপালরন্ধ্র।

হৃদ্ ধৌতি—দন্তদ্বারা, বমনদ্বারা, বস্ত্রদ্বারা।

মূল শোধন—গুহ্যদেশ প্রভৃতির অভ্যন্তর প্রক্ষালন।

২। বস্তি ঃ—জল বস্তি, শুষ্ক বস্তি।

৩। নেতি ঃ—মুখ ও নাসিকার মধ্যে সূত্র প্রভৃতি চালনা করিয়া শ্লেষ্মা বহিষ্করণ।

৪। লৌলিকি ঃ—উদর সঞ্চালন পূর্ব্বক নাড়ী পরিষ্করণ।

৫। ত্রাটক ঃ—চক্ষে পলক না ফেলিয়া কোন এক বস্তুতে এক-দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকা অভ্যাসকরণ।

৬। কপালভাতি ঃ—বাতক্রম, ব্যুৎক্রম, শীতক্রম।

পাতঞ্জল-দর্শনের সাধনপাদোক্ত "যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি" হইলেও সাত প্রকার সাধনা দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ যম বলিতে চিত্তশুদ্ধি বুঝায়। উহা মানসিক, বাহ্য ক্রিয়া নহে। চিত্তশুদ্ধি হইলেই মানুষ সাধনাদি করিতে অগ্রসর হয়। প্রকৃতপক্ষে "নিয়ম" হইতেই যোগের সাধনা আরম্ভ। যোগের ষট্‌কর্ম্ম "নিয়মের" অন্তর্গত।

সুমেরদাসজী ষট্‌কর্ম্মের প্রত্যেকটি ক্রিয়া দুইমাস অভ্যাস করিয়া উহা ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ধৌতিপ্রকরণ এইভাবে করিতে থাকিলে এক বৎসরের ভিতর শেষ হইবে। তদধিক সময় এই ধৌতি করিবার প্রয়োজন নাই, তবে আসন অভ্যাস ও ধৌতি একই সময়ে চলিতে থাকিবে।

সুতরাং নাসিকার ভিতর সূত্রচালনা করা, গরম জলের সহিত তিন অঙ্গুলি প্রস্থ পরিষ্কার নেকৃড়া উদরস্থ করিয়া পুনরায় বমন বা কলার মাজ ঘৃতে সিক্ত করিয়া গলার ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া বমন করিয়া শ্লেষ্মা বাহির করিয়া ফেলা, পুষ্করিণীর জলের ভিতর কোমর পর্য্যন্ত নিমগ্ন করিয়া মলদ্বারে মুদ্রাবিশেষযোগে জলগ্রহণ করিয়া পুনরায় উহা ত্যাগ করিয়া অন্ত্র পরিষ্কার করা বা প্রস্রাবদ্বার দ্বারা জল গ্রহণ ও ত্যাগকরণ প্রভৃতি ধৌতিকরণে দিবসাতিবাহিত করিতে থাকিলেন। আসন অভ্যাস করিতে মেরুদণ্ডকে সোজা রাখিবার উদ্দেশ্যে ও আসনে বসিয়া নিদ্রা আসিলে আসনাভ্যাসে যাহাতে বিঘ্ন না হয় তজ্জন্য আসনের পশ্চাদ্ভাগে তক্তা পুঁতিয়া তাহাতে দুই বগলের তলদেশ দিয়া স্কন্ধের সহিত বাঁধিয়া রাত্রির পর রাত্রি বিনিদ্র নয়নে বসিয়া আসন অভ্যাস করিতে থাকিলেন। কখনও নিদ্রা আসিলে ঐরূপেই নিদ্রা যাইতেন, কারণ যে-কোনও প্রকারে মেরুদণ্ডকে স্বাভাবিক ভাবে ঋজু রাখিতেই হইবে। যোগের ইহাই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

যোগবিঘ্ন—গুরুর আদেশ যে, যোগসাধনাকালে শরীরের শক্তি-ক্ষয়জন্য রাজার ন্যায় দুগ্ধ ও ঘৃত সেবন করিয়া উক্ত ক্ষয় পরিপূরণ করিতে হইবে, নতুবা শ্বাস, কাশ, হিক্কা বা ক্ষয়রোগ হইবে। সারদাবাবু অকাতরে নিগমানন্দের জন্য তদ্রূপ ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে প্রায় নয় মাস গত হইল। একজন সন্ন্যাসী সারদাবাবুর বাড়ীর সংলগ্ন উদ্যানে কিছুকাল হইতে যোগসাধনা করিতেছেন একথা ইতিমধ্যে সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং তাঁহার নিকট লোক, বিশেষতঃ স্কুলের ছাত্রবৃন্দ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহারা নানাপ্রকার প্রশ্নে সন্ন্যাসীর সময় নষ্ট ও অধিক বাক্যব্যয়জনিত শরীরে বায়ুবৃদ্ধি করাইয়া সাধনার ক্ষতি করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে উদ্যানমধ্যস্থ পুষ্করিণীতে কিছুকাল হইতে বাহিরের স্ত্রী-পুরুষ স্নান করিতে আসিতেছিল। স্নান তাহাদের অনেকের মুখ্য উদ্দেশ্য না হইলেও সন্ন্যাসীর দর্শনলাভ যে তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ইহা বেশ বোধগম্য হইতেছিল। জলের ভিতর কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া মলদ্বার দ্বারা জল আকর্ষণ ও ত্যাগ—ইহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। এই অসুবিধাগুলি দূরীভূত করিবার জন্য স্বামীজী সারদাবাবুকে বলিলেন। সারদাবাবু তখন বাহিরের লোকজনকে বেলা ৪টার পূর্ব্বে তাঁহার নিকট যাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন ও পুকুরের ভিতরের ক্রিয়া সাধারণের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য সন্ন্যাসীর জন্য একটি ইটের চৌবাচ্চা তৈয়ারী করিয়া দিলেন এবং ঐ চৌবাচ্চা প্রতিদিন জলে পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য মালীকে আদেশ দিলেন। ইহাতে বাহিরের উৎপাত অনেকটা প্রশমিত হইল বটে কিন্তু আর এক নূতন ধরণের উপদ্রব সুরু হইল। তখন বুঝিলেন যে মায়া তাহার অনুচরদিগের দ্বারা যোগবিঘ্ন ঘটাইতে ক্রিয়াশীলা হইয়াছেন। সুতরাং এই যোগবিঘ্ন নিবারণ সারদাবাবুর সাধ্যাতীত বিধায় তাঁহাকে বলা চলিবে না। গৃহস্থ স্বভাবতঃ দুর্ব্বলচিত্ত সুতরাং এই যোগবিঘ্নের প্রকৃত স্বরূপটী যে কি তাহা তাঁহার

নিকট ব্যক্ত করিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত মতামতের বিচারাধীন হওয়া অপেক্ষা এই স্থান ত্যাগ করাই তাঁহার পক্ষে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইল। যোগসাধনাকালে যোগবিঘ্নরূপ অন্তরায় উপস্থিত হইলে সাধনায় উৎকর্ষ-লাভ করা সুদূরপরাহত। কিন্তু সারদাবাবুর ন্যায় সদাশয় লোককে না বলিয়া চলিয়া যাওয়াটাও যেন অকৃতজ্ঞের কার্য্য হইবে। তিনি তাঁহার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন। আবার ভাবিলেন সন্ন্যাসীর আবার কৃতজ্ঞতা-অকৃতজ্ঞতা কি? ভগবদাদেশেই ত সারদাবাবু তাঁহাকে যত্ন করিয়া রাখিয়াছেন। এইক্ষণে যোগবিঘ্ন হইতেছে এবং ঐ যোগবিঘ্ন নিত্য নূতন আকার ধারণ করিয়া ক্রমশঃ চরমে পরিণত হইতে চলিয়াছে সুতরাং বাহ্যিক সামাজিকতা রক্ষা করিতে গিয়া নিজের ইহকাল-পরকাল নষ্ট হইবার সুযোগ দেওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

সত্য গোপন করিয়া এইক্ষণে স্থান ত্যাগ শ্রেয়ঃ মনে করিয়া তিনি রাত্রিযোগে হরিপুর ত্যাগ করিয়া সিরাজগঞ্জে আসিলেন ও তথা হইতে গৌহাটি যাত্রা করিলেন।

স্বামী নিগমানন্দ গৌহাটি উপনীত হইলেন বটে কিন্তু কাহারও নিকট উপযাচক হইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ হওয়ায় তিনি আপাততঃ কামাখ্যা গমনই প্রশস্ত মনে করিলেন। কামাখ্যা হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র—বহু ধার্ম্মিক সজ্জনের তথায় সমাবেশ হয়। হয়ত তাঁহার পক্ষে তথায় কোনও সুবিধা সুযোগ জুটিয়া যাইতে পারে মনে করিয়া তিনি পরদিনই কামাখ্যা যাত্রা করিলেন। যাত্রা করিয়া পথাতিবাহন কালে পথিপার্শ্বস্থ এক বাটী হইতে জনৈক ভদ্রলোক তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে সন্ন্যাসীঠাকুর! শোন, শোন।" সন্ন্যাসী দেখিলে আধুনিক লোক যেমন ব্যঙ্গ করে, ভদ্রলোকটীর স্বরও তদ্রূপ ছিল। ব্যঙ্গময় স্বরের অন্যতম কারণ আহ্বানকারী বাঙ্গালী, আর নিগমানন্দ বাঙ্গালী ছোকরা সন্ন্যাসী। কিন্তু ব্যঙ্গের প্রতি লক্ষ্য

না করিয়া ভদ্রলোকটী যে স্থানে বসিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলে নিগমানন্দকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় যাচ্ছ সন্ন্যাসীঠাকুর ?"

নিগমানন্দ বলিলেন তিনি কামাখ্যায় যাইতেছেন।

"কামাখ্যা দর্শনে যাচ্ছ, তা না হয় কালই যেও, আজ এখানে থেকে যাওনা কেন ?"

"তা গেলেও হয়" বলিয়া নিগমানন্দ বিশেষ কোনও আপত্তি করিলেন না।

গৃহস্বামী বাবুটি তখন একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া সন্ন্যাসীকে সেই-দিনের মত থাকিবার জন্য একটী কুঠুরী দেখাইয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে বলিলেন। কুঠুরীটী পরিষ্কৃত হইলে নিগমানন্দ সেখানে গিয়া পোঁটলা পুঁটুলি যাহা তাঁহার সঙ্গে ছিল রাখিলেন এবং স্নান করিয়া আসিয়া গীতা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। বেলা তখন প্রায় ১১॥ টা। বহির্ব্বাটী হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবার কালে সন্ন্যাসীর থাকিবার ও আহার করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে কিনা তাহা জানিয়া যাইবার জন্য বাবুটি সেই প্রকোষ্ঠের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে সন্ন্যাসীঠাকুর গীতা পাঠ করিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, গীতা পাঠও অভ্যাস আছে নাকি ?"

নিগমানন্দ। একটু আছে বৈ কি।

বাবু। গুরুকরণ ক'রে পড়া হয়, না এমনিই পড়া হয় ?

নি। গুরুর কাছে থাকা কালেই কিছু কিছু পাঠ অভ্যাস করা আছে।

বাবু। আচ্ছা বল দেখি ঃ—

'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ' ইহার অর্থ কি ? জন্মিলেই যদি মরিতে হয় এবং মরিলেই যদি জন্ম হয়, তবে আর এত

পড়াশুনা করিয়া লাভ কি ? তাই ওসব ছেড়েছুড়ে দিয়েছি। আমিও আগে আগে পড়তুম।

নি। জন্মের পর মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর জন্ম ইহাই বিধির বিধান বলিয়া স্থূলচক্ষে প্রতীয়মান হইলেও জন্মগ্রহণ করিয়া যদি সদ্‌গুরু লাভ হয় ও তাঁহার উপদেশানুযায়ী সাধনাদ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করা যায় তখনই প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হয় যে দেহীর প্রকৃতই জন্ম হয় নাই। সুতরাং যার জন্ম হয় নাই তার মৃত্যুও হয় না ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়। আসা-যাওয়া শুধু জড়ের এবং সেই জড়ের উপর হইতে অভিমান এবং আমিত্ব-বোধ যখন চলিয়া যায় তখন জড়েরও আর আগমন হয় না।

বাবুটি যুবক-সন্ন্যাসীর সুযুক্তিপূর্ণ উত্তর শ্রবণে বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ বাঃ—এ ত অতি সুন্দর মীমাংসা। আমার আরও আলোচনার বিষয় আছে। এখন কাছারীর বেলা হয়ে গেছে, সন্ধ্যার সময় এ সমস্ত আরও আলোচনা করা যাবে। তুমি চলে যেওনা যেন।"

পাঠকগণকে এই ভদ্রলোকটীর সম্বন্ধে কিছু জানাবার প্রয়োজন আছে, কারণ নিগমানন্দের সাধন-জীবনের সঙ্গে এই ভদ্রলোকটীর বিশেষ সম্পর্ক আছে। ভদ্রলোকটীর নাম যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস। তৎকালে তিনি গৌহাটীর অতিরিক্ত সহকারী শাসক (**Extra Asstt. Commissioner)** ছিলেন। তাঁহার নিবাস রাজসাহী জেলা। এখানে যে বাটীতে তিনি বাস করিতেছিলেন সেটা ভাড়াটীয়া বাটী। নিগমানন্দ এখানে আসিয়া বেশ শান্তি বোধ করিতে লাগিলেন। সেইদিন সন্ধ্যার সময় নানাপ্রকার আলোচনার পর নিগমানন্দ যাহাতে তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া সাধনাদি করেন তজ্জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার সাধনামূলক সমস্ত অনুষ্ঠানই গোপন রাখিতে ও তদনুকূলে সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। যজ্ঞেশ্বরবাবুর কথানুযায়ী নিগমানন্দ কামাখ্যা না গিয়া ঐ স্থানেই থাকিয়া গেলেন। কয়েকদিনের

মধ্যেই যজ্ঞেশ্বরবাবু বাটীর সংলগ্ন উদ্যানের ভিতর একটি ছোট চালাঘর তৈয়ারী করিয়া দিলেন। অতঃপর নিগমানন্দ সেই চালাঘরে গিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। সুমেরদাসজীর আদেশ ছিল যে ষট্‌সাধনের প্রত্যেকটি ক্রিয়া দুই মাস পর্য্যন্ত অভ্যাস করিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। সুতরাং ষট্‌সাধনের তিন মাস কাল তখনও বাকী ছিল। এই স্থানে ষট্‌সাধনের অবশিষ্ট ক্রিয়াগুলি তিন মাস পর্য্যন্ত অভ্যাস করিয়া উহা পূর্ণ করিলেন। দেহকে যোগসাধনের উপযোগী করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে দেহ যাহাতে সাধনার ক্লেশ সহ্য করিতে পারে এবং বায়ু ধারণ করিতে পারে তজ্জন্য ষট্‌সাধনের প্রয়োজন হয় ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ষট্‌সাধনের প্রধান উদ্দেশ্য—ষট্‌সাধনের প্রধান উদ্দেশ্য শরীরকে রস ও শ্লেষ্মাশূন্য করিয়া যোগের দ্বিতীয় স্তরের সাধনার উপযোগী করা। ষট্‌সাধনার দ্বারা অন্নময় কোষের ক্রিয়াকে প্রতিরোধ করিয়া পরে প্রাণময় কোষের ক্রিয়ার উপর প্রভুত্ব করা। এই ষট্‌সাধনার পরেই প্রাণায়াম-সাধন। শরীরে রস ও শ্লেষ্মা পরিপূর্ণ থাকিলে প্রাণায়ামকালীন যে বায়ু গ্রহণ করা হয়, উহা দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চরণশীল হয় না বলিয়া অতি সত্বর বহির্গত হইয়া যাইতে চেষ্টা করে। কারণ সাধকের শরীরে বায়ু ধারণ করিবার স্থান সঙ্কুলান হয় না। শ্লেষ্মারসে পরিপূর্ণ থাকিলে ফুসফুস্‌ ও অন্যান্য বায়ুকোষগুলি আবৃত থাকায় প্রাণবায়ু গ্রহণ করিলেও সর্ব্বত্র প্রবেশ লাভ করিয়া স্থিতিলাভ করিতে পারে না। বক্ষ, মেরুদণ্ড, চক্ষুকোটর প্রভৃতি বায়ুর আঘাতে চিন্‌ চিন্‌ বা টন্‌ টন্‌ করিতে থাকে ও বায়ু বাহিরে আসিতে চেষ্টা করে। বায়ু দেহের ভিতর গিয়া সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায় ও রক্তকে ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিয়া দিয়া যেখানে যত রন্ধ্র আছে তথায় ঢুকিতে চেষ্টা করে। যদি ষট্‌সাধন না করা যায়, তবে অন্নময় কোষের ক্রিয়াকে রোধ করা যায় না—সুতরাং এই অন্নময় কোষের ক্রিয়ার ফলে দেহের সুখ দুঃখ সমস্তই অন্য কোষের উপর

ক্রিয়াশীল হইয়া পড়ে। অতএব যোগের পরবর্ত্তী ক্রিয়াগুলিও অচল হইয়া পড়ে ও প্রাণায়াম, প্রত্যাহার দ্বারা প্রাণময় কোষের ক্রিয়া রোধ করা যায় না। সুতরাং যোগের পর পর ক্রিয়াগুলিও অসাধ্য হইয়া যায়।

এই ষট্‌সাধন নিগমানন্দের এক বৎসরের ভিতর শেষ হইয়া যাওয়ায় তিনি প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ইত্যাদির দ্বারা প্রাণময় কোষের ক্রিয়াকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া আনিতে থাকিলেন। প্রাণায়ামের প্রতিক্রিয়ার পর খুব সারবান খাদ্যদ্রব্য আহার করিতে হইত। মা নিজ সন্তানকে যে ভাবে লালনপালন করেন, যজ্ঞেশ্বরবাবুর স্ত্রী সরযূদেবী* ঠিক সেই ভাবে নিগমানন্দের যে সময়ে যে খাদ্যটীর প্রয়োজন, তখনই তাহা তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতেন। এইভাবে প্রাণায়াম অভ্যাসের ফলে কিছু দিনের মধ্যেই প্রাণময় কোষের ক্রিয়াকে তিনি রোধ করিলেন।

প্রাণায়াম, প্রত্যাহারের উদ্দেশ্য—প্রাণায়াম, প্রত্যাহারের দ্বারা বায়ুকে সাম্য করায় মনের চাঞ্চল্য নষ্ট হইল, কারণ বায়ুর সহিত মনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বায়ু চঞ্চল হইলে মনও চঞ্চল হয়। প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুকে সাম্য করায় মনের সঙ্কল্প-বিকল্পজনিত ইতস্ততঃ ছুটাছুটি দূরীভূত হওয়ায় মন স্থির হইল। এক্ষণে এই রাজযোগের তৃতীয় স্তরের সাধনা ধারণা ও ধ্যান। ধারণা ও ধ্যান দ্বারা মনোময় কোষকে জয় করিয়া পরবর্ত্তী সাধনার উপযোগী হইতে হয়—ইহাই এই রাজযোগের সাধনার ক্রম। রাজযোগের এই তৃতীয় স্তরের সাধনা করিবার কালে বহিঃ সাহায্য করিবার জন্য একজন চেলার আবশ্যক হয়। ধারণার গাঢ়তাই ধ্যান এবং এ ধ্যানের পরিপাক অবস্থাই সমাধি।

ধারণা ও ধ্যান—এই ধ্যানে কখন যে পরিপাকাবস্থা বা সমাধি আসিয়া যাইবে তাহার কিছুই স্থিরতা থাকে না এবং সমাধির স্বরূপ যে কি তাহা যতদিন না জ্ঞাত হওয়া যায় ততদিন একটা ভয়মিশ্রিত ভাব

* অপর নাম মৃণালিনী দেবী।

থাকে। বিশেষতঃ গুরুর সান্নিধ্যে না থাকায় মাঝে মাঝে এ ভয়ও আসিয়া পড়ে যে সমাধি যদি আদৌ না ভাঙ্গে। এইজন্যই বহিঃ সাহায্য প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সুতরাং যজ্ঞেশ্বরবাবুর স্ত্রী সরযূদেবী সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার চেলার কার্য্য করিতে থাকিলেন। চেলার কার্য্য তাঁহাকে কি কি করিতে হইবে তাহা স্বামী নিগমানন্দ বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। ধ্যান করিতে করিতে যদি কোন সময় তাঁহার সমাধি আসিয়া যায় তবে তাঁহাকে তদ্রূপ অবস্থায় প্রথম দিন ২৪ ঘণ্টা পর বাহ্য জ্ঞান আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তিনি উপবিষ্ট থাকিলেও তাঁহার দেহ মৃতের ন্যায় থাকিবে এবং তাহাতে বাহ্যিক কোন প্রকার চেতনার চিহ্ন দেখা যাইবে না। যোগের সমাধি জড় সমাধি—অর্থাৎ দেহ জড়বৎ বা স্থাণুবৎ প্রতীয়মান হইবে—অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় তাঁহার ভিতরে চেতনা মাত্র থাকিবে। সুতরাং প্রথমে গব্যঘৃত দ্বারা তাঁহার স্কন্ধদেশ মর্দ্দন করিতে হইবে ও পরে দাঁত খুলিতে চেষ্টা করিতে হইবে। অতঃপর দাঁত খুলিলে দেখা যাইবে যে জিহ্বা স্বস্থানে না থাকিয়া ব্রহ্মতালুর দিকে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া গলদেশের ছিদ্র বন্ধ করিয়া আছে ও জিহ্বা অসাড় হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য জিহ্বাকে সহজাবস্থায় আনিতে হইলে উত্তম চাঁদিরূপার চিম্‌টার দ্বারা সাতিশয় মৃদুভাবে আকর্ষণ করিয়া টানিয়া ঋজু করতঃ ঘৃত দ্বারা জিহ্বা সিক্ত করিবে ও ধীরে ধীরে মালিশ করিতে থাকিবে। এই হেতু যজ্ঞেশ্বরবাবু পূর্ব্ব হইতেই একটী রূপার চিম্‌টা গড়াইয়া আনিয়াছিলেন, কারণ লৌহ শক্ত ধাতু—জিহ্বা অতিশয় কোমল, রৌপ্য অপেক্ষাকৃত নরম ও বিশুদ্ধ। জিহ্বার পক্ষে অনিষ্টকারী হইবে না বলিয়াই রূপার চিম্‌টা প্রশস্ত। তারপর পরিষ্কার নেকড়া দিয়া পলিতা তৈরী করিয়া উহা দুগ্ধে ভিজাইয়া অল্প পরিমাণে দুগ্ধ তাঁহার গলাধঃকরণ করাইতে হইবে। এই ভাবে কার্য্য করিলে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিবে।

যোগের প্রক্রিয়াগুলির ধরাবাঁধা নিয়ম। একটী প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ হইলে তাহার পরটী আবার সুচারুরূপে করিতে পারিলে সেটীও সিদ্ধ হইবে। ইহা নিজের আয়ত্তের ভিতর—কাহারও কৃপার উপর নির্ভর করিতে হয় না। যোগসাধনকারিগণ নিজেরা উপলব্ধি করিতে পারেন যে কখন সমাধি আসিবে। মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া কি ভাবে দ্রুত মূলাধারস্থিত কেন্দ্রীকৃত শক্তি যাহাকে সচরাচর কুণ্ডলিনীশক্তি বলে, তাহা বিভিন্ন পদ্মে যেরূপ উত্থিত হইতেছে তাহা স্বামী নিগমানন্দ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে থাকিলেন।

কুণ্ডলিনীর ঊর্দ্ধে গমন ও অধোগমন প্রভৃতি প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সময়টাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। কুণ্ডলিনী এক এক পদ্মে উঠিলে এক এক জগতের বিকাশ হয়—ইহা কিন্তু চরমাবস্থা নয়। চরমাবস্থায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে সাধকের নিকট অষ্টৈশ্বর্য্য প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। তাঁহার দিব্যদর্শন, দিব্যশ্রবণ এবং বৈদ্যুতিক গতি প্রভৃতি লাভ হয়। উহা সাধকের লক্ষ্যের বিষয় নহে। স্বামী নিগমানন্দ বুঝিতে পারিলেন যে অতি দ্রুত তাঁহার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এবং তজ্জন্য যজ্ঞেশ্বরবাবুর স্ত্রী সরযূদেবীকে পূর্ব্ব হইতেই উপদেশাদি দ্বারা তৈয়ারী করিয়া লইয়াছিলেন। কারণ যজ্ঞেশ্বরবাবু নিজে কাছারী বন্ধ করিয়া এসব বিষয়ে দেখাশুনা করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ এই সময় সর্ব্বদাই তাঁহার উপর লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

ত্রিকুট স্থান ও নিরালম্বপুরী—আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া যোগীগণ ত্রিকুট স্থান পর্য্যন্ত বায়ুর সাহায্যে গমন করিতে সক্ষম হন। ত্রিকুট স্থানের উপর নিরালম্বপুরী। সুতরাং এই নিরালম্বপুরী গমনে বায়ুরূপ সাহায্য ব্যতীত অন্য কোন অবলম্বন নাই। যোগীগণ অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া স্বীয় শক্তিবলে কেবলমাত্র এই স্থান পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু এখানে বা এই অবস্থায় উপনীত হইলে গুরুর

সাহায্য প্রয়োজন হয়। স্বামী নিগমানন্দ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির দ্বারা ক্রমে বিজ্ঞানময় কোষকে জানিলেন এবং সেই কোষের ক্রিয়াকে প্রতিরোধ করিয়া আনন্দময় কোষে উপনীত হইলেন। এখানে সেই ত্রিকূট স্থান। এই সেই তোরণ দ্বার—যাহার অতিক্রমণে জীব শিব হইয়া যায়—জীবসত্তা পরমাত্মসত্তায় মিশিয়া যায়। ক্রমে স্বামীজীর সেই শুভদিন আসিল—গুরুকৃপায় সেই ত্রিকূট স্থান অতিক্রম করিয়া তিনি নিরালম্ব-পুরীতে পরমাত্মসত্তায় নিমজ্জিত হইলেন—তাঁহার অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হইল।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি—প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা অতীত হইলেও স্বামীজীর যখন কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না তখন সরযূদেবী অত্যন্ত চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন ও পূর্ব্বের উপদেশানুযায়ী অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় যে সকল শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা একে একে মিলাইতে লাগিলেন—দেখিলেন তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে, দাঁত আঁটিয়া গিয়াছে, হাত পা প্রভৃতির সন্ধিস্থানগুলি পাথরের ন্যায় শক্ত হইয়াছে, চক্ষুর পাতার শিরাগুলি সঙ্কুচিত হইয়া কঠিন ভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। বাহ্যিকভাবে মৃতের ন্যায় সমস্ত লক্ষণাদি মিলিয়া যাইতেছে, কিন্তু তিনি বসিয়া রহিয়াছেন এই মাত্র প্রভেদ। চব্বিশ ঘণ্টা অতীত হইয়াছে—একবার সরযূদেবী ভাবিলেন, স্বামীজীর বাহ্য চেতনা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিবেন কিন্তু কেমন যেন এক অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য ও অজ্ঞাত অননুভূতপূর্ব্ব ভয় তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ মনে মনে বিচার করিয়া স্বামীজীর আদেশমত পূর্ব্বে যে ভাবে উপদিষ্টা হইয়াছিলেন ঠিক সেই প্রণালী অনুসারে বাহ্যিক উপায়ে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ কিছুক্ষণের চেষ্টায় তাঁহার মৃদু মৃদু শ্বাস বহিতে লাগিল। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যোগীগণ যেরূপ ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিয়া যান, তদ্রূপ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আবার

নিম্নভূমিতে অবতরণ করেন। কিন্তু প্রথম অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়মে বিশেষ ভরসা না থাকায় তিনি চব্বিশ ঘণ্টা পর স্বামীজীর সমাধি ভাঙ্গিয়া দিতে আদিষ্টা হইয়াছিলেন। সমাধি অবস্থা দর্শন করিয়া ভয়ে, বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় স্তব্ধীভূতা হইলেও তাঁহার আদেশানুসারে এইসব গুরুতর কার্য্য তিনি একাই সম্পাদন করিলেন।

অপার আনন্দলাভের পর স্বামীজীর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তিনি যেন আর ইহজগতের কেহ নহেন। আনন্দহ্রদে ডুব দিয়া উঠায় জগতের সমস্ত যেন আজ নূতন ভাবে তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইতে লাগিল। গভীর সুষুপ্তির পর গাত্রোত্থান করিলে যেমন "বাঃ! বেশ ছিলাম" এই প্রকার প্রশান্তির ভাব মনে উদয় হয়, প্রথম দিনের চব্বিশ ঘণ্টার সমাধির পর সেই উচ্চতম ভূমি হইতে যেমন নিম্নস্তরে অবতরণ করিয়াছেন, ঠিক তেমনি ভাবে সেই সেই উচ্চস্তরের ভাবসমুদয় ভুলিয়া গিয়া এক আনন্দ মাত্র ভাব তাঁহাতে পর্য্যবসিত হইল।

প্রথম দিনে অভিজ্ঞতার পর স্বামীজী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সাহসী হওয়ায় পুনরায় সমাধিতে বসিবার পূর্ব্বে সরযূদেবীকে তিন দিন পর বাহ্যজ্ঞান ফিরাইয়া আনিতে আদেশ দিলেন। এবার সঙ্কল্প করিয়া বসিবামাত্র স্বামীজী মুহূর্ত্তের ভিতর সহস্রারে নিরালম্বপুরে চিৎসত্তায় নিমজ্জিত হইলেন। অতঃপর দিবসত্রয় পরে তাঁহার বাহ্য চৈতন্য সম্পাদন করা হইল।

এক্ষণে প্রভূত পরিমাণে সাহসের সঞ্চার হওয়ায় তৃতীয়বার সমাধিতে বসিবার সময় ৭ দিন পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরাইয়া আনিতে আদেশ দিয়া তিনি আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ঐ সময়ের কথা স্বামী নিগমানন্দ আমার নিকট যেরূপ বলিয়াছেন তাহাতে জানিয়াছি যে ব্রহ্মাণ্ডের সপ্তভূমির প্রত্যেক ভূমি বা স্তরে তিনি এক এক দিন অতিবাহিত করিয়া প্রতি ভূমিতে কি আছে তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া ব্রহ্মের যে

একপাদে সৃষ্টি—সেই সৃষ্টি ভূ, ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি প্রতি লোক সম্বন্ধে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান প্রভৃতি এক এক চক্রে ভ্রমণ করিয়া তদ্বিষয়ে পরিজ্ঞাত হইলেন। এই সব সূক্ষ্ম চক্রের সহিত স্থূল বাহ্য লোকসমূহের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই এক এক চক্রে অবস্থান করিয়া এক এক লোকের সৃষ্টিবৈচিত্র্য দর্শন করিয়া সেই সেই লোকের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি একেবারে ব্রহ্মলোকে উপনীত হইলেন। এপর্য্যন্ত সবিকল্প বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থা। ইহার পরই নির্ব্বিশেষ বা অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় উপনীত হইলেন এবং তদবস্থায় চিৎসত্তায় বা স্বরূপে অবস্থান করিতে থাকিলেন।

এইরূপ অবস্থায় সপ্তম দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। সমাধি ভঙ্গ হইল না দেখিয়া সরযূদেবী বিশেষ চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন। তিনি নানা প্রকার প্রক্রিয়ার দ্বারা তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই তাহা ফিরিয়া আসিল না। যজ্ঞেশ্বরবাবু কাছারীতে ছিলেন; স্বামীজীর সম্বন্ধে কোন কথা যাহাতে প্রকাশ না হয়—স্বামী-স্ত্রী এইরূপ সর্ত্তে আবদ্ধ হওয়ার পরই স্বামীজী তথায় অবস্থান করিতে রাজি হইয়াছিলেন। সুতরাং এরূপ অবস্থায় তিনি নিরুপায় হইলেন। অতঃপর বাহ্যজ্ঞান ফিরাইয়া আনিতে উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি তাঁহার পরিচিত জনৈক লেডী ডাক্তারকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। উক্ত লেডী ডাক্তারটি বর্দ্ধমান জেলা-নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের কন্যা। তিনি বহু কষ্টে স্বামীজীর বাহ্যজ্ঞান ফিরাইয়া আনিলেন।

শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদান বায়ুর ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সুতরাং বাহ্যজ্ঞান ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে মলত্যাগ হইয়া যায়। ঐ সমস্তই সরযূদেবী নিজের সন্তানের মলমূত্র পরিষ্কার করিবার ন্যায় নিঃসঙ্কোচে করিতেন।

রাজযোগের চরমাবস্থায় পরমাত্মদর্শন বা পরমাত্মার সহিত যোগ বা পরমাত্মায় লয়—যে ভাষার দ্বারাই এই ভাব ব্যঞ্জনা করা যাউক না কেন তাহা এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির দ্বারাই লাভ হয়। এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সাধকের আত্মানুভূতি হয়। আত্মানুভূতিতে—আপাতদৃষ্টিতে যাহা জড় বলিয়া বোধ হয়—সেই সমস্ত জড়সম্বন্ধরহিত হইয়া—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় প্রভৃতি কোষ হইতে আত্মবোধটিকে উপসংহৃত করিয়া ধীরে ধীরে আনন্দময় কোষে লইয়া গিয়া কেবলমাত্র আত্মস্বরূপের উপলব্ধিতে ডুবিয়া গিয়া—নিজ আত্মসত্তায় সম্যক্ প্রবুদ্ধ হইয়া নিজের আত্মাকে মহান্ ও আনন্দমাত্রস্বরূপ বলিয়া বোধ হয়। এই সমাধিসুখ লাভ করিবার পর স্বামীজী প্রায় অধিকাংশ সময়ই সমাধিতে কাটাইতেন। যখন ইচ্ছা হইত তখনই সমাধিতে মগ্ন হইতেন এবং বাড়ীর লোক যাহাতে উদ্বিগ্ন না হয় তজ্জন্য সত্বরই নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করিতেন। এইভাবে সমাধিটা বেশ আয়ত্তের ভিতর আনিয়া ফেলিলেন। সমাধি এখন এমনই সহজ হইয়া আসিয়াছিল যে স্থিরভাবে বসিলেই কুণ্ডলিনী আপনিই সহস্রারে গমন করিত এবং প্রাকৃতিক নিয়মে পুনরায় নামিয়া আসিত।

নির্ব্বিকল্প সমাধি—এইভাবে স্বামী নিগমানন্দের প্রায় একমাস কাটিয়া গেল। একদা তিনি অন্যমনস্কভাবে বসিয়া আছেন—মনে বিশেষ কিছু চিন্তার তরঙ্গ নাই, যেন সমস্ত মনটা ফাঁকা। সহসা চিত্ত নিস্তরঙ্গ হইয়া একেবারে শূন্য হইয়া গেল ও নিজের পৃথক্ সত্তা হারাইয়া গেল। এমন এক অভূতপূর্ব্ব ভাব আসিয়া পড়িল যে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। কোথায়ও কিছু নাই—আছে শুধু জ্যোতিঃপ্রাচুর্য্য—স্নিগ্ধ ভাস্বর আনন্দসত্তা; আমার তোমার বলিয়া কিছু নাই—আত্মাতিরিক্ত সত্তার একান্ত অভাব—শূন্য—শূন্য—মহাশূন্য—চিৎসত্তায় মহাপূর্ণ। সেই চিৎসত্তা বলিতেই আমি—কেবল আমি

—কেবল আমি—বিরাট আমি—অখণ্ড অনন্ত জ্যোতিঃবিস্তার আমি; আমিই আদি-অন্তহীন অখণ্ড চিন্মাত্র—উহার অনুভবিতা আমি, অনুভব্যও আমি। *

উপরোক্ত অবস্থায় কয়েকদিন কাটিয়া গেল। কিন্তু এই অবস্থা হইতে কি ভাবে স্থূলে বা নিম্নভূমিতে অবতরণ করিলেন, স্বামী নিগমানন্দ তাহা আমাদিগকে এইরূপ বলিয়াছেন যে ঐ অবস্থায় তাঁহার অন্তরে গুরুভাব যদি না জাগিয়া যাইত তবে তাঁহার পক্ষে নিম্নে অবতরণ করা সম্ভব হইত না। কয়েকদিন পরে সর্পের নির্ম্মোকের ন্যায় স্থূলদেহ খসিয়া পড়িত। ঐ নির্ব্বিকল্পরূপ জ্ঞানাতীত ভূমি হইতে নিম্নে অবতরণ করিবার সূত্র একমাত্র গুরুভাব। এই গুরুভাব তাঁহার ভিতর অকস্মাৎ জাগিয়া যাওয়ায় এই গুরুভাবের সূত্র ধরিয়া স্থূলে আসিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নতুবা স্থূলে আসিবার আর কোনই উপায়ান্তর ছিল না।

জ্ঞানীগুরু স্বামী সচ্চিদানন্দ পরমহংস ও যোগীগুরু শ্রীমৎ সুমেরদাসজীর ভবিষ্যদ্বাণী "নির্ব্বিকল্প আপ্‌সে আ যায়গা" আজ সত্যসত্যই বাস্তবে পরিণত হইল। এই নির্ব্বিকল্প সমাধির দ্বারা ব্রহ্মের নির্গুণ সত্তার অনুভূতি হয়। জীবজগতের একটা অজ্ঞানের অবস্থা অর্থাৎ অজ্ঞান মানবের একটা গড়পড়তার বহরের উপর গুরুগিরির কর্ত্তব্যবোধ জাগিলেই নির্ব্বিকল্প ভূমি হইতে নামিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করিব। তবে একটা কথা পাঠকের জানিয়া রাখা দরকার যে এই নির্ব্বিকল্প সমাধির দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায় মাত্র এবং এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞই এক মাত্র "জ্ঞানীগুরু"-পদবাচ্য।

* নির্বিকল্প সমাধির পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য "শ্রীশ্রীনিগমানন্দের জীবনী ও বাণী"র ৪২ পৃষ্ঠা হইতে ৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে আমরা দেখিব যে যোগের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও জ্ঞানবাদীদের সাধনচতুষ্টয় দ্বারা যে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হয় তাহার সামঞ্জস্য ভূমি কতদূর এবং পার্থক্যই বা কতদূর। নির্ব্বিকল্পাবস্থা সর্ব্বত্র ব্যাপক ব্রহ্মস্বরূপে বা চিন্মাত্র তত্ত্বে অবস্থান। ঐ অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে অবলম্বনশূন্যরূপে অবস্থান। অবলম্বন থাকিলেই বুঝিতে হইবে একটা কিছু নিম্নাবস্থা—তাহার উপরে আর একটা কিছু আছে যাহা সকলের অবলম্বন। এই অবস্থা চরম সূক্ষ্মাবস্থিতি—উহার উচ্চাবচ অবস্থা নাই। সর্ব্বত্র সমরূপে অবস্থান ইহা জৈবভাবের বিরোধী, কারণ জীবের স্থূলদেহে সীমাবদ্ধ চৈতন্য ক্ষুদ্রদেহাভিমানী মাত্র। নির্ব্বিকল্পরূপ উচ্চতম অবস্থা বৌদ্ধধর্ম্ম কর্ত্তৃক শূন্যবাদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই অবস্থার কোনরূপ অবলম্বন নাই কারণ ইহাই সকলের অবলম্বন বলিয়া এই অবস্থা একবার প্রাপ্ত হইলে দেহে পুনরায় আগমন অর্থাৎ জীবভাবে পুনরায় অবস্থান অসঙ্গত হয় বলিয়া এই অবস্থা লাভের পর দেহ আপনিই খসিয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম ইহাকে মহাপরিনির্ব্বাণ বলিয়াছেন।

শূন্যবাদ—বৌদ্ধদের শূন্যবাদ ও হিন্দুদের অদ্বৈতবাদের স্বরূপ একই, তবে একটা "শূন্য" কথার অর্থ লইয়া যত দ্বন্দ্ব। বুদ্ধদেব বলিলেন, "যে অবস্থায় তত্ত্বরূপে অবস্থিতি এবং কোন অবলম্বন নাই সেটা শূন্যাবস্থা ছাড়া আর কি?" শঙ্কর বলিলেন, "তা' কি হয়? এই শূন্য বোধটা কাহার হইতেছে? কিছু নাই বা সব শূন্য এই উপলব্ধি করিতেছে কে? যে এই শূন্যতা উপলব্ধি করিতেছে সে নিশ্চয়ই আছে এবং সে আমি।" সুতরাং বৌদ্ধদের যেটা শূন্যবাদ, বৈদান্তিক হিন্দুদের সেটা পূর্ণবাদ বা অদ্বৈতবাদ। এই গেল অখণ্ডমণ্ডলাকার বিশ্বচৈতন্য সম্বন্ধে।

বিশ্বচৈতন্য সম্বন্ধে যেটা সত্য তাহা আবার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধেও খাটে। সুতরাং দেহকে যদি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ধরিয়া লওয়া যায় তবে ঐ ব্যাপকভাবে ব্রহ্মানুভূতি না হইয়া দেহের ভিতরও উহা লাভ হইতে পারে।

চৈতন্যের ব্যাপক ভাবকে আমরা ব্রহ্ম বলি, আবার দেহের ভিতরও যাহাকে যোগসাধনায় ধরিতে পারা যায়—তাহা চৈতন্যের ঘনীভূত ভাব। ঐ ঘনীভূত ভাবকে আমরা পরমাত্মা বলি। দেহের ভিতরে এমন একটী স্থান আছে যাহাকে নিরালম্বপুরী বলে। এই স্থানে জীব চিদ্ঘন পরমাত্মস্বরূপে সাময়িক ভাবে লীন হইতে পারে। জৈবভাব ক্ষয় হইতে হইতে জীবের শিবভাব মাত্র অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ যখন জীবের ভিতর চিন্মাত্র বস্তুটী অবশিষ্ট থাকে তখন জীব পরমাত্মার সহধর্ম্মী হওয়ায় সমাধিরূপ পরমানন্দাবস্থায় তাঁহাতে তাহার সাময়িক মিলন হয়।

নির্ব্বিকল্প ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির পার্থক্য—এইক্ষণে নির্ব্বিকল্প সমাধি ও যোগের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে স্বরূপতঃ একাবস্থা লাভ হইলেও বিশেষ কিছু পার্থক্য আছে। বেদান্তের নির্ব্বিকল্পাবস্থার উপর নিজের কোন আধিপত্য থাকে না। ঐ অবস্থায় যদি অভিমান জাগিয়া না যায়, অর্থাৎ "আমি গুরু হইব" এই নিম্ন ভাব না জাগিয়া উঠে তবে দেহে পুনরাগমন হয় না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে বিশ্বাত্মা তাঁহাদের ভিতর গুরুভাব জাগাইয়া পুনরায় দেহে আনয়ন করেন শুধু অধ্যাত্মতত্ত্ব জগতে প্রকাশ করিতে।

কিন্তু যোগের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যোগী স্বেচ্ছায় নিজের সমাধিকে পরিচালিত করিতে পারেন। সমাধিস্থ হইবার পূর্ব্বে সঙ্কল্পবদ্ধ থাকায় ঐ সঙ্কল্প যোগীর সমাধিকে পরিচালিত করে; সুতরাং যোগীর পূর্ব্ব ইচ্ছানুসারে সমাধি ভঙ্গ হইয়া যায়। এক ঘণ্টা, এক দিন বা পাঁচ দিন ব্যাপী সমাধি-সুখ ভোগের যেরূপ সঙ্কল্প তিনি করেন ঠিক তদনুযায়ী যোগীর সমাধিভঙ্গ হয়। এরূপ সঙ্কল্প না করিলেও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ও কুণ্ডলিনীর অধোগমনের সময়ে বা স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে সমাধিভঙ্গ হইয়া থাকে। সুতরাং সমাধি-সুখের বহরটা যোগীর খুব বেশী এবং সমাধি সম্পূর্ণ তাঁহার করতলগত—যখন যেমন ইচ্ছা।

এতদ্ব্যতীত অন্য দেহে সঞ্চারণীশক্তিও যোগীদের অসাধারণ। তাঁহার অমোঘ ইচ্ছাশক্তি সাতিশয় বলবতী। কারণ ঐ ইচ্ছাশক্তিকে যোগী একমুখী ও কেন্দ্রীভূত করিতে সিদ্ধহস্ত। ইহা ভিন্ন যোগী স্বেচ্ছায় দেহ-ত্যাগ করিতে পারেন, স্বেচ্ছায় জীবন দীর্ঘ করিতে পারেন, কিন্তু জ্ঞানবাদিগণ তাহা পারেন না ; ভক্তগণও অন্যের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত, ইহা আমরা পরে দেখিতে পাইব। ইহাই হইল এই দ্বিবিধ সমাধির সাধারণ ব্যবধান। অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সব ব্যবধান আছে তাহা আলোচনায় আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই।

সিদ্ধমনোরথ হইয়া নূতন জগতের নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া স্বামীজী গৌহাটি বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। মুক্তাবস্থায় স্বচ্ছন্দবিচরণকারী হইয়া ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন ভিন্ন আর কাজ কি? সুতরাং গৌহাটি হইতে সরাসরি বাঙ্গালা হইয়া এলাহাবাদে সাধুসম্মিলনীতে যোগদানোদ্দেশ্যে তথায় গমন স্থির করিয়া যজ্ঞেশ্বরবাবু ও তৎপত্নীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। বাস্তবিকই তাঁহাদের নিকট বিদায় লইতে উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট মনোবেদনার কারণ ছিল। তাঁহারা অকাতরে কতই না তাঁহার সেবাযত্ন করিয়াছেন। কিন্তু অনর্থক তাঁহাদের অন্ন ধ্বংস করাও সমীচীন নহে, বিশেষতঃ যখন তিনি তাহাদের কোন প্রকার উপকার করিতে পারিতেছেন না। বিদায়কালে যজ্ঞেশ্বরবাবু স্বামীজীকে কুম্ভ হইতে পুনরায় গৌহাটিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করেন এবং সম্ভব হইলে তাঁহার সন্ন্যাসের গুরুকে যদি কামাখ্যা দর্শন করাইতে লইয়া আসেন তবে তাঁহারাও তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন।

অতঃপর তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া স্বামীজী এলাহাবাদ অভিমুখে রওনা হইলেন। ইহা ১৩১২ সালের কথা। তখন স্বামীজীর বয়স মাত্র ২৬ বৎসর। সবে মাত্র যুবক—মুখে গোঁপের রেখা দিয়াছে। এই তরুণ সন্ন্যাসীটী যখনই যে গাড়ীতে উঠিয়াছেন, সমস্ত আরোহীবৃন্দের দৃষ্টি এই অত্যদ্ভুত দেবমানবটির উপর আকৃষ্ট হইত। সচরাচর মানুষের গায়ের রঙ্ খুব গৌর হইলে লোকে উহাকে কাঞ্চনবর্ণ বলে। কিন্তু অনেক সময় স্বামীজীর যাতায়াতের সময় তাঁহার শরীর অগ্নিবর্ণ কেন ইহা অনেকে প্রশ্ন করিত। অনেক সময় একজন অপরকে ডাকিয়া তাঁহার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিত, "দেখ, দেখ, একটী কিরূপ সন্ন্যাসী"!

ইহা কিন্তু স্বামীজীর কর্ণগোচর হইত। মানুষের গায়ের বর্ণ যে এরূপ অগ্নিবর্ণ কি করিয়া হয় তাহা জিজ্ঞাসা করিত। যোগের প্রক্রিয়ার ফলে শরীরের রক্ত শোধিত হইয়া অগ্নিবর্ণ ধারণ করে। এইরূপ অগ্নিবর্ণ কান্তি পরে পরিণত বয়সে কিরূপে ও কিভাবে মলিন হইয়াছিল তাহা আমরা যথাস্থানে স্বামী নিগমানন্দ নিজমুখে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বলিব।

এলাহাবাদ কুম্ভে যোগদান—স্বামীজী এলাহাবাদে পৌছিয়া এক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায় অবস্থিতি করিতে থাকিলেন। এলাহাবাদে দুই একদিন অবস্থিতি করিবার পর স্বামীজীর এক গুরুভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় জানিলেন যে স্বামী সচ্চিদানন্দ এলাহাবাদ কুম্ভে যোগদান উপলক্ষে কয়েকদিন হইল তথায় আসিয়া শৃঙ্গেরী মঠের মোহান্ত জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের সহিত অবস্থান করিতেছেন। শ্রবণমাত্র গুরুদর্শনের জন্য তাঁহার মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং তিনি গুরু-ভ্রাতাটীর সহিত গুরুদত্ত দণ্ড লইয়া বহির্গত হইলেন।

শৃঙ্গেরী মঠের মোহান্তের আশ্রমে গিয়া দেখিলেন প্রকাণ্ড সিংহাসনে উক্ত মোহান্ত বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে ঐ মঠের অন্তর্গত প্রায় ১২৫ জন মহাপুরুষ উপবিষ্ট আছেন। তন্মধ্যে স্বামী সচ্চিদানন্দও অন্যতম। স্বামীজী গিয়া সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার গুরুদেবকেই প্রণাম করিলেন। পরে মোহান্ত ও অন্যান্য সাধুকে নমস্কার করিলেন। স্বামীজীর এতাদৃশ ধৃষ্টতায় অন্যান্য খোট্টা সাধুগণ তাঁহার সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত মঠগুলির শীর্ষস্থানে যে-সমস্ত মোহান্ত থাকেন তাঁহাদিগকে জগদ্‌গুরু বলা হয়। তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে সম্মান না করিয়া স্বামী সচ্চিদানন্দ পরমহংসকে প্রণাম করা এই বাদানুবাদের হেতু। নিগমানন্দ বলিলেন তাঁহার গুরুই জগদ্‌গুরু। শাস্ত্রে বলে—

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

তজ্জন্য জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য যিনি শৃঙ্গেরী মঠের মোহান্ত ও তাঁহার গুরু স্বামী সচ্চিদানন্দ এবং পরমাত্মা সবই অভেদ। যদি অভেদ না হয় তবে "অনবস্থা" দোষ আসিয়া পড়ে, অদ্বৈতবাদ নষ্ট হইয়া যায়।

জগদ্‌গুরু নীরবে উভয় পক্ষের বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া স্বামীজীর বাক্য সমর্থন করিয়া সকলকে বলিলেন, "বাচ্চা ঠিক্ বাত্ বোল্‌তা হ্যায়।" তিনি তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন "তোম্ বাহারমে পাহাড় পর্ব্বত সরিৎ সাগর সব দেখা?"

নিগমানন্দ বলিলেন, "হাঁ—সব দেখা।"

শঙ্করাচার্য্য। আউর কাঁহা দেখা?

নিগমানন্দ। ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি, তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ। সমাধিমে সব দেখ্‌লিয়া।

অনন্তর শঙ্করাচার্য্য স্বামী সচ্চিদানন্দকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "এ বাচ্চা পরমহংস হো গিয়া—কাহে এস্‌কো দণ্ডী রাখা হ্যায়?"

তখন সচ্চিদানন্দের আদেশে নিগমানন্দ দণ্ড জলে নিক্ষেপ করিলেন। দণ্ড মাত্র তাঁহাকে তিন বৎসর রাখিতে হইয়াছিল।

নিগমানন্দকে পূর্ব্বে বিদায় দেওয়ার পর স্বামী সচ্চিদানন্দের সহিত তাঁহার এই প্রথম সাক্ষাৎ। পূর্ব্বেকার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতাময় শিষ্য নিগমানন্দ এই দেহের ভিতর হারাইয়া গিয়া আর এক নূতন নিগমানন্দ জাগিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বেকার নিগমানন্দকে তাঁহার ভিতর অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি আর-এক নিগমানন্দের সাক্ষাৎ পাইলেন। এ নিগমানন্দ গুরু নিগমানন্দ—আত্মপ্রতিষ্ঠ নিগমানন্দ; ব্রহ্মজ্যোতিঃ-উদ্ভাসিত তাঁহার মুখমণ্ডল, যোগাগ্নিময় তাঁহার দেহ—তাঁহাতে ব্রাহ্মীস্থিতি—গভীর গম্ভীর অতলস্পর্শী প্রশান্তি ও স্নিগ্ধতা।

সচ্চিদানন্দ চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন, গুরুশিষ্য উভয়েই এক স্তরে দাঁড়াইয়া, কোন ভেদ নাই, ভেদটা যা কিছু তাহা অণুপরমাণুসংহতি-স্বরূপ এই স্থূলদেহ দু'টী। স্বামী সচ্চিদানন্দ নিগমানন্দকে জনবিরল স্থানে ডাকিয়া লইয়া গিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল ভাবে তাঁহার নিকট সব কথা শুনিয়া বলিলেন—"আভি তোমারা গুরুদক্ষিণা দেনে পড়ে গা"। স্বামী নিগমানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ দক্ষিণার স্বরূপ কি ?"

সচ্চিদানন্দ। তোম্‌কো গুরু বানানে হোগা—আউর মেরা গদ্দিমে বৈঠেগা।

স্বামী নিগমানন্দ বলিলেন যে তাঁহার প্রথম আদেশ পালন করিতে তিনি রাজি আছেন কিন্তু পুষ্করের গদীতে বসিলে তাঁহার দ্বারা বিশেষ কিছু কাজ হইবে না। কারণ খোট্টাদের ভিতর তাঁহার ক্রিয়া ও প্রভাব বিশেষ ফলপ্রসূ হইবে না। তাঁহার ভাষাও সকলে বুঝিতে পারিবে না। দুনিয়ার সব গদীই যখন স্বামী সচ্চিদানন্দের তখন যেখানে বসিলে বিশেষ কাজ হইবে সেইখানেই বসিবেন। সচ্চিদানন্দ তাহাতে রাজী হইলেন। অতঃপর উভয়ে পরস্পরের নিকট বিদায় লইলেন।

স্বামীজী এলাহাবাদ হইতে কাশীতে আসিলেন। এলাহাবাদ হইতে কাশী মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। কাশীতে আসিয়া তাঁহার এক নর্দ্দমার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বাল্যকালে তিনি শুনিয়াছিলেন যে কাশীতে কেহ অভুক্ত থাকে না। নর্দ্দমায় যে সমস্ত উচ্ছিষ্ট নিক্ষিপ্ত হয় তদ্দ্বারা কুকুরের সঙ্গে ক্ষুধার্ত্ত একটী নিঃস্ব ব্যক্তিকে উদরপূর্ত্তি করিতে দেখিয়া তিনি মনে ভাবিলেন, ইহা এক প্রকার অভুক্ত থাকা বৈ কি! এ সম্বন্ধে কাশীর একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আগন্তুক অভুক্ত থাকে না।" তখন তিনি মনে মনে বলিলেন, "বেশ, আমি ত আগন্তুক—অদ্য কাশীতে আসিয়াছি। দেখি কি প্রকারে আগন্তুকের নিকট আহার্য্য উপস্থিত হয় ?" সারাদিন তিনি

অনাহারে থাকিলেন, সন্ধ্যার সময় দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়া একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটী অতি কদাকার বৃদ্ধা—দাঁতগুলি বিশ্রী—চুলগুলি কটা—একখানি ছেঁড়া কাপড় পরা—তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "বাবা! আমি গঙ্গায় স্নান করিব। আমার এই খাবারের চুপড়িটী তোমার নিকট রেখে যেতে চাই, তুমি যদি একটু দেখ!" তিনি বলিলেন, "আচ্ছা রাখ।" বৃদ্ধা তাঁহার পার্শ্বে চুপড়িটী রাখিয়া জলে নামিল। স্বামীজী কিছুক্ষণ পরে অন্যমনস্ক হইলেন। একটু পরেই তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায় তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সমাধি ভাঙ্গিতে রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা হইয়া গেল। চাহিয়া দেখিলেন যে চুপড়িটী তাঁহার পার্শ্বেই পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধার আর কোন সন্ধান নাই। অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন ব্যাপারটা কি? বৃদ্ধা কোথায় গেল! বহুক্ষণ চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। একে ত সমস্ত দিন অনাহারে, ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর। আর ভাবিলেন অন্নপূর্ণাও হইতে পারেন। যাহা হউক চুপড়িটী খুলিয়া দেখিলেন যে আটটা বর্দ্ধমানের সীতাভোগ রহিয়াছে। বর্দ্ধমানের সীতাভোগ বৃদ্ধা কি প্রকারে সংগ্রহ করিল? পুনরায় একবার চারিদিকে বৃদ্ধার অনুসন্ধান করিয়া সেগুলি টপাটপ্ উদরস্থ করিয়া খুব খানিকটা জল পান করিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তারপর একটা অতি পুরাতন ও পরিত্যক্ত দালানের একটা অন্ধকার ও চাম্‌চিকার মলগন্ধময় স্যাঁৎসেতে ঘরে শুইয়া পড়িলেন। শুইবামাত্রই নিদ্রিত হইলেন। স্বপ্নে অন্নপূর্ণার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গন্ধময় ঘরটী সৌরভে পরিপূর্ণ হইয়া উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইল।

অন্নপূর্ণা কর্ত্তৃক অপূর্ণত্ববোধের জাগরণ—অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আমিই অন্নপূর্ণা, কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তুমি ত দেবদেবী বিশ্বাস

কর না—ভগবান বিশ্বাস কর না। ভগবান অনন্ত শক্তিমান—তাঁহার বিভিন্ন শক্তির পরিচালক এ সব দেবদেবী। কাশীতে যে আগন্তুক অভুক্ত থাকে না এখন বোধহয় তাহা বিশ্বাস করিলে? আমিই তোমাকে সীতাভোগ দিয়াছিলাম।”

নিগমানন্দ বলিলেন—তুমি দেবে কেন? এক বৃদ্ধা দিয়েছিল।

অন্নপূর্ণা। আমি এই তত্ত্বময়রূপ লুকাইয়া বৃদ্ধার রূপ ধরেছিলাম। যে শক্তিতে বিশ্ব পরিচালিত, যিনি বিশ্বরূপ ধরেছেন, তিনি যে একটা সামান্য বৃদ্ধার রূপ ধারণ করিতে পারেন না ইহা তুমি কি প্রকারে বুঝিলে? তোমার এখনও অভাব রহিয়া গিয়াছে—ভগবত্তত্ত্ব এখনও তোমাতে অপ্রকাশিত।

অতঃপর স্বপ্নভঙ্গ হইল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া অন্নপূর্ণার মন্দিরে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বে যাহা বিশ্বাস করেন নাই এখন তাহার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষানুভূতি হওয়ায় বুঝিলেন, এ তত্ত্ব তাঁহাতে প্রকাশিত না হওয়ায় তাঁহার এক প্রকাণ্ড অভাব রহিয়া গিয়াছে। এখনও তিনি অপূর্ণ। কিন্তু এ তত্ত্ব এখন কোথায় গিয়া শিক্ষা করিবেন? কয়েক দিন তিনি ভগবদারাধনার পন্থা জানিবার উপায় অন্বেষণ করিতে থাকিলেন। অতঃপর তাঁহার গৌরীমার কথা স্মরণ হওয়ায় ঐ চিন্তার অবসান হইল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া পদব্রজে মুসুরির দিকে রওনা হইলেন। দিনের পর দিন পায়ে হাঁটিয়া পথ চলিতে থাকিলেন—যখন নিতান্ত অক্ষম হইয়াছেন তখনই কোন রেল ষ্টেশনে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। যদি কোন ভদ্রলোক স্বেচ্ছায় তাঁহাকে টিকিট কিনিয়া দিয়াছেন তখনই মাত্র রেলে চড়িয়াছেন। জীবনে তিনি কখনও সাধুবেশের সুবিধা লইয়া রেল-কোম্পানীকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করেন নাই কারণ উহা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। সুতরাং অধিকাংশ সময় পায়ে হাঁটিয়া মুসুরির

পথে বদ্রীনারায়ণের দিকে অগ্রসর হইয়া অবশেষে পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত সুশোভিত গৌরীমার আশ্রমে উপনীত হইলেন।

পাঠকের স্মরণ আছে যে গৌরীমার নিকট প্রথম যখন স্বামী সচ্চিদানন্দ নিগমানন্দকে লইয়া গিয়াছিলেন সে প্রায় ২ বৎসর আগেকার কথা। কত লোক হয়ত তাঁহার কাছে যাতায়াত করিতেছে, এইরূপ অবস্থায় তাঁহার কথা কি গৌরীমার স্মরণ আছে? সচ্চিদানন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল এবং তাঁহার সঙ্গে তিনি গিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি গৌরীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। নতুবা কোনক্রমেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ গৌরী বিশিষ্ট বিশিষ্ট মহাপুরুষের সহিতও সচরাচর সাক্ষাৎ করেন না।

গৌরীমার আশ্রম—গৌরীর সেবকগণ পৃথক থাকেন। সেখানে সচরাচর কাহারও যাইবার হুকুম নাই। স্বামিজী সাত পাঁচ ভাবিয়া জনৈক সেবককে তাঁহার পূর্ব্ব সাক্ষাতের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া গৌরীর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে সচ্চিদানন্দের সেই বাঙ্গালী শিষ্যটী তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চান। সেবকটী গৌরীমাকে যথাসময়ে সমস্তই নিবেদন করিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৌরীমা স্বামীজীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার ঘরের পার্শ্বে একটী কুঠরী স্বামীজীর অবস্থানের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

ভাবতত্ত্বের বিকাশ—নিগমানন্দ সেই কুঠরীতে অবস্থান করিলেন। ক্রমশঃ সন্ধ্যা অতীত হইল। পূর্ব্বে যেখানে শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত সমতলভূমি ভিন্ন আর কিছুই দেখেন নাই সেখানে যেন কাহারও ইচ্ছামাত্র একটী সুসজ্জিত কক্ষ চক্ষের নিমিষে আবির্ভূত হইল—যেন কোন মায়াবীর মায়াদণ্ডস্পর্শে লোকলোচনের অলক্ষ্যে মুহূর্ত্তের ভিতর একটা বিরাট আশ্চর্য্য কিছু ঘটিয়া গেল। সুসজ্জিত কক্ষে সহসা আলো ঝলমল্ করিয়া উঠিল—কক্ষাভ্যন্তর হইতে স্বর্গীয় সৌরভ দশদিক

আমোদিত করিয়া মনের ভিতর যেন এক নব যৌবন উন্মেষের প্রথম সাড়ায় ন্যায় কেমন এক অব্যক্ত মধুর ভাব জাগাইয়া দিল। অতঃপর নিগমানন্দ সেই মায়ারচিত কক্ষে আহূত হইলেন। নিগমানন্দ বুঝিলেন যে চিত্রকূট পর্ব্বতে ভরতকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ভরদ্বাজ ঋষি যেরূপ যোগৈশ্বর্য্য বিকাশ করিয়াছিলেন, গৌরীমাও তদ্রূপ যোগৈশ্বর্য্য বিকাশ করিয়া ঐ কক্ষের রচনা করিলেন। সেই কক্ষের রচনা শুধু তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি কক্ষাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন—অপূর্ব্ব দ্রব্যসম্ভারে সমৃদ্ধিশালী কক্ষটি যেন এ মরজগতের কোন গৃহ নহে। চিত্রিত তাহার দেওয়াল, স্তবকে স্তবকে শ্বেত, পীত, লোহিত পুষ্পরাজি ; আশে পাশে গুঞ্জনরত ভ্রমর কুসুমের মধুপানে রত ; সুন্দর ঝাড়ে স্নিগ্ধ ভাস্বর আলোকোজ্জ্বল কক্ষতলে পালঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ শয্যা। নিগমানন্দকে বসিতে বলিয়া গৌরী দাঁড়াইয়া রহিলেন—যেন সুদীর্ঘ সময়ের পর প্রিয়জনের আগমন প্রতীক্ষায় দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া প্রেমিকা। আর তাঁহার আনত নয়নের ভাষাহীন ইঙ্গিতে সলজ্জ নীরব অভ্যর্থনা। কিন্তু একি! একি সেই গৌরী? ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষগণ যাঁহার কৃপালাভে ধন্য হন, "মা" বলিয়া কৃতার্থ হন, তাঁহার পক্ষে এ কি প্রকার অভ্যর্থনা! নিগমানন্দ যে সুদূর দেশ হইতে কত কায়ক্লেশে আসিয়াছেন তাঁহার একবিন্দু কৃপা ভিক্ষার জন্য। কক্ষের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া নিগমানন্দ বলিলেন, "গুরু সচ্চিদানন্দ স্বামীর সঙ্গে আপনার নিকট এসেছিলাম—তখন তাঁহাকে বলেছিলেন যদি কখনও আমি নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করতে পারি তখন যেন এসে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করি।"

গৌরী। তুমি কি কি সাধনা করেছ?

নিগমানন্দ তখন তাঁহাকে বলিলেন যে গৃহত্যাগের পূর্ব্বেই তান্ত্রিক সাধনার দ্বারা মহাশক্তির সাক্ষাৎ পান। পরে তাহাতেও নিজেকে অপূর্ণ

ব'লে মনে হ'তে থাকে। তখন যোগের সাধনায় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, তারপর বিনা সাধনায় নির্ব্বিকল্প সমাধি এসে যায়।

গৌরী। কি জন্য আর সাধনা কর্ত্তে গেলে? মহাশক্তির নিকট বেদান্তের সাধনায়, যোগের সাধনায় বা ভাবের সাধনায় যাহা জানা যায় সে সব তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিতে বর চাহিলে না কেন? অথবা পরে তাঁর কাছে এসব জেনে নিলে না কেন? তাহ'লে এত কঠোরতার ভিতর দিয়ে যেতে হ'ত না।

কিন্তু তাঁর কাছে এসব তত্ত্ব জানা হয়নি যে কেন তাহা ত আর গৌরীকে খুলিয়া বলা যায় না। সে যে একান্তই ব্যক্তিগত কাহিনী—তাহা বলিয়া নিজে লজ্জা পাওয়া ভিন্ন আর কি! সুতরাং সে কথায় নিগমানন্দ আর বিশেষ কিছু উত্তর দিলেন না। গৌরী নিজেই বলিতে থাকিলেন—"ভগবানকে পেলে সবই পাওয়া হ'য়ে গেল।"

নিগমানন্দ। আপনারা যা'কে ভগবান বলেন আমার ত মনে হয় যে সে ভগবান গুণময়।

গৌরী। গুণের যেখানে শেষ সেইখানেই নির্গুণ। নিজে কঠোর সাধনা ক'রে তাঁর বিভিন্ন তত্ত্ব জানা অপেক্ষা যিনি এসব বিষয় জানেন, যিনি তত্ত্বরূপী—যাঁর কাছে যাবতীয় তত্ত্বের চাবিকাঠি—তাঁকে স্বামীভাবে পাইয়া তাঁর সঙ্গে ঘর করা কি ভাল নহে?

নিগমানন্দ। তাতে আর সন্দেহ কি?

গৌরী। আর যদি সেই ভগবানকে স্ত্রীরূপে পাওয়া যায়—স্ত্রী স্বামীকে যেমন সমস্ত প্রাণ উঘাড়িয়া ভালবাসে, তার সেবা করে, সেই নির্গুণ-সগুণের সন্ধিস্বরূপ ভগবান স্ত্রীরূপে তাঁর দাসী হ'য়ে তাঁকে সেবা করে, সেটা কি ভাল নহে? সেটা কি মধুর নহে? সেটা কি যোগ ও বেদান্তের শুষ্ক জ্ঞানের চেয়ে সরস নহে?

নিগমানন্দ। অবশ্যই ভাল।

গৌরী। দেখ, এই ব্রহ্মাণ্ডে যতপ্রকার জীব আছে সকলেই ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিয়া মানুষ হইয়াছে। মানুষের ভিতর আবার কত প্রকার রূপ আছে এবং কত প্রকার গুণের তারতম্য আছে। মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে হইতে দেবতায় পরিণত হইতেছে। এইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর জীবের ভাবের উৎকর্ষ বিচার করিতে করিতে গিয়া যেখানে এই উৎকর্ষের চরম পরিণতি হইয়াছে বা শেষ সীমায় পৌছিয়াছে সেইটাই ভাবলোক। এই ভাবলোক সগুণ নির্গুণের সন্ধি ও সংক্রমণ স্থানে অবস্থিত। এখানে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, কান্তা ইত্যাদি জগতের সমস্ত ভাবের উৎকর্ষ হইয়া পরিস্ফুট বা মূর্ত্ত হইয়াছে। ধর, জগতের যত স্ত্রী-জীব আছে—হিংস্র ইতর জন্তু হইতে মানুষ পর্য্যন্ত সবার ভিতর হইতে স্ত্রীত্ব বাহির করিয়া লইয়া যদি একটী মূর্ত্তি গড়া যায়, তাহাতে যেমন প্রত্যেক মানবের স্ত্রী-বুদ্ধি ভিন্ন অন্য ভাব হইতে পারে না, তদ্রূপ জগতের সমস্ত স্ত্রী-জীবের ভিতর হইতে যদি মাতৃত্বটুকু লইয়া একটী মূর্ত্তি গড়া যায় তবে তাহাতে মাতৃভাব ভিন্ন অন্য কোন ভাব আসিতে পারে না। ধর, একটী বাঘিনীর ভিতর যে মাতৃভাব আছে, তাহা তাহার শাবক ভিন্ন অন্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। একটী শ্বেতাঙ্গী রমণী তাহার হাবভাব, পোষাক পরিচ্ছদ লইয়া তোমার নিকট আসিলে তাহার মাতৃত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে না। উপন্যাসে ঐরূপ একটী বিলাসিনীর কথা পাঠ করিয়া তাহার ছবিটী সম্মুখে না থাকিলেও সন্তানের প্রতি তাহার মাতৃত্বের আকর্ষণ বেশ উপলব্ধি হইবে। এইরূপে জগতের সব ভাব সেখানে মূর্ত্ত হইয়াছে। নিত্যলোকে যাহা প্রতিষ্ঠিত, এ জগতে গার্হস্থ্য ধর্ম্মে তাহার আভাস বা ছায়া। বাংলার ভক্তিধর্ম্ম এবং জগতের গার্হস্থ্য-সম্পর্ক এই ভাবলোকের আদর্শে গঠিত। ভাবলোকে যাহা সূক্ষ্ম এ জগতে তাহা স্থূল হইয়া অনেকটা কদর্য্য হইয়াছে। প্রেমিক ভাবুকের কাছে এই আস্তরণপট উদ্ঘাটিত হইয়া

যায়। সুতরাং সে আর এ জগতের লোক নয়, সে ভগবানের পরিবার-ভুক্ত হইয়া যায়, যেমন তোমাদের গৌরাঙ্গ হইয়াছিলেন। তাঁহার কিসের অভাব ছিল—তবু নিজের স্বরূপ আচ্ছাদিত করিয়া নিত্যলোকের লীলারসে তিনি নিজেকে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন।

নিগমানন্দ গৌরাঙ্গের নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। গৌরী কাশ্মীরী ব্রাহ্মণকুমারী অথচ গৌরাঙ্গের খোঁজ রাখেন। নিগমানন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গৌরীর যুক্তির সারবত্তা অনুধাবন করিতে থাকিলেন। পরে বলিলেন, "কিন্তু এখানে স্বামী-স্ত্রীর যে আকর্ষণ, উহা অনেকটা স্থূল। এই স্বামী-স্ত্রীর ধর্ম্ম যদি সেই নিত্যলোকের নিত্যলীলার আদর্শে গঠিত হইয়া থাকে তবে তাহাদের পরস্পর আকর্ষণের হেতু কি?"

গৌরী। পুরুষের ভিতর এমন একটা জিনিস গুপ্তভাবে আছে যাহা তাহার পুরুষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে। সে জিনিসটি হয়ত তাহার হাতে, পায়ে, মাথায়, গায়ে কোথাও নাই অথচ তাহার শরীরে লুক্কায়িত আছে। স্ত্রীর ভিতরেও এমন একটা বস্তু গুপ্ত আছে যাহা তাহার হাতে, পায়ে, মাথায় নাই। উভয়ের এই দু'টি জিনিসই মিলিতে চায়। উভয়ের ভিতর গুপ্তভাবে ঐ জিনিস দু'টী অবস্থিতি করে। ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা উহারা মিলিত হইলে উভয়েই আনন্দিত হয়। এইক্ষণে মনে কর এই উভয়ের ভিতর হইতে ঐ গুপ্ত পদার্থের দ্বারা যদি একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রী মূর্ত্তি গড়া যায় তবে তাহাদের অঙ্গবিশেষের সঙ্গম করিয়া আনন্দ আনিতে হইবে না। তাহারা উভয়ে চিরযুগলে পার্থিব সামরস্যে কোটী কোটী গুণ সুখে বিহার করিবে। তাহাদের একের প্রতি অঙ্গ অপরের প্রতি অঙ্গ-স্পর্শে একই প্রকার আনন্দ পাইবে। স্থূল জীবের স্থানবিশেষের ক্রিয়ার ন্যায় সেই মূর্ত্তিদ্বয়ের মিলনেই যে আনন্দ উদ্ভূত হইবে সেই আনন্দের তারতম্য হইবে না। তদ্রূপ পুংত্ব ও স্ত্রীত্ব সেখানে মূর্ত্ত হওয়ায় তাহাদের চিরমিলনের কখনও ব্যত্যয় হইতে পারে না। জগতের চরমে যত

যাইবে—মিলন বা একত্রের দিকে তত গতি হইবে। স্থূলেই বৈচিত্র্য বা বিয়োগ, বিরহ শুধু অভাবজন্য। ইহাকে জ্ঞানীগণ চিদানন্দের একান্ত মিলন বলেন। তাই জগতে এত ভালবাসাবাসি। ভালবাসা আদি, ভালবাসা অন্ত। এই ভালবাসাই ভগবান—ভগবানই ভালবাসা। প্রেমের কাঙ্গাল তিনি। তুমি কি তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিবে ?

বলিতে বলিতে ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গৌরীর আকৃতিরও পরিবর্তন লক্ষিত হইল। তাঁহার ঠোঁট দুটী কাঁপিয়া উঠিল—রক্তিম গণ্ডে তরঙ্গ উঠিল—দরবিগলিতধারে নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল—দেহ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি বেতস লতার ন্যায় কাঁপিতে থাকিলেন। কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "বল, তুমি আমার নিকট কি চাও ?"

নিগমানন্দ। আমি এখানে প্রেমের ভিখারী হইয়া আসিয়াছি। শুনিয়াছি প্রেমের কোন সাধনা নাই। মহতের কৃপায় প্রেমের উদয় হয় এবং সে প্রেমের সঞ্চারণসূত্র ভালবাসা।

গৌরী। আমি তোমাকে প্রেম শিক্ষা দিব, কিন্তু তুমি কি আমাকে ভালবাসতে পারবে ? ভালবাসার ভিতর দিয়া ভিন্ন কিছু সঞ্চারিত করা যায় না।

এই বলিয়া কাঁদিতে থাকিলেন। তাঁহার দেহে সাত্ত্বিকভাবের বিকাশ হইতে থাকিল। স্বেদ, স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ্য, দরবিগলিত অশ্রু, রোমাঞ্চ, কম্প প্রভৃতি লক্ষণ তাঁহাতে দেখা দিল। এই প্রকার ভাব সঞ্চারের ফলে কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া নিগমানন্দের চরণতলে পতিত হইলেন। ত্রিকালজ্ঞা প্রেমিকা ঋষিকার মন যে এত কোমল ইহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহাকে 'বজ্রাদপি কঠোরাণি' বলিয়া মনে হইয়াছিল। প্রেমের প্রসঙ্গে তাঁহাকে 'মৃদুনি কুসুমাদপি' দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন। পদতল হইতে তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইলেন। গৌরী

আবেগময় স্বরে বলিলেন, "আমি সারা জীবনটা তোমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি কবে তুমি আসিবে, কবে এ প্রেমপ্রবাহ জগতে প্রবাহিত করাইবে। আজ তোমাকে পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি। যে নর দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, আর যে নারী হ্লাদিনীর স্বারূপ্য লাভ করিয়াছে, তাহাদের উভয়ের মিলনে আজ এস্থান কৈলাস বা বৈকুণ্ঠে পরিণত হইয়াছে।" বলিতে বলিতে নিগমানন্দ যে পালঙ্কের উপর বসিয়াছিলেন সেই পালঙ্কের একপার্শ্বে বসিলেন। গৌরীর 'প্রেম শিক্ষা দিবার প্রণালী নিগমানন্দের ভিতর ধীরে ধীরে কেমন যেন এক উন্মাদনা আনিল, যেন নেশাগ্রস্তের ন্যায় নিগমানন্দ গৌরীর দিকে নিমেষহীন নেত্রে কি এক আকর্ষণে তাকাইয়া থাকিতে বাধ্য হইলেন ও গৌরী তাঁহার ভিতরে যে উদ্দাম ভাবপ্রবাহ জাগাইতেছিলেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে থাকিলেন। পাঠক অবগত আছেন যে কোটা জঙ্গলে যোগিনীদের তুলনায় গৌরীর বয়স যাহাই হউক না কেন, ২৬।২৭ বৎসর বলিয়া প্রতীয়মান হইত। কিন্তু প্রাণের কম্পন দ্বারা দেখিতে দেখিতে গৌরীর বয়স ও চেহারার একান্ত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া গেল। তিনি আজ নিগমানন্দের দেহের ভিতর প্রকৃত পুরুষের সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি নিগমানন্দের দেহে পতিঃ পতীনাম্—শ্রীপতির সন্ধান পাইয়াছেন। তাই গৌরী আজ রাসেশ্বরীর ভাবে ভরপুর। সেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বয়স মাত্র ১৬।১৭ বৎসর প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ষোড়শীর ন্যায় অঙ্গাবয়ব লক্ষিত হইল। রসে গরগর তনু তার নিতান্ত অলস, ভাষাময় নয়নযুগল ঢলঢল, উদ্দাম যৌবনে অঙ্গ দলমল। যেন পূর্ব্বের গৌরী আর নাই। যে রূপ যোগের কঠোর সাধনায় নিগমানন্দের স্মৃতিপট হইতে দুই বৎসর মুছিয়া গিয়াছে এ যে তাঁহারই পূর্ব্বাশ্রম নলিনীকান্তের প্রাণোন্মাদকারী মনোময়ী সুধাংশুবালার রূপ গৌরী ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু আকৃতি তাহার হইলেও তদপেক্ষা সহস্রগুণ জ্যোতির্ম্ময়ী—

যেন সোহাগ সুখের অভিমানে গরবিণী প্রেমময়ী—নয়নে মুক্তাফল ঝরঝর করিয়া পড়িতেছে। সমস্ত জগৎটা যেন একটা প্রহেলিকার ন্যায় নিগমানন্দের পদতল হইতে সরিয়া গেল। যেন আর কিছু নাই—শুধু ঠাকুর ও ঠাকুরাণী—ভাবে প্রেমে মাতোয়ারা—বহুদিনের পর যেন দেখা—কোন কথা নাই—চোখের জলে বেদনার বিনিময়—ব্রহ্মজ্ঞ নিগমানন্দের ব্রহ্মজ্ঞানের অভিমান চূর্ণীকৃত—তিনি আজ দীনাতিদীন, মহাভাবময়ীর নিকট প্রণয়ভিখারী। অতঃপর নিগমানন্দের বাহ্যজ্ঞান ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে থাকিল। তখন মনোময়ীর রূপধারিণী গৌরীর করস্পর্শে নিগমানন্দ ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন। নিত্যলোকের আস্তরণ-পট চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত হইয়া গেল।

প্রত্যূষে নিগমানন্দের বাহ্যচৈতন্য ফিরিয়া আসিল। তিনি তখন টলিতে টলিতে গৌরীর কাছে বিদায় লইলেন। গৌরীও সানন্দে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। দীর্ঘ যুগের পর যুগ পাহাড়ের বুকে আত্ম-গোপন করিয়া গৌরীমা হৃদয়ভাণ্ডারে যে প্রেম সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন আজ তাহা লোকালয়ে প্রবাহিত করিবার উপযুক্ত পাত্রে সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাকে ইহজগতে পাঠাইলেন যাহাতে তাহার বিন্দুদানে লোক জন্ম সার্থক করিতে পারে।

এক্ষণে "সারাজীবনটা" গৌরী নিগমানন্দের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। স্বামী সচ্চিদানন্দ নিগমানন্দকে বলিয়াছেন যে তিনি বহুকাল হইতেই তাঁহাকে ঐরূপ দেখিতেছেন। দশম পরিচ্ছেদে পূর্ব্ববর্ণিত কোটা জঙ্গলে ৮০ বৎসর বয়স্কা যুবতী যোগিনীর তুলনায় গৌরীমার বয়স যে ২৫০ বৎসর তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু নিগমানন্দের বয়স তখন ২৬ বৎসর মাত্র। তা হ'লে গৌরীর সারাজীবন প্রতীক্ষা কি প্রকারে সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে? ২০০ বৎসর পূর্বে যখন নিগমানন্দ অন্যদেহে ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চার

করিতেছিলেন, তখন হইতেই তাঁহার উপর গৌরীর লক্ষ্য ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তাহার পর সে-দেহ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন দেহ ধারণ করতঃ নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভ পর্য্যন্ত তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সুতরাং পূর্ব্বজন্ম হইতে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কারণ যোগীদের নিকট ২০০ বৎসর অনন্তকালের তুলনায় কিছুই নহে।

গৌরীর কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে ইহাও মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে তিনি ঠিক নিগমানন্দের ন্যায় এইরূপ বিবিধ সাধনায় সিদ্ধ একজন মহাপুরুষের অর্থাৎ ঐরূপ একটা আধারের প্রতীক্ষায় এতদিন বসিয়াছিলেন তাঁহার হৃদয়ভাণ্ডারে যে প্রেম সঞ্চিত ছিল তাহা জগতে প্রবাহিত করিবার জন্য। যাহা হউক নিগমানন্দ বিদায় লইয়া পথ চলিতে লাগিলেন। প্রেমিকের কাছে আজিকার জগৎ আর দু'দিন পূর্ব্বের জগৎ এক নহে। এখন তৃণ, গুল্ম, বৃক্ষ, সরিৎ সবেতেই প্রেমের সঞ্চার—রসে ভরপূর—সকলেই তাঁহাকে প্রেমের কথা কহে—আকাশ বাতাস প্রেমের পুলকস্পর্শে প্রীতির সম্ভাষণ জানায়—পুষ্পিত তরু তাহার তরু-রূপ ছাড়িয়া সেই মনোময়ী রূপ ধারণ করে। যেদিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন সেইদিকেই প্রেমময়ীর রূপ ফুটিয়া উঠিতে থাকে। শ্রীরাধার যেমন "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে" অবস্থা হইয়াছিল, স্বামী নিগমানন্দেরও তদ্রূপ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় প্রেমময়ীর রূপ ফুটিয়া উঠিল। এইরূপে অন্তর্বাহ্য ভাব লইয়া পথ অতিবাহন করিতে করিতে তিনি স্বামী সচ্চিদানন্দের আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলেন। দুই একদিন তথায় অবস্থান করিলেন। একাকী এরূপ অবস্থায় পথ চলা বিপজ্জনকও বটে। এদিকে সচ্চিদানন্দের পূর্ব্ব হইতে যে কামাখ্যা দর্শন করিবার ইচ্ছা আছে তাহা তিনি জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু সুযোগ-সুবিধা ও সঙ্গী জুটে নাই বলিয়া যাইতে পারেন নাই, বিশেষতঃ তিনি নিগমানন্দকে

অত্যধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার অনুরোধ সচ্চিদানন্দ এড়াইতে পারিবেন না ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। যজ্ঞেশ্বরবাবুও তাঁহাকে দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং নিগমানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দকে কামাখ্যা দর্শন করাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া উভয়ে একসঙ্গে আসাম গমনোদ্দেশ্যে রওনা হইলেন।

স্বামী সচ্চিদানন্দসমভিব্যাহারে নিগমানন্দ যথাসময়ে গৌহাটি আসিয়া যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাসায় উপনীত হইলেন। যজ্ঞেশ্বরবাবু তাঁহাদিগকে দেখিয়া পরমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া নিজেদের অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করিলেন। কয়েকদিন গৌহাটিতে অবস্থান করিয়া সচ্চিদানন্দ কামাখ্যা দেখিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহাকে বিদায় দিবার পূর্ব্বে যজ্ঞেশ্বরবাবু নিগমানন্দকে নিতান্ত অল্পবয়স্ক মনে করিয়া সচ্চিদানন্দের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। সচ্চিদানন্দ বলিলেন "হাম্‌সে কেয়া দিক্‌সা লেগা ?" নিগমানন্দকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন "উস্‌সে লেনা—হাম্‌সে লেড়কা বহুৎ বড়া হো গিয়া।" অতঃপর যজ্ঞেশ্বরবাবু ও তদীয় পত্নী সরযূ দেবী উভয়ে একসঙ্গে নিগমানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তাঁহারাই নিগমানন্দের সর্ব্বপ্রথম শিষ্যদ্বয়। এতদিন পরে স্বামী নিগমানন্দ তাঁহার গুরুর আদেশে যজ্ঞেশ্বরবাবু ও তদীয় পত্নী উভয়কে দীক্ষা দিয়া গুরুপদে বরণীয় হইলেন। সুতরাং এখন হইতে তিনি "শ্রীশ্রীঠাকুর" নামেই অভিহিত হইবেন। যজ্ঞেশ্বরবাবু ও তাঁহার পত্নী শ্রীশ্রীঠাকুরের যোগসাধনাকালে সেবার দ্বারা যেভাবে ঋণী করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এখন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাদিগকে দীক্ষা দিয়া সে ঋণ শোধ করিয়া পুনরায় সহস্রগুণে ঋণী করিয়া সচ্চিদানন্দের সহিত কামাখ্যায় যাত্রা করিলেন। উভয়ে কামাখ্যায় গিয়া দেবীর মন্দির ও তথা হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী বশিষ্ঠাশ্রম প্রভৃতি দর্শন করিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলেন। তথায় কয়েক দিবস বিশ্রাম করিয়া গারোহিলের পথে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে গারোহিলের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দর্শনে সচ্চিদানন্দ এতই মুগ্ধ হইলেন যে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বিদায় দিয়া তিনি পায়ে হাঁটিয়া গারোহিলে প্রবেশ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন একাকী গৌহাটি চলিয়া

আসিলেন। কিন্তু পথে নানাপ্রকার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মাঝে মাঝে ভাবস্থ হইয়া যাইতে লাগিলেন। পরে কোনক্রমে যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাসায় পৌছিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে থাকিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেমোন্মাদ—যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাসায় অবস্থান কালে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেমোন্মাদ উপস্থিত হইল। যখন এই ভাব তাঁহাতে প্রকাশিত হইত তখন একাদিক্রমে তিন চার দিবস পর্য্যন্ত একভাবে কাটিত। কেশগুলি সজারুর কাঁটার ন্যায় উর্দ্ধমুখী হইত—নেত্রদ্বয় জবাফুলের ন্যায় লাল হইত—দৃষ্টি শূন্য হইত—লোমকূপগুলি শিমূলের কাঁটার ন্যায় ফুলিয়া উঠিত—অঙ্গের বস্ত্র খসিয়া পড়িত। যজ্ঞেশ্বরবাবুর স্ত্রী কটিদেশে বস্ত্র বাঁধিয়া দিতেন। দিবানিশি চোখ দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িত—কখনও কখনও নেত্রপ্রান্ত বা লোমকূপ দিয়া রক্ত নির্গত হইত। এই অন্তর্বাহ্য ভাবের কালে কাপড়ে অসাড়ে বাহ্য প্রস্রাব হইয়া যাইত। যজ্ঞেশ্বরবাবুর স্ত্রী নিজ হস্তে সেই মলযুক্ত বসন খসাইয়া শরীর পরিষ্কৃত করিয়া নূতন বস্ত্র পরাইয়া দিতেন। দিনের পর দিন না খাইয়া থাকিতেন। যজ্ঞেশ্বরবাবুর স্ত্রী নিজহস্তে তাঁহাকে জোরপূর্ব্বক খাওয়াইয়া দিতেন—কতক বাহিরে পড়িত, কতক বা গলাধঃকরণ হইত। আহার করান ও মলমূত্র পরিষ্কার প্রভৃতি তিনি নিজ হস্তেই করিতেন।

এ সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদিগকে নিজমুখে বলিয়াছেন—যখন তাঁহাতে এই ভাব প্রকাশ পাইত তখন চতুর্দ্দিকে প্রেমময়ীর রূপ ফুটিয়া উঠিত—পুষ্পিত তরুতে ধীরে ধীরে যেন সেই প্রেমময়ীর রূপ গড়িয়া উঠিত—একটী সুন্দর পুষ্পে যেন প্রেমময়ীর মুখখানা ফুটিয়া উঠিত—নবকিশলয়-ভারানবত তরুটী যেন প্রেমময়ীর যৌবন ধার করিয়া গরগর করিতে থাকিত—উষার অরুণ যেন প্রেমময়ীর হাসি ধার করিয়া হাসিতে থাকিত—নব জলধরের কৃষ্ণাভা প্রেমময়ীর কেশের আভাসে সুন্দর—সুন্দর বালক বালিকা ও যুবতীদের পৃথক পৃথক বাহ্যিক

প্রকৃতি হারাইয়া বা বিলীন হইয়া গিয়া তাহাদের ভিতরে প্রেমময়ীর রূপ ফুটিয়া উঠিয়া সম্মুখে হুড়াহুড়ি করিতে থাকিত—ঝির্ঝির্ করিয়া যখন হাওয়া বহিত তখন মনে হইত, প্রেমময়ী যেন তাঁহার স্থূল সুকোমল পীনপয়োধর তাঁহার গায়ে বুলাইয়া দিয়া যাইতেছেন।

যখন ভাব-সমাধি ভাঙ্গিয়া বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিত তখন তিনি যজ্ঞেশ্বরবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর নিকটে শুনিতেন যে অমুক দিন অমুকের মেয়ে, অমুকের স্ত্রী তাঁহাকে দেখিতে আসিলে তিনি তাহাদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কতই না কাঁদিয়াছেন, অমুকের মুখে কতই না চুম্বন দিয়াছেন—অমুক ফুলগাছটীকে এক ঘণ্টা জড়াইয়া ধরিয়া কেবলই চুম্বন করিয়াছেন ও গদ্গদভাষে কতই না প্রেমালাপ করিয়াছেন। শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বিস্মিত হইতেন। কয়েকদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুর শিষ্যদম্পতীকে বলিলেন, এ যে বড় ভয়ানক অসামাজিক কথা। তবে ত লোকালয়ে কাহারও গৃহে থাকা তাঁহার ঠিক নহে। সুতরাং সত্বর কলিকাতার দিকে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। যজ্ঞেশ্বরবাবুর স্ত্রী সরযূ দেবী তাহাতে বলিলেন—"ঠাকুর! আপনার ভাবসমাধির অবস্থায় চুম্বন পাওয়া ত খুব সৌভাগ্যের কথা। আপনাকে আমি এ অবস্থায় ছাড়িতে পারিব না।" এইরূপ চুম্বনরূপ প্রেমচিহ্ন কাহারও কাহারও নিকট সৌভাগ্যের কথা হইলেও আবার কাহারও হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় ঐ স্থান পরিত্যাগ করিবার বিষয় তিনি চিন্তা করিতে থাকিলেন। যজ্ঞেশ্বরবাবু ও তাঁহার স্ত্রী তাঁহার তদবস্থায় সর্ব্বজনসমক্ষে যে সব ক্রিয়াকলাপাদি করিতেন তাহার আলোচনা করিতেন, আর হাসিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও হাসিতেন। ঐ সময়ের ক্রিয়াকলাপাদি তাঁহার কিছুই মনে থাকিত না। যজ্ঞেশ্বর বাবুও ক্রমে ভাবের পরিবর্ত্তন হওয়ায় বৈরাগ্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিলেন। যাহা হউক অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান থাকিতে থাকিতে তিনি কলিকাতায় রওনা হইলেন।

কলিকাতায় আসিয়া কোথায় অবস্থান করিবেন এইরূপ চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হইল। এ অবস্থায় কাহারও আশ্রয়ে থাকা উচিৎ নহে সুতরাং কালীঘাটে মায়ের মন্দিরের ধর্ম্মশালায় অবস্থান করা সমীচীন মনে করিলেন। কালীঘাটে মন্দিরের নিকট পৌছিলে দেখিতে পাইলেন, সচ্চিদানন্দ নকুলেশ্বর মন্দিরে বসিয়া গাঁজা সাজিবার উদ্যোগ করিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া সোৎসুকে বলিলেন—"আরে তোম্ কাঁহাসে ?"

গৌহাটীতে যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাসায় যেরূপ বেসামাল ও অসামাজিক ভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেখান হইতে যে এখন আসিতেছেন তৎসমস্তই শ্রীশ্রীঠাকুর সচ্চিদানন্দকে বলিলেন। সচ্চিদানন্দ একগাল হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন "যব্ গৌরী তোমকো নির্ব্বিকল্পকা পর ঘুম্‌কে যানে বোলা, ঐ বকত হামারা সব মালুম হো গিয়া।"

অতঃপর ধর্ম্মশালায় কয়েকদিন উভয়ে অবস্থান করিবার পর সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিলেন যে তিনি এক অতি সুন্দর মনোরম স্থান দেখিয়াছেন উহা তিনি তাঁহাকে না দেখাইয়া ছাড়িবেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও সে স্থানের কথা বুঝিতে পারিলেন না কিংবা প্রশ্ন করিয়াও বুঝিতে পারিলেন না যে সচ্চিদানন্দ কোন্ স্থানকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। অবশেষে উভয়ের সেই স্থানে যাওয়া স্থির হইল। সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরকে হাওড়ায় লইয়া গিয়া ব্যাণ্ডেল হইয়া নৈহাটী আসিয়া তথা হইতে আসাম মেল ধরিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে পূর্ব্বেই যদি বলেন যে আসাম যাইবেন তাহা হইলে এত ঘোরাফেরা না করিয়া শিয়ালদহে গাড়ী চড়া যাইত। কিন্তু সচ্চিদানন্দ কিছুতেই বলিলেন না। অতঃপর জামালপুর আসিয়া গারোহিলে ঢুকিলেন। এখানে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের আবার আশ্রম-জীবনের ন্যায় রাঁধিতে হইত। কয়েকদিন রাঁধিবার পর উহা তাঁহার

আর ভাল লাগিল না। এখন কি আর ঐসব ভাল লাগে? এখন নিভৃতে প্রেমময়ীর সহিত প্রেমালাপ করিবেন অথবা ভাত রাঁধিবেন? বিশেষতঃ এক অরণ্যে দুই সিংহের কি স্থান পোষায়? একদিন তিনি সচ্চিদানন্দকে কিছু না বলিয়া চম্পট দিয়া একেবারে চিলমারিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, পরে তথা হইতে কোদালধোয়ায় আসিয়া উপনীত হইলেন।

কোদালধোয়া গারোহিল জেলার একটি পার্ব্বত্য গ্রাম, উহা হাজংজাতি দ্বারা অধ্যুষিত। কোদালধোয়ায় হাজংগণ একজন অল্পবয়স্ক সাধুকে পাইয়া তাঁহার নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিল ও তাঁহাকে আহারাদি প্রদান করিতে থাকিল। সেখানে কিছুদিন বাস করাতে হাজংগণের সহিত তাঁহার বেশ সৌহার্দ্দ্য হইয়া গেল। হাজংগণ তাঁহাকে সেইস্থানে একখানি ছোট পর্ণকুটীর তৈয়ারী করিয়া ভিতরে শয়ন করিবার জন্য একটা বাঁশের মাচা তৈয়ারী করিয়া দিল। ঐ স্থানে বিস্তর সোরা দেখিতে পাওয়ায় স্থানীয় ডেপুটী কমিশনারকে শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিলেন যে সেস্থানে বিস্তর সোরা পাওয়া যায়। এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ পাঠাইয়া দিয়া সরকারের বিশেষ আয় হইতে পারে কিনা দেখা আবশ্যক। ডেপুটী কমিশনার যথাসময়ে আসিয়া তদন্ত করিলেন কিন্তু আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হইবে বলিয়া ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব বোধে পরিত্যক্ত হইল। এদিকে সচ্চিদানন্দ যে তাঁহার খোঁজ করিতেছেন ও হাজংজাতির ভিতর জ্ঞানের বীজ বপন করিতেছেন ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। অবশেষে ইহাও শুনিলেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর এই স্থানে আস্তানা করিয়াছেন একথা সচ্চিদানন্দ জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে গারোহিল হইতে চলিয়া গিয়াছেন এবং বলিয়াছেন "বাঙ্গালী বহুৎ খারাপ হ্যায়। বাংলামে কভি নেহি আবেগা।" অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুর দেখিলেন যে শুধু শুধু হাজংদের অন্ন

ধ্বংস করা উচিত নহে—যদি না তাহাদের কিছু উপকার করিতে পারেন। এই উপকার করিবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় হাজংদের সাহায্যে ঐস্থানে একটী লোয়ার প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজেই উহার শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে থাকিলেন। স্কুল ইন্‌সপেক্টরকে এ সম্বন্ধে লিখিলে স্কুল সাব্‌ ইন্‌সপেক্টর খান খানসং বাহাদুর বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া শিক্ষককে মাসিক সাত টাকা বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। টাকা ছয়মাস অন্তর দেওয়ার ব্যবস্থা ঐ দেশে প্রচলিত থাকায় হাজংদের সাহায্যেই তাঁহার চলিত। ঐ টাকা পাইলেই স্কুলের জন্য ব্যয় করিতেন। "স্বামীজী" "সরস্বতী" "পরমহংস" প্রভৃতি বড় বড় উপাধি ডুবিয়া গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর "পণ্ডিতজী" হইয়া দাঁড়াইলেন।

গারোহিলের কোদালধোয়া নামক স্থানে প্রেমিকের বাসর ঘর—বিদ্যালয়ে কয়েক ঘণ্টা অধ্যাপনা শেষ হইলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার ঘরে ঢুকিতেন, আর নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাহির হইতেন। কখনও কখনও দুই তিন দিন পর্য্যন্ত ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া থাকিতেন। হাজংগণ বলিত ঐ সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের "পাগ্‌লা" চড়েছে। কারণ ঐ সময় মদন, সীতারাম প্রভৃতি অনুগত হাজংগণ যাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে তদবস্থায় দেখিয়াছে তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে পাগল ভিন্ন অন্য কোন আখ্যা দিতে পারে নাই। ঐ "পাগ্‌লা" অবস্থা মাত্র কয়েকদিন স্থায়ী হইত বলিয়া তাঁহার "পাগ্‌লা চড়িলে" আবার "পাগ্‌লা নামিয়া যাইবার" আশা করিত—যেমন ভূতে পাইলে লোকে আবার ভূত নামিয়া যাইবার আশা করে। মদনকে পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীঠাকুর এই সময় ডাকাডাকি, দরজা ভাঙ্গা প্রভৃতি করিতে নিষেধ করিয়া দিতেন। তাহারাও তদনুযায়ী কার্য্য করিত।

এই পার্ব্বত্য প্রদেশে নিভৃত টিলার উপরে—বৃহৎ বিল্ববৃক্ষের নিম্নে ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরটী ছিল প্রেমিকের বাসর ঘর—বাঁশের মাচার উপর কম্বল বাসর-শয্যা। প্রেমিকের পাগলামীকে এখানে এই পার্ব্বত্য বর্ব্বর

জাতির ভিতর কেহ নিন্দা করিবে না—কেহ তাঁহাকে অসামাজিক বলিবে না—কপালে কেহ লম্পটের ছাপ মারিয়া দূর হইতে নমস্কার করিয়া দূরে সরিয়া যাইবে না—এখানে কেহ তাঁহাকে আবাহনও করিবে না—বিসর্জ্জনও দিবে না। এখানে কাহারও নিন্দাস্তুতির, মান-অপমানের দাবীর ভিতর নিজেকে ফেলিতে হইবে না। যেমন উদ্ভিন্ন-যৌবনা অভিসারিকা প্রেমিকা ও তরুণ প্রেমিক আপনাদিগকে কোথাও আত্মগোপন করিয়া পরস্পরকে কিরূপে আদর করিবে বুঝিতে পারে না—শ্রীশ্রীঠাকুর ও মহাভাবঠাকুরাণীরও তখন ঠিক তদবস্থা। মহাভাব-ময়ী ঠাকুরাণী শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে আবির্ভূতা হইতেন অস্থিচর্ম্মময় স্থূল শরীর লইয়া। তিনি আসিতেন বিশ্বের সমস্ত প্রেম লইয়া—বিশ্বের সব হাসিরাশি অধরে ধরিয়া, বিশ্বের সব যৌবনভার বক্ষে বহন করিয়া—বিশ্বের সব কারুণ্য হৃদয়ে লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে শুধু অর্ঘ্য দিতে। জ্ঞানীর কাছে রূপ ব'লে কিছু থাকে না বটে কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্ঞানের অভিমান চূর্ণীকৃত হইয়াছে—রূপ ব'লে যে কিছু আছে তাহা তিনি বুঝিয়াছেন এবং প্রেমিকের কাছে প্রেমই যে রূপের স্বরূপ এবং প্রেমই যে রূপ-গ্রহণ করিতে পারে তাহাও তিনি বুঝিয়াছেন। জ্ঞানের শুষ্ক চক্ষে শুষ্ক হৃদয়ে প্রেমের বান ডাকিয়াছে—জমাট অশ্রু প্রেমের তাপে গলিয়া গিয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমিক নিভৃত পর্ণকুটীরে প্রেমিকাকে দেখিতেন আর কেবলই কাঁদিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মাচার উপর যখন শুইয়াছেন—মহাভাবময়ী ঠাকুরাণী তাঁহার পার্শ্বে শুইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বসিলেন, তিনিও উঠিয়া বসিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কাঁদিলেন, তিনিও কাঁদিতে থাকিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বাহিরে যাইতে চাহিলেন, তিনি বসনাগ্র চাপিয়া ধরিলেন। একান্তই যদি চলিয়া গেলেন তবে প্রেমময়ী মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিলেন। নিভৃত পর্ণকুটীরে ঘরণীর সহিত শ্রীশ্রীঠাকুর এইভাবে ঘর করিতে থাকিলেন, কেহ জানিল না—

কেহ দেখিল না। এইভাবে কতদিন চলিল—অবশেষে প্রেমময়ী একদিন বলিলেন—তোমার এইভাবে কতদিন যাবে? তোমাকে যে গুরু হ'তে হবে—স্মরণ নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর দিলেন না। তাঁহার গুরু হইবার ইচ্ছা যে আদৌ ছিল না—গুরুভাব নির্ব্বিকল্প সমাধিতে জাগিয়া গিয়াছিল তাই স্থূলে আসিতে সক্ষম হইয়াছিলেন নচেৎ চিন্মাত্র ব্রহ্মস্বরূপতার ব্যাপ্তি বোধে প্রতিষ্ঠিত থাকায় শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ আপনিই খসিয়া পড়িত। কিন্তু গুরুগিরির যে বড় ঝামেলা। ঝামেলা তিনি কোনদিনই পছন্দ করিতেন না, আর এখন ত কথাই নাই। নিভৃতে এইভাবে দিন কাটাইবেন এইত তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের ধারা—কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যে বিরাট কর্ম্ম তাঁহার সম্মুখে, প্রেমময়ী তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু যখন কোন জবাব পাইলেন না তখন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি, জবাব দিলে না যে?"

শ্রীশ্রীঠাকুর। গুরুগিরিতে বড় ঝামেলা—ওতে বড় দায়িত্ব।

প্রেমময়ী। তা কি হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। দুটি সর্ত্তে আমি এই গুরুগিরি ঘাড়ে নিতে পারি।

প্রেমময়ী। কি সে সর্ত্ত দু'টি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার শিষ্যত্ব স্বীকার ক'রে যারা আমাকে ছেড়ে যাবে তারা তিন জন্মে অবশ্যই মুক্ত হবে।

প্রেমময়ী। বেশ তাই হবে—অপরটা আবার কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আর যারা আমার শিষ্যত্ব স্বীকার ক'রে শেষ পর্য্যন্ত আমারই শরণাগত থাক্‌বে, তারা এই জন্মেই মুক্ত হবে—তা' তারা সাধনা করুক আর নাই করুক।

প্রেমময়ী। বেশ তাই হবে। যারা ভক্তি-বিশ্বাসের সহিত উৎকট সাধনা কর্‌বে তারা দেহের স্থিতিকালেই মুক্ত হবে এবং অপর সকলেই

ক্রম-মুক্তি লাভ করবে—তাদের আর ফিরে জন্ম নিতে হবে না। ইহা আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিলাম।

অতঃপর এই গুরুগিরির ব্যাপারে প্রেমময়ীর সহিত দরকষাকষি করিবার পর আরও দু'মাস চলিয়া গেল কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের লোকালয়ে যাইবার কোন ভাব পরিলক্ষিত হইল না। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত প্রেমময়ী পূর্ব্ববৎ নিভৃত জীবন যাপন করিতে থাকিলেন—স্বয়ং ভগবান স্ত্রীরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরণী হইয়াছেন—ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে নিত্য বৃন্দাবনের বিকাশ হইতেছে। এখন আবার তাঁহার এই ভাবলোক ত্যাগ করিয়া মায়ার রচিত সংসারে গিয়া নিজেকে কর্ম্মের স্রোতের ভিতর ডুবাইয়া দিতে হইবে—নৈষ্কর্ম্যের কর্ম্ম—মাথা নেই তার মাথা ব্যথা! একটা মধুর জীবন ত্যাগ করতঃ কৌপীনমাত্রৈকসম্বল রামতা সাধুর বৈদেশিক শিক্ষাদৃপ্ত বাঙ্গালীর মধ্যে গুরুগিরি যেন একটী অসম্ভব কথা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তখন আবার স্বদেশী যুগের প্রারম্ভ—দেশে নানা বিপ্লব—বিদেশী বর্জ্জন—বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ, স্থানে স্থানে লাঠিখেলা, বাগ্মীদের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় দেশ টলমল। এ ভাবের ভিতর সন্ন্যাসীর গীতি কে শুনিবে? সুতরাং শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার ঘরণী লইয়া ঘর করিতে লাগিলেন। একদিন পুনরায় প্রেমময়ীর সহিত গুরুগিরির কথা হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—গুরুগিরি করিতে গেলে তোমাকেও আর এ ভাবে পাইব না। গৃহীর আশ্রয়ে থাকিতে হইবে—সন্দেহ-সংশয়ের দাস তারা—কত সঙ্কোচের সহিত সন্ন্যাসীর তাহাদের সহিত চলিতে হইবে—মনটাও ঝালাপালা হইয়া যাইবে।

ঠাকুরাণী। তোমার সমস্ত সতী ও সাধ্বী পতিব্রতা ধার্ম্মিকা শিষ্যার ভিতরে তুমি আমাকে অনুভব করিবে। তাহারা আমারই মত তোমাকে ভালবাসিবে।

কিন্তু তবুও শ্রীশ্রীঠাকুর নড়িলেন না। পূর্ব্ববৎ দিনের বেলায় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় কাটিত—ঠাকুরাণীর সহিত প্রেমালাপনে নিশাতিবাহিত হইত। একদা রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রেমময়ীকে বুকের উপর লইয়া শুইয়া থাকিবেন বলিয়া হস্ত সম্প্রসারণ করিয়া পুনরায় সঙ্কোচ বোধ করিলেন। তাঁহার মনে হইল কি জানি যদি বুকের উপর লইয়া শুইয়া থাকিলে বাসনা জাগে—যদি গোপীগণের ন্যায় পুনরায় আবদ্ধ হন? হায়! হায়! ভগবান যদি প্রেমময়ীর রূপ ধারণ করিয়া স্ত্রীভাবে না আসিয়া একটী ছোট মেয়ে ভাবে আসিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে বুকে লইয়া শুইয়া থাকিতেন—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কুটীরের বাহিরে গিয়া পুনরায় ঘরের ভিতরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন প্রেমময়ী নাই—তৎপরিবর্ত্তে মাচার উপরে সাত বৎসরের একটি ফুটফুটে মেয়ে শুইয়া আছে ও শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে তাকাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝিলেন যে তাঁহারই ইচ্ছায় প্রেমময়ী এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তাঁহাকে কত আদর করিলেন ও বুকে করিয়া শুইয়া রহিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কিছুক্ষণ পরেই ছোট মেয়েটী বুকের উপর ক্রমেই বড় হইতে থাকিল। বড় হইতে হইতে মেয়েটী ক্রমে ত্রয়োদশী হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর এই আশ্চর্য্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতে থাকিলেন।

নিরুপাধি ভাবের প্রতিষ্ঠা—ক্রমশঃ তাঁহার অঙ্গাবয়ব সমস্তই পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ত্রয়োদশী ক্রমে চতুর্দ্দশী অবশেষে পঞ্চদশী হইল—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্রমেই স্থূল ও ভারী হইতে লাগিল। ক্রমে আরও বড় হইয়া ষোড়শী, সপ্তদশী হইলে দেখিলেন যে বালিকা তাঁহার স্ত্রী সুধাংশুবালার রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রেমময়ীর খেলা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রেমময়ীও হাসিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বুকের উপর প্রেমময়ীর দৈহিক শ্রী গঠন ও যৌবন অতি দ্রুত পরিণতি লাভ করায় ধীরে ধীরে যৌবনটা চলিয়া গেল। ক্রমশঃ প্রেমময়ীর বয়স ৩০।৩৫, চুল দুই একটা পাকিয়াছে। প্রেমময়ীর বার্দ্ধক্যের দিকে অতি দ্রুত পরিণতি দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ক্রমেই গম্ভীর হইতে থাকিলেন। চলচ্চিত্রের ন্যায় তাঁহার পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিণতি দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরেরও সঙ্গে সঙ্গে মানসিক গুরুতর পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। ক্রমে ৪০।৪২ বৎসর বয়স্কার ন্যায় হওয়ায় তাঁহার আকৃতি বদলাইয়া গিয়া এমন একটি রূপ ধারণ করিল যে, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে বুকের উপর হইতে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া মঞ্চের উপর হইতে উঠিয়া কুটীরের বাহিরে আসিলেন। কারণ শেষোক্ত মূর্ত্তিটি শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্ব্বাশ্রমের গর্ভধারিণী জননী মাণিকসুন্দরী দেবী। তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

মা—মেয়ে—স্ত্রী স্বরূপতঃ একই, কেবলমাত্র দেহের বিভিন্নতা মাত্র। বড় বিস্ময়কর—বড় ভয়ানক কঠোর নির্ম্মম অদ্বিতীয় সত্য—তিনে এক—একে তিন।

নির্গুণ ভাবের প্রতিষ্ঠা—শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিচ্ছিন্ন ভাবের মূলে কুঠারাঘাত হইল। মা-মেয়ে-স্ত্রীর ভিন্নতা বোধের মূলোৎপাটিত হইয়া এক মিশ্রিত নিরুপাধি নির্গুণ ভাব—এই ঘটনা হইতে তাঁহার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইল। মা-মেয়ে-স্ত্রী প্রভৃতি নিম্নস্তরের পরিচ্ছিন্ন ভাব তাঁহার নিকট হইতে চিরতরে নির্ব্বাসিত হওয়ায় সেই সব রূপ-বিকাশও অদৃশ্য হইল। রূপের বা আকৃতির বৈচিত্র্য অরূপে অথবা নিরাকার নির্গুণ ভাবে লয় হইল।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত



শ্রীশ্রীনিগমানন্দ পরমহংস

আবির্ভাব
ঝুলনপূর্ণিমা
১২৮৭

তিরোভাব
১৩ই অগ্রহায়ণ
১৩৪২

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-স্মৃতি

দ্বিতীয় ভাগ

১

বিভিন্ন সাধনার দ্বারা মাত্র তিন বৎসরের ভিতর শ্রীশ্রীঠাকুরের ভিতর নিখিল তত্ত্বরাশি প্রকাশিত হইয়া গেল। তন্ত্রোক্ত সাধনপদ্ধতিতে যখন জগজ্জননীকে স্ত্রীরূপে সাক্ষাৎ পাইলেন তখন তিনি নিজেকে অসীম শক্তিশালী ও শিবসমুজ্জ্বল বলিয়া মনে করিয়া প্রথমতঃ ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সম্মুখে যে জগৎটা ভাসিয়া উঠিয়াছিল, সেটী শক্তিলীলাপ্রসূত জগৎ। তখন মনে হইয়াছিল যাহা জানিবার সব জানিয়া ফেলিয়াছেন—অতঃপর আর কিছু জানিবার নাই। তারপর অতি অল্প দিনেব ভিতর শ্রীশ্রীঠাকুরের ভিতর ঐ তন্ত্রোক্ত শক্তিবাদের অপূর্ণত্ব বোধ জাগিয়া যাওয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া বেদান্তবিচার করিতে থাকিলেন।

বেদান্তবিচারে এক মহা অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হইল। তন্ত্রের ভিতর দিয়া যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন প্রথমতঃ তাহাতে মিথ্যাত্ববোধ আসিয়া গেল। তন্ত্র একমাত্র মায়াশক্তিকে লইয়া বিচার করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে। কিন্তু বেদান্তমতে মায়া মিথ্যা—প্রহেলিকা। যাহা কিছু স্থূল বা দৃশ্যমান, সমস্তই মিথ্যা বা স্বপ্নরচনাবৎ—ইহার কোন সত্তা নাই। বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—সেই অধিষ্ঠান বা

আধাররূপ ব্রহ্মে রূপ কল্পিত হইয়া থাকে। সুতরাং অধিষ্ঠানের সত্তা ব্যতীত মায়ার স্বতন্ত্র সত্তার একান্ত অভাব। অতএব প্রাথমিক বিচারে তন্ত্রের শক্তিবাদ ভাসিয়া গেল। তখন তাঁহার মনে হইল—তাইত! তবে যাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন তিনি কি স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা? সব প্রহেলিকা! প্রকৃত পন্থা—প্রকৃত সাধনা—প্রকৃত তত্ত্ব তবে কি এই বেদান্ত? তন্ত্র মিথ্যা—উহার সাধনা কি তবে মিথ্যার সাধনা?

কিন্তু যখন যোগসাধনার দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হইল—তখন তাঁহার সম্মুখে এক দিব্য অনন্ত অন্তর্জগৎ ভাসিয়া উঠিল। দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর এক দিব্য অন্তর্জগৎ—এত বৈচিত্র্যময় যে উহার সম্বন্ধেও তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হইল। তখনও তন্ত্রের সম্বন্ধে অসত্য ধারণা তাঁহার তিরোহিত হইল না। যখন নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হইল—যখন প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইল, যখন এই সৃষ্টিলীলারূপ বিরাট জগতের স্বরূপ ও তদতিরিক্ত জগতের স্বরূপ জানিলেন, যখন ব্রহ্মজ্ঞ হইলেন, তখনই মাত্র তিনি তন্ত্রের সহিত জ্ঞানশাস্ত্রের সামঞ্জস্য সূত্র দেখিতে পাইলেন। তখন উপলব্ধি করিলেন যে শক্তিতে অধিষ্ঠানভূত সত্তারূপে ব্রহ্মের উপাসনা হয়। এইভাবে শক্তির স্বরূপ প্রতিপাদিত হইলে কোন বিরোধ হইতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম-উপাসনা-স্থলে কেবল ব্রহ্ম গ্রহণ না করিয়া যেমন শক্তির ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তার অভাব-প্রযুক্ত শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম গ্রহণ করিতে হইবে, সেইরূপ শক্তির আরাধনা করিলে পরব্রহ্মসত্তাবিশিষ্ট শক্তির উপাসনা করিতে হইবে। ফল কথা এই যে যেমন নিরুপাধিক বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা সম্ভবে না, সেইরূপ ব্রহ্মকে ছাড়িয়া কেবল মহাশক্তির উপাসনাও সম্ভবে না। অধিকন্তু শক্তির আশ্রয় নাই—তিনি ব্রহ্মেরই আশ্রিতা। তাই তান্ত্রিকের মহাশক্তি শবরূপ মহাদেবের "হৃদয়োপরি সংস্থিতা"।

এতদ্ব্যতীত তিনি যোগের সহিতও তন্ত্রের মিলন দেখিতে পাইলেন। প্রকৃতি-পুরুষ উভয়াত্মক ব্রহ্মই তন্ত্রের শিবশক্তি। তিনি যোগের ও বেদান্তের পরমাত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্বে সম্যক্ মিলন দেখিতে পাইলেন। তিন প্রকার বিভিন্ন শাস্ত্রোক্ত সাধনপদ্ধতিগুলি বিভিন্ন অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রকাশিত করিলেও সব শাস্ত্রই মূল তত্ত্বের অবিরোধী। পরে যখন ভাবলোকের সন্ধান পাইলেন, তখন অন্য জগৎ তাঁহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। দেখিলেন তন্ত্র যেরূপ মায়াশক্তি লইয়া বিচার করিয়াছে, ভক্তিশাস্ত্র তদ্রূপ হ্লাদিনী শক্তির অনুশীলন করিয়াছে। সমস্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াও যদি এই ভাবতত্ত্ব তাঁহাতে প্রকাশিত না হইত—তবে তাঁহার জন্মই বৃথা মনে হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ অনুধাবন করিলেন যে তন্ত্রের শক্তিবাদের সহিত ভক্তিশাস্ত্রের ভাবতত্ত্বের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যোগের পরমাত্মতত্ত্ব ও বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানভূমির দুইটী বিভিন্ন দিক্ লইয়া অনুশীলন করিয়াছে। তবে ভাবভূমির ভিতর দিয়া ইচ্ছা হইলে জ্ঞানভূমিতে বিচরণ করা যাইত, কিন্তু ভগবান বিশেষ বিশেষ কার্য্য করাইয়া লইবার জন্য তাঁহাকে নানা পথে নানা ঘাটে ঘুরাইয়া লইয়া আসিয়াছেন একটী মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য। যাহা হউক, উপরোক্ত তত্ত্বগুলি যেভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভিতর প্রকাশ হইয়াছিল তৎসমস্তই তিনি তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে একাদিক্রমে তিনমাস ব্যাপী শ্রম স্বীকার করিয়া একটা জ্ঞানচক্র অঙ্কিত করিয়া ঐ তত্ত্বগুলির বাহ্যিক রূপক মূর্ত্তি দিয়াছিলেন এবং ঐ তত্ত্বের ভাবব্যঞ্জক "নিগম-সূত্র" নাম দিয়া কতকগুলি সূত্র লিখিয়াছিলেন কিন্তু তাহা নানা কার্য্যের ভিতর আর সম্পূর্ণ হয় নাই। ঐ জ্ঞানচক্রের একটী প্রতিলিপি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হইল।

যাহা হউক এই নিখিল তত্ত্বরাশির বিকাশের পর মাত্র ২৭ বৎসর বয়স্ক প্রবুদ্ধ সন্ন্যাসীর ভিতর এমন এক অসীম কর্ম্মের জীবন্ত প্রেরণা

আসিল যে বিল্বমূলের ক্ষুদ্র কুটীরের গণ্ডী তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। ভাববিবশ প্রেমিকের ভাবের গতি অজ্ঞান জীবমুখী হওয়ায় তাঁহার পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে লোকালয়ে নামিবার সময় আসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি বেশ উপলব্ধি করিতে থাকিলেন যে এখন হইতে তাঁহার দেহ এবং মন অন্য এক বিরাট ইচ্ছায় যন্ত্রবৎ চালিত হইবে।

এদিকে পণ্ডিতজীর দেহের আবরণের ভিতর যে একজন মস্ত সাধু ছদ্মবেশে লুক্কায়িত আছে, বহুদূর হইতে ইহার সন্ধান পাইয়া অধ্যাত্ম-তত্ত্বলিপ্সু লোকজন এই জনবিরল বনভূমিতে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুরও বুঝিলেন যে এখন তাঁহার লুকাইয়া থাকা আর চলিবে না, লোকালয়ে বাহির হইবার সময় হইয়াছে। অতঃপর একদা সত্যই তিনি পলাশডাঙ্গা-নিবাসী কতিপয় ভদ্রলোকের বিশেষ আগ্রহে গারোপর্ব্বতের নির্জ্জন আবাস ত্যাগ করিয়া কয়েকদিনের জন্য পলাশডাঙ্গায় আগমন করিলেন।

পলাশডাঙ্গার অধিবাসীবৃন্দ তাঁহাকে পাইয়া উৎসবে মত্ত হইল ও তাঁহার আগমন উপলক্ষ্য করিয়া সংকীর্ত্তন ইত্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রীতিবর্দ্ধনের প্রয়াস পাইল। ফলে শ্রীশ্রীঠাকুর সমাধিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। এটা সত্যসত্যই সমাধি, অথবা তাহার ভাণ ইহার স্বরূপ জানিবার উদ্দেশ্যে গাড়াপোতা গ্রামের পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী নামে জনৈক হিতাহিতজ্ঞানবিবর্জ্জিত যুবক একখানি টীকায় আগুন ধরাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দক্ষিণ জানুর সন্ধিস্থলে রাখিয়া দিল।

প্রজ্জ্বলিত টীকা দ্বারা সমাধি পরীক্ষা—যখন সে শ্রীশ্রীঠাকুরের জানুর উপরে প্রজ্জ্বলিত টীকাখানি রাখিয়া দিল তখন অনেকে উহা যেন দেখিয়াও দেখিল না এইরূপ ভাণ করিল। যাহা হউক শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় অতীত হইল। এই দীর্ঘ সময়ের ভিতর শ্রীশ্রীঠাকুরের জানুর মাংস পুড়িয়া টীকাখানি ভিতরে বসিয়া গেল।

সমাধি ভঙ্গ হইতেই তিনি ঐ স্থানে বেদনা অনুভব করিতে থাকিলেন এবং দেখিলেন যে ঐ স্থানে একখানি টীকা পুড়িয়া ছাই হইয়া রহিয়াছে। এই ঘটনায় স্থানীয় লোকজন বিশেষ ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইয়া পড়িল। হাওয়া করিয়া ছাই উড়াইয়া দেওয়া হইল ও জল দিয়া ক্ষত পরিষ্কৃত করা হইল।

এই ঘটনায় দু'টী ফল লক্ষিত হইল—প্রথম ফল অবিশ্বাসী সমাজে সাধুর সমাধির প্রকৃত স্বরূপ জনসাধারণে প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় ফল যাহা হইল তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর ; সমাধি ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চাননের মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া পড়িল। প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিবার জন্য স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ শুধু দুঃখিত ছিলেন, এখন পঞ্চাননের অকস্মাৎ মস্তিষ্কবিকৃতির জন্য গ্রামবাসী বিশেষতঃ যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ঘটনার সহিত অল্পবিস্তর জড়িত তাহারা সবাই ভীত হইয়া পড়িল। ক্রমেই পঞ্চাননের উন্মাদ-লক্ষণ অত্যন্ত গুরুতরভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তখন পঞ্চাননের পক্ষ হইতে সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিল যাহাতে চঞ্চলমতি যুবককে এই গর্হিত কর্ম্মের জন্য তিনি ক্ষমা করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাদিগকে জানাইলেন যে এ বিষয়ে তাঁহার কোনই হাত নাই। উৎকট পাপের হাতে হাতেই উৎকট ফল সদ্য সদ্য প্রদানের যিনি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাঁহারই ইচ্ছা হইলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে। যাহা হউক অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাদের আকুলতা দর্শনে বলিলেন যে তাহাকে নিরাময় করা সময়সাপেক্ষ। তবে পঞ্চাননকে তাঁহার সঙ্গে গারোহিলে যাইতে হইবে। অবশেষে তাহাই স্থির হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত পঞ্চাননকে গারোহিলে পাঠান হইল। তথায় ৭।৮ দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত অবস্থান করিবার পরে তাহার মস্তিষ্কবিকৃতি বহুল পরিমাণে উপশম হইলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে বাড়ীতে পাঠাইয়া

দিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই অগ্নিদগ্ধ চক্রাকার চিহ্ন শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহে মিলাইয়া যায় নাই।

গৃহস্থের সহিত প্রথম সম্মিলনে 'পঞ্চানন অ্যাণ্ড কোম্পানী'র নিকট হইতে অবিশ্বাসের যে প্রকার নমুনা পাইলেন সেইরূপ অবিশ্বাসী সমাজে গিয়া আগাছার আবাদ কাটিয়া বিশ্বাসের চাষ করিতে হইবে। সে যে বড় কঠিন ঠাঁই! অতএব গুরুগিরির অস্ত্রাদি সঙ্গে লইয়া না গেলে কার্য্যারম্ভ করার নানাপ্রকার বিপত্তি উপস্থিত হইবে। সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে এবং তাঁহার মতামতের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিতে না পারে এজন্য কতকগুলি সাধনতত্ত্বের সমাবেশে যদি কোন পুস্তক প্রকাশ করা যায় তবে তাঁহার পন্থা অধিকতর সুগম হইতে পারে মনে করিয়া পরমযোগী সুমেরদাসজীর নিকট হইতে যে সমস্ত সাধনরহস্য অবগত হইয়া নিজে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তন্মধ্য হইতে কতকগুলি সহজ লয়যোগসাধন সাধারণে প্রকাশ করিবার মানসে পুস্তক প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই পুস্তক লেখা শেষ হইয়া গেলেই তিনি লোকালয়ে গমন করিবেন স্থির করিলেন। যদিও তৎকালে স্বদেশী যুগের প্রারম্ভহেতু দেশের আবহাওয়া সাময়িকভাবে কিছু আধ্যাত্মিকসম্পর্কশূন্য হইয়া আসিতেছিল—ধর্ম্মের কথা তখন একটা অবান্তর বিষয় হইয়া আসিতেছিল—যুবকদের হৃদয়ের ভিতর বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণ একমাত্র পণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সাধুর গীতি শুনিবার মত মন ও সময় তখন কাহারও ছিল না—কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে—আর এক শক্তির যে ধর্ম্মজগৎ লইয়াই ব্যবসায়। সে ব্যবসায়ে বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং ব্যবসায়ী। তিনি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পুস্তক লেখা শেষ হইলেই এ স্থান ছাড়িয়া যাইতে হইবে। আর হয়ত বাহ্যতঃ এ জীবনে এ স্থানবাসীর সহিত দেখা হইবে না। সীতারাম, মদন প্রভৃতি যে এতদিন তাঁহাকে অকৃত্রিমভাবে সেবা-

যত্ন করিয়াছে, কিছু দিয়া যদি তাহাদের প্রত্যুপকার করিতে পারিতেন! কিন্তু তিনি যে নিঃসম্বল সন্ন্যাসী। সুতরাং তাহাদিগকে দিবার মত যে কিছু নাই। একদা তাহাদিগকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন "আমি শীঘ্রই এস্থান হ'তে চলে যাব। আমার এমন কিছু নাই যে তোদের দিয়ে যাই।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের যাওয়ার কথা শুনিয়া তাহাদের চোখে জল আসিল। "পণ্ডিতজী" যে এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন তাহারা কখনও ইহা কল্পনা করিতে পারে নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—একটা জিনিস তোদের দিতে পারি যদি নিস্।

কাঁদিতে কাঁদিতে তাহারা বলিল—যা' দিবি তাই নিব।

শ্রীশ্রীঠাকুর। মন্ত্র দিব—নিবি? এতে কিন্তু পয়সা কড়ি হবে না —এতে তোদের পরকালের অনেক উপকার হ'বে—আর মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে না।

তাহারা উল্লসিত হইয়া বলিল—এ ত সব চেয়ে ভাল রে।

অতঃপর দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর মদন ও সীতারামকে শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই মদনের ভিতর মন্ত্রের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। রাত্রে স্বপ্নে অসভ্য হাজংএর মুখে কালীর কর্পূরাদি স্তোত্র পাঠ হইতে লাগিল। স্বপ্নে এইরূপ কঠিন ও তাহাদের বুদ্ধির অগম্য ভাষায় স্তোত্র পাঠ হওয়ায় গৃহের অন্যান্য হাজংগণ ছুটিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিয়া বলিল—"মদনকে ভূতে পাইয়াছে। সে গতরাত্রে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কি যে হিজিবিজি বলিতেছিল তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। আজও উহা কিছুতেই যাইতেছে না।" পর রাত্রে পুনরায় স্তোত্র আরম্ভ হইবামাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর গিয়া শুনিলেন যে দীক্ষার শক্তিতে সাময়িকভাবে তাহার হাজংত্ব লোপ পাইয়া বহু বহু পূর্ব্বজন্মের হিন্দুত্বের সংস্কার জাগিয়া উঠিয়াছে। বাটীর অন্যান্য সকলে

ভয় পাইবে বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাতে শক্তির স্ফুরণ বন্ধ করিয়া দিলেন। পরদিন মদন ও অপর কয়েকজন হাজং শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিল। এইরূপে তাহারা প্রায় প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে বা অবসর সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিয়া বসিত, তাঁহার কাজকর্ম্ম করিয়া দিত ও গল্প-গুজব করিত। একদিন মদন আসিয়া বসিলে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"মদন, একটু গাঁজা তৈরী কর।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের থলে ঝাড়িয়া মদন গাঁজা পাইল না—বলিল "গাঁজা নাই।" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—যেখান থেকে হোক গাঁজা চাইই। এদিক ওদিক খুঁজে দেখ যদি পাও।

মদন ও সীতারাম বিল্ববৃক্ষের নিম্নে গাঁজা অন্বেষণ করিতে থাকিল—অবশেষে শুষ্ক পাতার নীচে এক ছড়া গাঁজা পাইয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট দৌড়াইয়া গিয়া দেখাইয়া বলিল "সেরে রাখিছিলি বুঝি ?"

বিশ্বাসই সর্ব্ব সাধনার মূল—মদনের কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর গম্ভীরভাবে বলিলেন—মদন! আমাকে যদি বিশ্বাস কর, আমার কথায় যদি আস্থা রাখ, গাঁজা ত দূরের কথা, এ জগতে যা কিছু আছে সব পেতে পার।

মদন। বিশ্বাস করলে বাঘের ভয় যাবে ?

ঠাকুর। যাবে। নিশ্চয়ই যাবে। এই পর্ব্বতে তোমরা বাঘের ভয়ে অনবরত ভুজালী লইয়া চলাফেরা কর। যদি আমার কথায় বিশ্বাস কর তবে বাঘও তোমাকে ভয় করিয়া চলিবে। বাঘ তোমাকে খাবে না বরং তুমিই বাঘের লেজ ধরে টেনে হেঁচড়ে আন্‌তে পারবে। কিন্তু বিশ্বাস চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাক্য পরীক্ষার ইচ্ছা মদনের মনে বড়ই বলবতী হইয়া উঠিল। সে সীতারাম প্রভৃতি পাচ সাত জন সঙ্গী লইয়া ভুজালী

ফেলিয়া দিয়া সমস্বরে "জয়গুরু" "জয়গুরু" করিতে করিতে পর্ব্বতের বিভিন্ন স্থানে বাঘ অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু যে সব স্থানে বাঘের থাকিবার সম্ভাবনা সেখানে বাঘের সন্ধান মিলিল না। বেলা তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, হঠাৎ একটা ঝরণার নিকট একটী অতি ভয়ঙ্কর আকৃতির ব্যাঘ্র দর্শনে হাজংগণ ভীত হইয়া পড়িল। তখন তাহারা পরস্পরের হাত ধরিয়া ব্যাঘ্রের সন্নিকটে অগ্রসর হইতে থাকিল। ব্যাঘ্রের সহিত হাজংগণের ব্যবধান যখন অনুমান মাত্র ৭ হাত পরিমাণ নিম্নভূমি—তখন সে তাহাদিগের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া ভীষণ গর্জ্জনে সেই বনভূমি কম্পিত করিয়া প্রস্থান করিল। তাহার ইচ্ছা হইলে নিম্নে লম্ফপ্রদানে একজন হাজংকে লইয়া সে স্বচ্ছন্দে প্রস্থান করিতে পারিত।

হাজংগণ ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের ব্যাঘ্র অভিযানের বিষয় সমস্তই শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"তোমরা যদি গুরুর বাক্য পরীক্ষা করিতে না গিয়া আমার বাক্য প্রাণে প্রাণে একান্ত বিশ্বাস করিতে তবে তোমাদের হৃদয় টলিয়া যাইত না। আর ৭ হাত উপরে উঠিয়া ঐ বাঘের লেজ ধরিয়া টানিয়া আনিতে পারিতে। বাঘ কখনই মানুষকে খায় না—কর্ম্মই মানুষকে খায়। মানুষের চেয়ে কোন জীবজন্তুই অধিকতর শক্তি ধরে না।, মানুষ সে শক্তি জাগাইতে বা রাখিতে পারে না। বাঘে ও মানুষে একই বস্তু রহিয়াছে সুতরাং গুরুবাক্যে বিশ্বাসী হইয়া তোমরা কখনও বাঘকে ভয় করিবে না। সাধারণ ভাবে দেখিলে দেখা যায় যে বাঘই মানুষকে খায় কিন্তু ইহার প্রধান হেতু এই যে বাঘে মানুষ খায় এই সংস্কারটি মানুষকে দুর্বল করিয়া ফেলে। বাঘের ব্রহ্মচর্য্য হেতু তাহাতে সম্মোহিনী শক্তি জাগে এবং ব্রহ্মচর্য্যহীন দুর্ব্বল মানুষের উপর তাহাদের ঐ শক্তি চোখের ভিতর দিয়া ক্রিয়া করিয়া মানুষকে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া ফেলে। বাঘ মানুষের

শারীরিক বল অপেক্ষা বেশী বল ধারণ করে না। গুরুতে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও ও সেই বিশ্বাসবলে চলাফেরা কর, তবে বাঘ তোমাদের ইচ্ছায় চলাফেরা করিবে। যে বিশ্বাসী—দুনিয়া তাহার পদতলে।" মদন শ্রবণ করিয়া বলিল—"তাই করিব। এমন কথা ত আর কেউ বলেনি।" সেই দিন হইতে মদন প্রভৃতি ভুজালী ফেলিয়া দিয়া "জয়গুরু" নাম রূপ অস্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিল।

অতঃপর জনসাধারণে প্রকাশোদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর যোগসাধনরহস্য সম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রবন্ধ ১৭ দিনের মধ্যেই লিখিয়া শেষ করিলেন। পুস্তকের নাম দিলেন "যোগীগুরু"। কিন্তু পুস্তক মুদ্রণের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহার এক কপর্দ্দকও যে তখন তাঁহার নাই সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে তখনই অর্থের চিন্তা আসিল। অন্ততঃ প্রথমতঃ একশত টাকার প্রয়োজন। ঐ অর্থের সাহায্য তাঁহাকে কে করিবে? অর্থ খুব একটা মস্ত জিনিস—উহা যে দুনিয়াদারীর ছাড়পত্র। শ্রীশ্রীঠাকুরকে টাকার জন্য চিন্তা করিতে দেখিয়া সীতারামের কাকা অযাচিত ভাবে একশত টাকা দিতে চাহিল ও সত্বরই তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিবে বলিল। তাহার পক্ষে একশত টাকা দান করা একটি রাজার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার ন্যায়। দরিদ্র পাহাড়িয়ার টাকা যে বুকের রক্ত! কৌপীনমাত্রৈকসম্বল সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার টাকার উপর ভরসা না করিয়া কয়েকদিন পরে কতকগুলি কাগজ বগলে লইয়া একান্তানুগত হাজংদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গারো পাহাড় হইতে কর্ম্মকোলাহলময় লোকালয়ে অবতরণ করিলেন।

২

ময়মনসিংহ জেলায় বেনিয়ারচর নামে একটী স্থান আছে। এই স্থানে কংশ নদের তীরদেশে একটী শ্মশানকালীর মন্দির আছে। এই মন্দিরের পার্শ্বদেশ দিয়া সাধারণের যাতায়াতের পথ। স্থানীয় লোকজন যাতায়াতের সময় একদা দেখিতে পাইল মায়ের মন্দিরের দ্বারদেশে বসিয়া একজন তরুণ সন্ন্যাসী—কটীদেশ কৌপীন আঁটা—তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণের ভিতর দিয়া গোলাপী রঙের প্রাচুর্য্যহেতু তরুণ সূর্য্যের অরুণ আভা নির্গত হইতেছে—সবে মাত্র গোঁপের রেখা মুখে দেখা দিয়াছে—তৈলবিহীনে ও পারিপাট্যাভাবে মস্তকের কেশগুলি রুক্ষ ও কটা হইয়া একটী ঝাপটা হইয়া রহিয়াছে। চক্ষুর শ্বেতাংশ ঈষৎ অরুণ—দৃষ্টি স্থির ও উদাস, যেন এ জগতের কোন কিছুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই। সম্মুখে একটা দীর্ঘ চিম্‌টা এবং ছেঁড়া ও ময়লা ন্যাকড়া জড়ান একটী কাগজের তাড়া। জনপদে এরূপ সন্ন্যাসী সচরাচর পশ্চিম হইতে দলে দলে কতই না আহারান্বেষণে আসিয়া থাকে, কে কাহার সংবাদ রাখে? পল্লীগ্রামে সরল বিশ্বাসী লোকের নিকট একজন জটাজূটমণ্ডিত ভস্মমাখা কৃত্রিম সন্ন্যাসীর যখন এখনও অনেক খাতির আছে তখন একজন প্রকৃত সন্ন্যাসীর যে পল্লীতে প্রথম প্রথম সম্মান হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? একজন দুইজন করিয়া ক্রমশঃ লোক জমায়েত হইতে লাগিল। যে সাহস সংগ্রহ করিল সে প্রণাম করিল; যে তাহা পারিল না, দূরে দাঁড়াইয়া রহিল বা বসিয়া পড়িল। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অগ্রসর হইল না—সবারই ইচ্ছা কিছু জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু এরূপ তেজোদীপ্ত সন্ন্যাসীর নিকট কাহারও কোন কথা কহিবার সাহস হইল না। বেলা যত বাড়িতে লাগিল ততই লোকমুখে প্রচার হইয়া পড়িল যে এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব সন্ন্যাসী এই কালীবাড়ীতে আস্তানা করিয়াছেন।

কালীবাড়ীর নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে জনৈক মোদক বাস করিত। তাহার পত্নী দারুণ শূলবেদনায় প্রায় ৫।৬ বৎসর শয্যাশায়ী ছিল। শূলবেদনার যন্ত্রণা যে কি তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন ঐ যন্ত্রণার স্বরূপ কেহ বুঝিতে পারিবে না। মোদকপত্নী তদবস্থায় শুনিল যে কালীবাড়ীতে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। তাহার যে রোগ তাহা কোনপ্রকার ঔষধে এ পর্য্যন্ত আরোগ্য হয় নাই। তারপর আবার বাঙ্গালী স্ত্রীর অসুখ কোন অবস্থায়ই গুরুতর বলিয়া তাহার স্বামীর মনে হয় না। এমত ক্ষেত্রে স্ত্রীকে এক প্রকার জঞ্জাল বলিয়া মোদকের মনে হইতে থাকিল। ঔষধপত্রে পয়সা খরচ হয় অথচ কোন ফল হয় না। সুতরাং একটা দৈব ঔষধ যোগাড় করিতে অনেক দিন হইতেই তাহার স্ত্রীর প্রবল ইচ্ছা। বর্ত্তমানে যখন সে শুনিল যে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন তখনই সে তাহার স্বামীকে অনেক অনুনয় করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট পাঠাইয়া দিল। সন্ন্যাসীর নিকট গিয়া সে-ই সর্ব্বপ্রথম তাহার স্ত্রীর রোগ নিরাময় করিবার জন্য ধরিয়া বসিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন গৃহত্যাগ করিয়া বাহির হইয়াছিলেন, তখন এই সব রোগপ্রতিকারের জন্য মন্ত্র ও কৌশলাদি বৃন্দাবনে শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। ভাবিলেন এই সুযোগে ঐ মন্ত্রের সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবেন; যদি সারে তবে একজনের উপকার হইবে, আর না সারে, তাহাতেই বা কি আসে যায়? অগত্যা শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন যে তিনি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন, ফলাফল ভগবানের হাতে। তিনি মোদকের স্ত্রীকে কালীবাড়ী লইয়া আসিতে বলিলেন ও একটা নূতন হাঁড়ি ও সরিষার তৈল এক সের আনিতে বলিলেন।

মোদকের স্ত্রীকে আরোগ্য করা একটা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার কারণ এ পর্য্যন্ত কিছুতেই কিছু ফল হয় নাই। তাহার রোগযন্ত্রণার কথা ঐ অঞ্চলে না জানিত এরূপ লোক ছিল না। তাহার রোগ আরোগ্য ব্যাপার

দেখিবার জন্য বহুলোক তথায় জমায়েত হইল। অবশেষে নৌকা করিয়া উক্ত মোদক তাহার পত্নীকে কালীবাড়ীতে লইয়া আসিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন আগুন জ্বালিয়া সরিষার তৈল হাঁড়িতে ঢালিতে বলিলেন। মোদক তাহাই করিল। জনতা উৎসুক হইয়া দেখিতে লাগিল। যখন তৈল হাঁড়িতে ফুটিতে লাগিল, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর জনতার বিস্ময় বর্দ্ধন করিয়া ঐ তপ্ত তৈল মন্ত্রপূত করিয়া নিজের বামপদ উহাতে ডুবাইয়া দিলেন এবং ঐ বামপদের গোড়ালী রোগিণীর পেটে স্পর্শ করা মাত্র তাহার বেদনা কমিতে থাকিল। অবশেষে শূলবেদনা একেবারে নিরাময় হইয়া সে সুস্থ শরীরে প্রফুল্লান্তঃকরণে হাসিতে হাসিতে গৃহে ফিরিয়া গেল।

কথাটা মুহূর্ত্তের মধ্যে মুখে মুখে রাষ্ট্র হইয়া গেল। অনেকে বিশ্বাস করিল—অনেকে বা করিল না। যাহারা বিশ্বাস করিল না এবং যাহারা করিল—তাহাদেরা মধ্যে স্থানে স্থানে প্রথমে মুখোমুখি, তারপর হাতাহাতি হইয়া গেল। তপ্ত তৈলে আবার হাত পা ডুবান যায়—শূলবেদনা আবার নিরাময় হয়—স্বয়ং শিবও ইহা করিতে পারেন না ইত্যাদি। অবশেষে অবিশ্বাসীর দল মোদক-পত্নীকে দেখিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিল। ক্রমেই কালীবাড়ীতে বেশ একটা মেলা বসিয়া গেল। কথাটা জমিদারের নায়েবের কর্ণগোচর হইল।

পাতিলদহ পরগণার বেনিয়াচরের নায়েব উমাচরণ মহাশয়* সন্ন্যাসীর কৃপায় মোদক-পত্নীর নিরাময়ের কথা শুনিলেন—নায়েবপত্নীও একথা শুনিলেন। নায়েবপত্নী নিঃসন্তান সুতরাং সাধু, সন্ন্যাসী ও দেব-দ্বিজে ভক্তিপরায়ণা। স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে অনেক বাদানুবাদের পর অবশেষে স্থির হইল যে তাঁহারা পরদিন প্রত্যূষেই সন্ন্যাসীকে দেখিতে যাইবেন। পরদিন প্রত্যূষে স্নানাদি করিয়া দেবালয়ে গমনকালে যেরূপ বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন তদ্রূপ বেশে নায়েব মহাশয় চলিলেন। পাইক

* শ্রীশ্রীঠাকুর 'যোগীগুরু' গ্রন্থে ইঁহাকে তহশীল-কর্মচারীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

বরকন্দাজ দু'একজন সঙ্গে লইলেন, কারণ তিনি যে একজন নায়েব তাহা ত সবার জানা চাই। যথাসময়ে তাঁহারা কালীবাড়ী আসিয়া সন্ন্যাসীর দর্শন পাইলেন এবং তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে লইবার জন্য অনেক অনুনয় করিতে লাগিলেন। অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাদের আকুলতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের বাটীতে আসিলেন। ইহার পর হইতেই ক্রমশঃ তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। ক্রমশঃ বহু লোক আসিতে থাকিল এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মাথায় রুক্ষ কেশের যে জটা ছিল, গৃহস্বামী ও ভক্তদের পরামর্শক্রমে বরকন্দাজ সন্তসিংহ তাহা ছাড়াইতে আরম্ভ করিল। জটার ভার বহনে অভ্যস্ত থাকায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ইহা ছাড়ানোর ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু গৃহস্বামী ও অন্যান্য ভক্তগণ তাঁহাকে এই যুক্তি দেখাইলেন যে ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজের ভিতর জ্ঞানের বীজ বপন করিতে হইলে সন্ন্যাসীর বেশেরও কিছুটা পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন। পাহাড়-পর্ব্বতের বনে জঙ্গলে চলাফেরা করিয়া লোকসমাজের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের কোন সংস্পর্শ ছিল না। সুতরাং ভক্তদের ইচ্ছাক্রমেই চিরুণীর সংস্পর্শে অবশেষে তাঁহার জটাগুলির বিন্যাসে পূর্ব্বাশ্রমের ন্যায় সুদীর্ঘ চাঁচর চিকুর মনোরম জটায় পরিণত হইল। সন্তসিংহই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার দৈহিক সেবাশুশ্রূষার ভার এমনকি জলখাবার তৈরী করিবার ভারও লইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন—"গৃহীদের ভেতরই সন্ন্যাসীদিগকে জ্ঞানের বীজ বপন কর্ত্তে হয়—তাদের ইচ্ছা অনুসারেই চল্‌তে হয়—ক্রমে ক্রমে তারা সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাস ধর্ম্মের উর্দ্ধে ঠাকুরভাবে পূজা করে—পরে তারাই আবার উল্টা দোষ চাপিয়ে বসে।" এইরূপ ভাবে সরকার-দম্পতির আগ্রহাতিশয্যে ও আতিথেয়তায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কিছুদিন তথায় কাটিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় হেমলতা দেবীর যেরূপ উৎসাহ, ক্রমে স্বামী উমাচরণেরও তদ্রূপ উৎসাহ দেখা গেল। তাঁহার প্রবল বিষয়াসক্তি ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। অন্যায় উপায়ে টাকা পয়সা লওয়া বন্ধ করিলেন। প্রজার উপর অর্থের চাপ দিয়া পীড়ন করা কমিয়া আসিতে লাগিল। অসৎ পথ হইতে সৎপথের মাঝে ব্যবধান যে সাগর-প্রমাণ তাহা তাঁহার মনে হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রভাবে স্বামী-স্ত্রীর মনে গভীর ভাবে সৎসংস্কার অঙ্কিত হইতে লাগিল এবং দিনে দিনে মানসিক গুরুতর পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। এদিকে আসাম প্রদেশের গারোহিলের হাজং বস্তির সীতারাম ও মদন তাহাদের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একশত টাকা লইয়া একদা ঈশানচন্দ্র শীল ও অন্য একজন তরুণ যুবককে সঙ্গে লইয়া বেনিয়ারচরে উমাচরণ সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল। এই গৃহত্যাগী তরুণ যুবকটীই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসিয়া প্রথম ব্রহ্মচারী সেবকরূপে থাকিয়া যায়। উত্তরকালে ইনিই স্বামী চিদানন্দ নামে পরিচিত হন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ নিম্নলিখিতরূপে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন—

"১৩১৩ সালের মাঘ মাসে গেদড়া হতে গারোহিলের সীতারাম, মদন, রামকৃষ্ণ, ঈশান শীল ও আমি একসঙ্গে রওনা হইলাম। তিনটার সময় কাছারীতে পৌছান গেল। শ্রীযুক্ত উমাচরণ সরকার মহাশয় আমাদের খুব আদরযত্ন করিলেন। তাঁর সৌজন্যে মনে হল—তহশীলদার মহাশয় ভাগ্যবান পুরুষ, তিনি সস্ত্রীক মহাপুরুষকে সেবায় ও শ্রদ্ধা-ভক্তিতে সন্তুষ্ট ক'রে এতদিন তাঁদের কাছে রাখতে পেরেছেন। ইঁহারাই প্রকৃত ভক্ত। আমরা স্নানাহার ক'রে বিশ্রাম করলাম। পরমহংসদেব বিকাল চারটার সময় ভিতরবাড়ী হতে বাহিরবাড়ী আসবেন জেনে আমরা তাঁর দর্শনের জন্য বাইরে অপেক্ষা করছিলাম। দূর হতে দেখতে

পাচ্ছি—তিনি আসছেন। গৈরিক বসন-পরিহিত আজানুলম্বিত ভুজ, তপঃক্লিষ্ট ছিপ্‌ছিপে চেহারা। তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় শরীরের রং। রক্ত-পদ্মের ন্যায় পা দু'খানি, ভ্রূ-যুগলের মধ্যভাগে কুম্‌কুমের ফোঁটা পরা—বাম হস্তে মাঝারি রকমের রুদ্রাক্ষের একটি মালা—গলায় ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের দু'লহর মালা শোভা পাচ্ছে। আনন্দময় সৌম্য মধুর পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিখানি, ভক্তগণের অভয়দাতা শ্রীশ্রীঠাকুর। ধীর ললিত গতিতে আগমন ক'রে তাঁর নির্দ্দিষ্ট আসনে বসলেন। সীতারাম, মদন······ভক্তগণ কয়েকদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যসঙ্গ লাভ করতঃ নিজ নিজ আলয়ে রওনা হইলেন। আমি একাকীই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে থেকে গেলাম।······আমি বিনীতভাবে বললাম—ঠাকুর, আমি ত বাড়ী ছেড়ে আপনার কাছেই চিরতরে থাকবার জন্য এসেছি। তিনি বলিলেন—বৈরাগ্যের পথ বড়ই কঠোর। তুমি ছেলেমানুষ, এ পথের কঠোরতা তুমি সহ্য করতে পারবে কি? শাস্ত্রে আছে—

মাতৃহা পিতৃহা স স্যাৎ স্ত্রীহন্তা ব্রহ্মঘাতকো।
অসন্তর্প্য চ পিত্রাদীন্ য গচ্ছেৎ ভিক্ষুকাশ্রমম্॥

······পরে বললেন—অন্তরে প্রকৃত বৈরাগ্য জাগলে কোন বাধা-বিঘ্নই গন্তব্যপথ আটকাতে পারে না।"

অতঃপর সেই তরুণ যুবক শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয়ে ব্রহ্মচারীরূপে থাকিয়া গেলেন। যোগীগুরু নামক পুস্তক ছাপাইবার জন্য নানা স্থান হইতে টাকা আসিতে লাগিল এবং মদন ও সীতারামের নিকট হইতেও একশত টাকা পাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উক্ত ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা রওনা হইলেন।*

* প্রকৃত ঘটনা—যোগীগুরু গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১২ সালে। ঐ গ্রন্থ পড়িয়াই তরুণ যুবক চণ্ডীচরণ (চিদানন্দ) ১৩১৩ সালের মাঘ মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণ দর্শন করেন। সুতরাং তাঁহাকে লইয়া যোগীগুরু পুস্তক ছাপাইবার জন্য শ্রীশ্রী-ঠাকুরের কলিকাতা যাওয়ার বিবরণ ভ্রমাত্মক।—প্রকাশক

বাঙ্গালীর গৃহে বৎসরান্তে দুর্গোৎসবে যেরূপ আনন্দহিল্লোল বহে, আবার বিজয়া দশমীতে দেবীর বিসর্জ্জন হইলে যেরূপ নিরানন্দ উপস্থিত হয়, শ্রীশ্রীঠাকুর নায়েব-আলয় পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলে পর তথায়ও তদ্রূপ অবস্থা হইল। লোকজনের কোলাহল নাই—চঞ্চলমতি বালক-বালিকাদের প্রসাদ পাইবার জন্য হুড়াহুড়ি নাই—গৃহে একটী মাছিও ভন্ ভন্ করে না, নিস্তব্ধ—যেন এ বাড়ীতে কাহারও প্রাণ নাই। হেমলতা দেবী গৃহের কোন কাজকর্ম্ম করিলেন না। কিসের কাজ, কার জন্য কাজ, কাজের শক্তি কোথায়? দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া কল্পনায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার স্মৃতি মানসপটে চলচ্চিত্রের মত দেখিতে থাকিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কলিকাতা যাওয়ার পর এইভাবে হেমলতা দেবীর দিন কাটিতে লাগিল।

এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতায় আসিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনের সম্মুখে কলিকাতা সরাই নামে যে হোটেলটী এখনও দেখা যায় তথায় উঠিয়া একটি ঘর ভাড়া লইলেন। ঘরটির পার্শ্বে পাকের স্থান ছিল। এইস্থানে পাকের ব্যবস্থা করিলেন। এইস্থানে অবস্থান করিয়া একটি প্রেস ঠিক করিয়া তথায় পুস্তক ছাপিতে দিলেন। মাসেকের ভিতর পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়া গেল। পুস্তক চারিদিকে প্রচারিত হওয়ায় নানাস্থান হইতে চিঠিপত্র ময়মনসিংহে উমাচরণ সরকারের বাসার ঠিকানায় আসিতে লাগিল। চারিদিক হইতে সাধনেচ্ছু লোকজনও তাঁহার সন্ধানে উমাচরণের বাসায় আসিতে লাগিল। গৌহাটির একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার যজ্ঞেশ্বরবাবুও যোগীগুরু পুস্তকের এক কপি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভ্রাম্যমান গুরুর সন্ধান পাইয়া ময়মনসিংহের ঠিকানায় মাঝে মাঝে পত্র দিতে থাকিলেন। পত্র যাহা সব আসিত সমস্তই হেমলতা দেবীর হাতে পড়িত; জরুরী পত্রগুলি মাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরকে কলিকাতায়

পাঠান হইত। যজ্ঞেশ্বরবাবুর স্ত্রী সরযূবালার পত্রগুলি হেমলতা দেবী খুব কৌতূহলের সহিত পাঠ করিতেন। সে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভালবাসিতে চায়, তাঁহাকে সেবা করিতে চায়, এরূপ আরও অনেক শিষ্যভক্ত আছে দেখিয়া হেমলতা দেবী একটু ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। গৌহাটি হইতে প্রাপ্ত স্বামী-স্ত্রীর পত্র যেরূপ হৃদয়ের ভাবব্যঞ্জক তাহা দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদের পত্র হইতেই কৌপীনমাত্রসম্বল সন্ন্যাসীর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিলেন; তথায় অবস্থানকালীন সেবার ত্রুটি বিচ্যুতি ও অসঙ্গতি এবং নির্ব্বিকল্প সমাধিকালীন চিত্রগুলি তাঁহাদের মনে উদিত হওয়ায় যেরূপ ব্যাকুলতা আনয়ন করে তদ্ভাবব্যঞ্জক পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইলেন। সরযূদেবী পত্রে যে ভাবের ব্যঞ্জনা করিয়াছেন—এ কি দূষ্য—এ কি নিন্দনীয়? এরূপ ভাব ত তাহার হৃদয়েও উঠিতেছে পড়িতেছে। এ যে তাহারই হৃদয়ের সুগুপ্ত কথাগুলি সরযূদেবীর পত্রের প্রতি অক্ষরে অক্ষরে চিত্রিত রহিয়াছে। ইহা যদি অস্বাভাবিক হইবে—যদি লজ্জার কথা হইবে—তবে স্বামী-স্ত্রীর পৃথক পৃথক লেখা একই পত্রে কেন? হেমলতা দেবী যজ্ঞেশ্বরবাবু ও তদীয় পত্নীর পত্রের এই সমস্ত কথা অবগত হইয়া ভাবিলেন যে বিনা বিচারে হীরক বলিয়া যাহাকে মাথার মণি করিয়াছেন, তাহা কাঁচ না হইয়া প্রকৃতপক্ষে হীরকই হইল এবং যে জহুরী এতদিন ইহা পাহারা দিয়াছে সে-ই তাহাকে জানাইয়া দিল। ইহা ভগবানের খেলা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কিন্তু ইহা কি স্বাভাবিক? শ্রীশ্রীঠাকুর পরপুরুষ—সন্ন্যাসী—সমাজত্যাগী, অথচ একজন ধন, জন, শিক্ষা ও মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি তার একান্ত দীনতা জানাইয়া, জগতের সব সুখ তুচ্ছ করিয়া হৃদয়ের ভিতর তাঁহাকে প্রীতির আসনে আসীন রাখিয়াছেন। এ যে সমস্তই হেমলতার ভাব, এ যে সমস্তই হেমলতার ভাষা! তিনি স্থির করিলেন তাঁহারাও তাঁহাদের মত হইবেন।

এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কলিকাতার কার্য্যও প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিল। এই অল্প সময়ের ভিতর অনেকেই তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিল। বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণপত্রাদি আসিতে থাকিল। ইহার মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর মাত্র একটি নিমন্ত্রণে যোগদান করিলেন। কলিকাতায় মহাকালী পাঠশালায় একদা তাঁহার নিমন্ত্রণ হইল। শ্রীযুক্তা মহাকালী একজন মারাঠী বিধবা। তাঁহার দ্বারা এই পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত। নানা প্রকার উৎসবের পর একজন য়ুরোপীয় সম্মোহনকারী মহাকালীকে নানাভাবে নানা প্রক্রিয়ায় সম্মোহিত করিতে চেষ্টা পাইল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেও কৃতকার্য্য হইল না। তখন মহাকালী সাহেবকে বলিলেন, "সাহেব! তুমি বস, আমিই তোমাকে সম্মোহিত করিব।" সাহেব একটি চেয়ারে বসিল। তখন সাহেবের হাতের সহিত একটী সূতা বাঁধিয়া বহুদূর লইয়া গিয়া মহাকালী দুই এক মিনিটকাল ধরিয়া থাকিতেই সাহেব নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ই চমৎকৃত হইলেন। উক্ত সাহেব একজন নামজাদা সম্মোহনকারী অথচ একজন ব্রহ্মচারিণী বিধবার মনের একাগ্রতায় তিনি নিজেই সম্মোহিত হইয়া গেলেন; সম্মোহনবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও একজন বিধবাকে সম্মোহিত করিতে পারিলেন না।

অতঃপর মহাকালীর সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই মানসিক শক্তির সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনা হয়। তাঁহাকে মনের উৎকর্ষের জন্য নানা প্রকার উপদেশ দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তথা হইতে চলিয়া আসিলেন এবং কলিকাতার কার্য্য শেষ হওয়ার পর ময়মনসিংহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ময়মনসিংহে ফিরিয়া আসিলে হেমলতা দেবী ও তাঁহার স্বামী উমাচরণ সরকার উল্লসিত হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের "যোগীগুরু" পুস্তক প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সাধনেচ্ছু বহু গৃহস্থও তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে থাকিল। এই সময়ে তাঁহার নিকট কুমিল্লার দুর্গাপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত

চন্দ্রকান্ত সেন তাঁহাকে কুমিল্লায় একটী আশ্রম স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া পত্র দেন। এদিকে একজনের বাটীতে অবস্থান করিয়া প্রচারকার্য্য ও গুরুগিরির সুবিধা না হওয়ায় অতঃপর তিনি কুমিল্লার দুর্গাপুর যাত্রা করিলেন।

কুমিল্লায় অস্থায়ী আশ্রম স্থাপন—দুর্গাপুর দেওয়ান বাড়ী এতদ্দেশে সর্বজনপরিচিত। তাঁহারা বনিয়াদী গৃহস্থ ও জমিদার। আগরতলা রাজসরকারে চন্দ্রকান্ত সেন মহাশয়ের কোন পুর্ব্বপুরুষ দেওয়ান ছিলেন বলিয়া তদবধি জমিদারবাড়ী "দেওয়ান বাড়ী" বলিয়া সবিশেষ পরিচিত। জমিদার চন্দ্রকান্ত সেন মহাশয় নিজের বাড়ীর নিকটেই দু'খানি ঘর তৈয়ারী করিয়া দিলেন, একখানি শ্রীশ্রীঠাকুরের থাকার জন্য, অপরখানি পাকের জন্য। কুমিল্লায় ইতিপূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুর আর কখনও আসেন নাই। এই নূতন স্থানটিতে আসিয়া বিশেষতঃ ময়নামতী পাহাড় দর্শনে—তিনি যে অন্য দেহে এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন এবং এই পাহাড় যে একটী সন্ন্যাসীসঙ্ঘের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল—সে সমস্ত পূর্ব্ব জন্মের কথা মনে হইতে লাগিল। কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার এ দেহ যে সেই দেহ হইতে পৃথক, এই স্বতন্ত্র অস্তিত্ববোধ রহিত হইয়া গিয়া তিনি যেন অন্য মানুষ হইয়া গেলেন। কুমিল্লায় আসিয়া প্রথমে কিয়দ্দিন দেওয়ান বাড়ীতেই অবস্থান করিয়া পরে আশ্রমগৃহে আসিয়া বাস করিতে থাকিলেন। এই সময় প্রতিদিন আশ্রমগৃহের দ্বারদেশে দু'চার শত রোগী শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপার জন্য মাথা খুঁড়িত এবং তাঁহার কৃপায় অনেকের দুরারোগ্য রোগ নিরাময় হইতে লাগিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইসব রোগ নিরাময়ের প্রকৃত তথ্যটী এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাণের স্পন্দন ব্যতীত কোন রোগই নিরাময় হইতে পারে না। ঔষধপত্র সমস্তই দেহের ভিতর কম্পন সৃষ্টি করে। এই কম্পন দ্বারা দেহের যেস্থানে যে ধাতুর অভাবে এই রোগের সৃষ্টি হয়,

ঔষধ সেই ধাতুর সমতা ও পরিপূরণ করে। কিন্তু ভক্তি ও বিশ্বাস লইয়া প্রকৃত সাধুর নিকট আসিলে রোগীর দেহের ভিতর এইরূপ স্পন্দন আপনাআপনিই হইয়া দেহের যেখানে যাহা অভাব আছে, তাহা অন্যত্র হইতে গিয়া পরিপূরণ করে। যেমন একটি পাত্রের একস্থানে জমান ঘি যদি অগ্নির নিকট লইয়া যাওয়া যায়, তবে অগ্নির তাপে ঘি গলিয়া পাত্রে সমতা প্রাপ্ত হয়। ইহা সাধারণ ভাবে রোগ নিরাময়। তবে প্রারব্ধজনিত রোগ স্থানবিশেষে সাধু নিজেই কৃপা করিয়া তাহার ভিতর স্পন্দন তুলিয়া সারাইয়া দেন অথবা সাধুর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ বা ধূনির ছাই খাইতে দেন—প্রসাদ বা ধূনির ছাই তাহার দেহের ভিতর স্পন্দন সৃষ্টি করে। সারাদিন এইরূপ ভাবে বহু রোগী তাঁহার আশ্রমদ্বারে ধন্না দিত। যাহা হউক অতঃপব অভীষ্ট সিদ্ধির পর তাহারা প্রফুল্লান্তঃকরণে গৃহে ফিরিয়া যাইত। পাবনার স্থলবসন্তপুরের শ্রীনরেশচন্দ্র পাকড়াশী এইরূপ একটী দারুণ চিকিৎসাবহির্ভূত রোগ লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণেই তাঁহার রোগ নিরাময় হয়। তিনি ষাট বৎসর কাল তাঁহার কৃপায় সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সুখ শান্তি ভোগ করিয়া ১৩৮১ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে লীন হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের জনৈক মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া কার্য্য হইতে অকালে অবসর গ্রহণ করিয়া বাটীতে আসিয়া একস্থানে স্থবিরের ন্যায় বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইবার জন্য তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট গমন করিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিবামাত্র দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পান ও ঐ দৃষ্টিবলে অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া স্বগৃহে গমন করেন। আজ পর্য্যন্তও তিনি দৃষ্টির বলে স্বকার্য্য করিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন।* এইরূপ হাজার হাজার

* উপরোক্ত ঘটনা দুইটি পরবর্ত্তী কালে সংঘটিত হইয়াছিল।—প্রকাশক

লোক শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় রোগমুক্ত হইতে লাগিল। যাহা হউক রোগ নিরাময় করা ও তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া তাহার তালিকা প্রস্তুত করা আমার অভিপ্রেত নহে। এইরূপভাবে রোগনিরাময় চলিতে থাকিলে একদিন যোগীগুরু সুমেরদাসজী হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া বলিলেন, "আমি পাঠাইয়াছি তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করিতে—ভবব্যাধি নাশ করিতে, আর তুমি বৈদ্য সাজিয়া বসিয়াছ ?"

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছুই করিতেছি না। আমার দর্শন ও স্পর্শন মাত্রেই ইহাদের রোগ নিরাময় হইয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় আমি কি করিতে পারি ?

সুমেরদাস। তোমার যোগৈশ্বর্য্য সংবরণ কর, যাহাতে কেহ তোমার সংস্পর্শে আসিলে প্রাণের কম্পন না হয়।

যোগীগুরু সুমেরদাসজী এই সমস্ত উপদেশ দিয়া অন্তর্ধান করিলেন।

অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুর রোগ নিরাময় করা বন্ধ করিলেন এবং কেবলমাত্র অধ্যাত্মবিদ্যালাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি যেদিন হইতে রোগ নিরাময় করা বন্ধ করিলেন, সেইদিন হইতেই অধ্যাত্মবিদ্যালাভেচ্ছুগণ তাঁহার নিকট আসিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় কুমিল্লা, পাবনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, আলিপুরদুয়ার প্রভৃতি স্থানের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহাব পদাশ্রয়ে নিজেকে ধন্য মনে করিলেন এবং নানাস্থান হইতে তদীয় সাধনলব্ধ জ্ঞান প্রচার করিতে আহূত হইতে থাকিলেন। দুর্গাপুর আশ্রম হইতে মাঝে মাঝে ভক্তশিষ্যের আহ্বানে ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরকে অতি ঘন ঘন যাতায়াত করিতে হইত।

এই সময় দেশে স্বদেশী যুগের প্রারম্ভ এবং বহুলোক শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিত বলিয়া বহু গোয়েন্দা পুলিশ তাঁহার গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখিত ও মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। এইরূপ

একদিন শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য নামে জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারী সহসা লোক-সমূহের সম্মুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তর্দ্ধান করিবার ক্ষমতা দর্শনে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিলেন। উক্ত ঘটনায় ইন্‌স্পেক্টার শশীবাবু ও তাঁহার দর্শনলাভেচ্ছু অন্যান্য ভদ্রলোক এইরূপ বুঝিলেন যে তিনি ইচ্ছা মাত্র কম্পন দ্বারা নিমেষের ভিতর পরমাণুসংহতিস্বরূপ দেহকে পুনরায় পরমাণুতে পরিণত করিয়া অন্যের অলক্ষ্যে অবস্থান করিতে পারেন সুতরাং পুলিশ কর্ম্মচারীগণ যেভাবেই তাঁহাকে বিব্রত করিতে চেষ্টা করুন না কেন, তাঁহার অনিচ্ছাকৃত কার্য্য কেহ করিতে পারিবেন না। ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও ক্ষুদ্র শক্তি মহাপুরুষের বিরাট শক্তির নিকট পরাজিত হইবেই হইবে।

ময়মনসিংহে বেনিয়ারচর কাছারীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থানকালে একবার অনাবৃষ্টি হেতু শস্যাদি জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। চারিদিকে চাষীদের ভিতর হাহাকার উঠিতে লাগিল। সারা বৎসর কি ভাবে চলিবে—দুর্ভিক্ষে যে লোক প্রাণত্যাগ করিবে ইহাই যখন তাহাদের চিন্তার কারণ হইল, তখন তাহারা দলবদ্ধ হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "শোনা যায়, যে দেশে সাধু থাকেন সে দেশে সুবৃষ্টি হয়। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া অনাবৃষ্টি হরণ করুন।" তাহাদের আকুল প্রার্থনার ফল হাতে হাতে ফলিল। তাহারা বসিয়া থাকিতে থাকিতেই প্রাবৃট কালের ন্যায় চারদিক অন্ধকার করিয়া অকস্মাৎ আকাশ মেঘে ছাইয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে মুষলধারায় বারিপাত হইয়া সকলের বিস্ময় ও আনন্দ বর্দ্ধন করিল। এই ঘটনাটি ঐ অঞ্চলের লোকজনের এখনও মনে আছে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গ উঠিলেই তাঁহারা এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকেন। অথচ এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন যে এই বৃষ্টি হওয়াতে তাঁহার কোন হাত ছিল না, ইহা সম্পূর্ণ ভগবানের খেলা—তিনি সর্ব্বপ্রকার স্বতন্ত্র ইচ্ছা-বিবর্জ্জিত। ভগবান তাঁহার হইয়া অনেক সময় অনেক কিছু প্রয়োজনবোধে করিয়া থাকেন।

বিমলাচরণ চক্রবর্ত্তী নামে অপর একজন কর্ম্মচারী গোয়েন্দা বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। এক সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য তাঁহার উপর ভার পড়ে। কিছুদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের ছায়ানুসরণ করিয়া তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ গোয়েন্দার দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। অবশেষে একদিন ভক্তিবিনম্রভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তিনি সমস্ত কথাই বলিলেন ও শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হইলেন। কিছুদিন পরে তিনি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বেনারসে গিয়া সাধন-ভজনে রত হন। এইরূপে বহুলোক যাহারা তাঁহাকে বিব্রত করিতে চেষ্টা করিতে আসিল পরে তাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার সাধুত্বে মুগ্ধ হইয়া পদাশ্রয় গ্রহণ করতঃ নিজেদের জীবন ধন্য মনে করিতে লাগিল। কুমিল্লায় অস্থায়ী আশ্রম স্থাপনের কিছুদিন পরে একদা সরকার মহাশয় সস্ত্রীক আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও কয়েক দিন পরে তথায় স্থায়ীভাবে থাকিয়া সাধনাদি করিবার ইচ্ছা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু আশ্রমে সস্ত্রীক থাকিয়া সাধনাদি করিতে শ্রীশ্রীঠাকুর অসম্মতি জানাইলেন। সরকার মহাশয় যতই অনুনয় করিতে থাকিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর ততই বিরক্তি প্রকাশ ও গম্ভীরভাব ধারণ করিতে থাকিলেন। ইহাতে হেমলতা দেবী লজ্জায়, ভয়ে আশ্রমগৃহের এককোণে জড়সড় হইয়া রহিলেন। গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সরকার মহাশয় বলিলেন, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?"

শ্রীশ্রীঠাকুর। করুন।

সরকার মহাশয়। আপনার পুস্তক "যোগীগুরু"তে লেখা আছে "কৃপাসিন্ধু ফুরাবে না বিন্দু বিতরণে" ইহা কি আপনার লেখা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর কোন জবাব দিলেন না, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। সরকার মহাশয় সে মূর্ত্তির সম্মুখে বেশীক্ষণ বসিতে পারিলেন না, আস্তে আস্তে সরিয়া গেলেন। কয়েকদিন পরে

পুনরায় সরকার মহাশয় ও তাঁহার পত্নী তাঁহাদিগকে আশ্রমে আশ্রয় দিবার জন্য অনুরোধ করিতে থাকিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাদিগকে বুঝাইলেন—এটা তাঁহার আশ্রম, এখানে স্বামী-স্ত্রী ভাবে থাকা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। এখানে থাকিয়া কোনপ্রকার সাধনা করিতে হইলে তাহাদের ভ্রাতা-ভগ্নীর ন্যায় থাকিতে হইবে ; কিন্তু তাহা তাহাদের পক্ষে বড় কঠিন। বিশেষতঃ আশ্রমে অন্য কোন লোক থাকার জন্য পৃথক ঘর নাই। মাত্র দুইটি ঘর—একটা তাঁহার থাকিবার জন্য অন্যটি পাকের জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সরকার মহাশয়ের জন্য এবারকার অনেক কাজ পণ্ড হইয়া যাইবে। যাহা হউক সরকার মহাশয় আশ্রম হইতে নড়িলেন না। তিনি একান্ত নিষ্ঠাসহকারে সাধনাদি করিতে থাকিলেন। এদিকে বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যভক্তগণ স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া আসিয়া আশ্রমটীকে একটী তীর্থে পরিণত করিয়া তুলিলেন। সুতরাং হেমলতা দেবীর ও চণ্ডীচৈতন্য ব্রহ্মচারীর পাকশালার কর্ম্মে সারাদিন ব্যাপৃত থাকিতে হইত। দূর দূরান্তর হইতে শিষ্যগণ স্ত্রীপুত্র লইয়া আশ্রমে আসিয়া একাদিক্রমে ১৫।২০ দিন পর্য্যন্ত থাকিতে লাগিল। একদল চলিয়া গেলে অন্যদল আসিত। এই সময় ঢাকার ডাক্তার নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায় ও পাবনার শান্তি মা একাদিক্রমে অনেকদিন পর্য্যন্ত থাকিতেন। শান্তি মা যখন থাকিতেন তখন তাঁহার উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ রান্না করিবার ভার পড়িত।

আশ্রমে সরকার মহাশয় অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে সাধনাদি করিতে থাকিলেন এবং সাধনায় যে তাঁহার বেশ উন্নতিও লাভ হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিলেন। নাদসাধনায় কৃতকার্য্য হইতে থাকিলে প্রথমে ঝিল্লীরব অর্থাৎ ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিতে থাকিলে যেরূপ শব্দ হয় তদ্রূপ শব্দ শুনিতে থাকিলেন। তৎপরে ক্রমশঃ সাধনা করিতে করিতে বংশীরব, মেঘগর্জ্জন, ঝাঁঝ, বাদ্যের শব্দ প্রভৃতি শুনিতে পাইতেন। এই

শব্দ শুনিতে শুনিতে কখনও তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত এবং কখনও কখনও মাথা ঘুরিতে থাকিত। এদিকে মাঝে মাঝে পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ তাঁহার ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য হইতে থাকিল। নাদসাধনে অশ্রুতপূর্ব্ব মনোমুগ্ধকর নাদধ্বনি শ্রবণে সাধনায় যেরূপ উল্লসিত, সাধনান্তে মনে দারুণ ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়া যোগবিঘ্ন হওয়ার জন্য ততোধিক দুঃখিত হইতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার স্ত্রীরও শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় বিবেক জাগিয়া উঠিতে লাগিল ও ক্রমে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পৃথকভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় রত থাকায় উভয়ের ভিতর দাম্পত্যভাব ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে থাকিল। তাঁহাদের মনের ভিতর সাময়িক দুর্ব্বলতা আসিলেও উহা সামলাইতে চেষ্টা করিতেন। যখন সরকার মহাশয়ের মনের ভিতর এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তখন আর এক অনর্থক উৎপাত আশ্রমের উপর চলিতে লাগিল। দুর্গাপুরের জমিদার চন্দ্রকান্ত সেন মহাশয়ের শরিকগণের সহিত বিষয়ঘটিত বিবাদ সুরু হইয়া গেল। জমিদার-পরিবারের ভিতর একমাত্র চন্দ্রকান্তবাবুই শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। শরিকগণের বিষয়ঘটিত বিবাদ ক্রমে আদালতে গড়াইল। অপরাপর শরিকগণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাহাদের পারিবারিক বিবাদের ভিতরে জড়াইতে লাগিল। আমবাড়ীয়ার জমিদার হেমবাবু অবশেষে চন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধপক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরকে মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। বিষয়-সম্পর্কে আদালতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষ্য প্রদান—ইহা সন্ন্যাসধর্ম্মবিরোধী। এদিকে ঢাকার ডাক্তার নৃপেনবাবু ও উক্ত জেলার এক স্কুলের প্রধান শিক্ষক কামাখ্যাবাবু সপরিবারে তীর্থভ্রমণে যাইবেন স্থির করিয়া সকলকে লইয়া কুমিল্লায় আসিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইলেন। অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের যাওয়াই স্থির হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য শিষ্যগণ স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া যাইতেছে দেখিয়া হেমলতা দেবীও সরকার মহাশয়কে ধরিয়া বসিলেন যাহাতে তাঁহাকে

যাইতে অনুমতি দেন। সরকার মহাশয় দেখিলেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর চলিয়া গেলে স্ত্রীর সহিত আশ্রমে একাকী থাকিলে যোগবিঘ্ন ঘটিবে। সুতরাং এতদূর অগ্রসর হইয়া আবার পিছাইয়া যাইবেন, বিশেষতঃ এ বৃদ্ধ বয়সে পরকালের জন্য যদি কিছু সঞ্চয় হয় তজ্জন্য কামাখ্যাবাবুর স্ত্রীর সহিত হেমলতা দেবীকে পাঠাইলেন। তিনি নিজে আশ্রমের ভার লইয়া অবস্থান করিতে থাকিলেন।

স্ত্রী নিকটে থাকিলে যোগসাধনায় নানা প্রকার বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইবে এই আশঙ্কায় তিনি আপাততঃ স্ত্রীর সাহচর্য্য হইতে দূরে থাকিয়া সাধনা করিবেন বলিয়া তাহাকে তীর্থভ্রমণে পাঠাইলেন বটে কিন্তু অপর বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। দেওয়ান বাড়ীর অপরাপর শরিকগণ যাঁহারা আশ্রমের বিরুদ্ধে অহিতাচরণ ও বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেছিলেন এবং যাঁহারা গ্রামের ভিতর সন্ন্যাসীর প্রতিষ্ঠিত আশ্রম সম্বন্ধে বিরক্তি প্রকাশ করিতেছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় এইবার তাঁহারা আশ্রমটীর সাক্ষাৎ শত্রু হইয়া উঠিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের তীর্থযাত্রার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া তাহারা সরকার মহাশয়কে একেবারে পাইয়া বসিল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, এতদিন নায়েবী করিয়া লোক চরাইয়া অবশেষে তিনি ভেড়া বনিয়া গিয়াছেন। নিজের স্ত্রীকে একজন অজ্ঞাতকুলশীল সন্ন্যাসীর হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন, সন্ন্যাসী আর আসিবে না। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার অদৃষ্টে কি এতই দুর্গতি ছিল? যে সন্ন্যাসী তাহার সম্মোহিনী শক্তির দ্বারা তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তিনি কেন তাঁহার সাহচর্য্য করিতেছেন? তাঁহার সরিয়া পড়াই শ্রেয়স্কর। সন্ন্যাসী এতদিন হইল চলিয়া গিয়াছে, আসিবার হইলে নিশ্চয়ই আসিত, আর যদি আসেও তবে আবার সরকার মহাশয়কে সম্মোহিত করিয়া রাখিবে, অতএব তাঁহার অনুপস্থিতে সরিয়া পড়াই ভাল ইত্যাদি। অবশেষে আশ্রমটী

শত্রুপক্ষীয় লোকদের বেশ একটী আড্ডা হইয়া দাঁড়াইল এবং প্রতিদিন সরকার মহাশয়ের কর্ণে তাহারা বিষ ঢালিতে লাগিল। সরকার মহাশয় অবশেষে গুরুর আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন স্থির করিলেন এবং আশ্রমের যত জিনিসপত্র আছে তাহা সমস্তই লইয়া যাইবেন বলিয়া নিজের ভাইকে সংবাদ দিয়া লইয়া আসিলেন। অতঃপর একদিন নিশাযোগে জিনিসপত্র ও টাকা সহ সরকার মহাশয় উধাও হইলেন। প্রাতে লোকজন আসিয়া দেখিল সরকার মহাশয় চলিয়া গিয়াছেন। বিদ্বেষপরায়ণ লোকগণ একটী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। যে রাত্রে সরকার মহাশয় আশ্রমের দ্রব্যাদি লইয়া সরিয়া পড়িলেন, ঘটনাচক্রে পরদিন প্রভাতেই শ্রীশ্রীঠাকুর নৃপেনবাবু প্রভৃতির সহিত আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।* আশ্রম গৃহের দ্বার সম্পূর্ণ খোলা, গৃহাভ্যন্তরে একটী দ্রব্যও নাই—সরকার মহাশয়েরও কোন খোঁজ নাই। গ্রামের লোক সব আসিয়া পড়িল; তাহারা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল ও তামাসা দেখিতে লাগিল। যাহারা সরকার মহাশয়ের পক্ষ হইয়া রাত্রে জিনিসপত্র বহিয়া সাহায্য করিয়াছে, অদ্য তাহারা ঘটনার কিছুমাত্র অবগত নহে।

অতঃপর চণ্ডীচৈতন্য ব্রহ্মচারী থানায় সংবাদ দিল। এই ঘটনায় হেমলতা দেবীর মানসিক অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া পড়িল। একদিকে স্বামী অপর দিকে গুরু। শ্যাম রাখি কি কুল রাখি। তাঁহার স্বামী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া প্রায় ৭।৮ শত টাকা যাহা আর্য্যদর্পণ নামে মাসিকপত্রের নূতন বৎসর প্রারম্ভের জন্য তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল এবং

* মতান্তরে:—ঠাকুর তীর্থভ্রমণ সমাপনান্তে ঢাকায় আসিয়া অবস্থান করেন। যোগানন্দজীর মারফৎ তথাকার ঘটনা শুনিয়া কুমিল্লা যান এবং থানায় এজাহার দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। অতঃপর তিনি আর কোনও দিন দুর্গাপুর শান্তি আশ্রমে যান নাই। শান্তি আশ্রম ঢাকায় উঠাইয়া লইয়া আসেন।—প্রকাশক

অন্যান্য গৃহসজ্জার দ্রব্যের সহিত ভক্ত-শিষ্যপ্রদত্ত রৌপ্যনির্ম্মিত থালা, গ্লাস, বাটী এবং লেপ, তোষক ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস লইয়া চম্পট দিয়াছেন। তাঁহার স্বামীর এ কী প্রবৃত্তি! এ ত বিশ্বাস হয় না। তাঁহার স্বামী অসদুপায়ে অর্থাগম করিয়াছেন বটে, কিন্তু এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা—বিশেষতঃ গুরুর সহিত—ইহা যে তাঁহার ধারণার বহির্ভূত—এ যে কল্পনাতীত! তিনি যে যোগসাধনায় অনেকটা উন্নতিও করিয়াছিলেন। "এ যেন সত্য না হয়—ভগবান রক্ষা কর—আমার মুখ রাখ।" এইরূপ চিন্তায় চিন্তায় হেমলতা দেবীর মুখ শুকাইয়া গেল—চক্ষু কোটরাগত হইল। এ বয়সে স্বামীর জন্য এতটা গ্লানি সহ্য করিতে হইবে ইহা কোনদিনই ভাবিতে পারেন নাই। কেন তাঁহার স্বামীর এরূপ সাময়িক দুর্ব্বলতা আসিল? একবার মনে হইল, চণ্ডী থানায় যাইবার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরকে কেন জিজ্ঞাসা করিয়া গেল না—তিনি ত থানায় সংবাদ দিতে বলেন নাই—অবশ্য নিষেধও করেন নাই। তিনি নিষেধ করিলেন না কেন? পরে তিনি নিজে স্বামীর নিকট গিয়া সমস্ত দ্রব্যাদির সহিত তাঁহাকে হাজির করিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রমাদ গণিলেন। ভগবদিচ্ছায় লোকালয়ে আসিয়াছেন সংসার-লীলার অনুধাবন করিতে। লোকের সহিত মিশিয়া, লোকালয়ের বিষাক্ত সংস্পর্শে আসিয়া, বিষয়ের ভিতর জড়িত হইয়া পুলিশের সাহায্যে আদালতে বিষয়ের উপর সত্ব সাব্যস্ত করাই কি তবে ভগবদিচ্ছা? স্বেচ্ছায় তিনি গুরুগিরি করিতে আসেন নাই। গুরুগিরি করিতে মহাশূন্যাবস্থা হইতে নিম্নস্তরে নামিয়া আসিয়াছেন—শুধু লোকের দ্বারা কর্ম্ম করাইয়া তাহার বিনিময়ে কৃপা করিতে। তাহাও কেবল ভগবদিচ্ছায়। কিন্তু শুধু কি তাই? পাহাড়-পর্ব্বতকন্দরে বসিয়া চৈতন্যের জ্ঞানময় ভাব লইয়া জড় সমাধিতে বাহ্যচৈতন্য লোপ করিয়া যুগের পর যুগ অতিবাহিত করিয়া দেওয়া যায় তাঁহার নির্গুণ ভাব লইয়া, কিন্তু উহা করামলকবৎ

হস্তগত করিবার পরই ভগবান কি ভাবে লোকের ভিতর বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাইতেছেন—লোকচরিত্রের বৈচিত্র্য যে তাঁহারই প্রকাশ-বৈচিত্র্য মাত্র—কোটী কোটী জীবের ভিতর বসিয়া দেহ-রথকে চালাইয়া প্রতিগৃহে তিনি কি লীলা করিতেছেন তাহারই আস্বাদন করাইতে এখন তাঁহাকে সংসারে পাঠাইয়াছেন। সগুণের লীলা যে কি বৈচিত্র্যময়ী তাহা প্রধানতঃ লোকচরিত্রের ভিতর দিয়াই প্রকাশ পাইতেছে। তিনি স্ত্রী হইয়া কি প্রকারে স্বামীকে কোথায়ও ভালবাসিতেছেন, আবার স্বামী হইয়া কতভাবে স্ত্রীর সহিত লুকোচুরি খেলিতেছেন—কোথায়ও প্রাণের বিনিময় করিতেছেন। তিনিই চুরি করিয়া হাজতে যাইতেছেন—আবার তিনিই আর এক মূর্ত্তিতে বিচারাসনে বসিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিতেছেন। এই লীলাচাতুর্য্য অহর্নিশ শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্ঞানচক্ষুতে প্রতিভাত হওয়ায় এক অপূর্ব্ব মধুর লীলা সম্ভোগ করিতে থাকিলেন। উমাচরণ সরকার তাঁহারই অনন্ত বৈচিত্র্যময় জগতের একটী ক্ষুদ্র দৃশ্য মাত্র। শ্রীশ্রীঠাকুর যে গৃহস্থেরই সম্পর্কে আসিতে থাকিলেন—সেই পরিবারের ভিতরই অনন্ত লীলাময়ের সংসারলীলার বহুরূপত্ব দর্শনে স্তব্ধীভূত হইয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইতে থাকিলেন—বুঝিলেন যে ভগবান তাঁহাকে ভগবানের সংসারলীলাবৈচিত্র্যের দিকটাও অনুধাবন করাইয়া তাঁহার পূর্ণত্ব আনয়ন করিবেন।

পুলিশকে ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে। সত্যসত্যই সরকার মহাশয়কে পুলিশ বমাল ধরিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট তদন্তের জন্য লইয়া আসিল। শ্রীশ্রীঠাকুর দেখিলেন একই লীলাময় ভগবান পুলিশ ও চোর হইয়া বিভিন্ন দেহের ভিতর দিয়া অপূর্ব্ব সংসারলীলা করিতেছেন—কিন্তু পুলিশ ও চোর তাহার কিছুই খোঁজ রাখে না—কারণ তাহারা তাঁহারই ইচ্ছায় গুণাবরণে নিদ্রিত। মাতাল বা উন্মাদের যেমন পথভ্রান্তি ঘটে—গুণাবরণে ইহাদেরও তেমনি ব্রহ্মস্মৃতি লোপ পাইয়াছে। অনন্ত

লীলাময়ই কোন এক শুদ্ধসত্ত্বময় দেহের ভিতর দিয়া স্বরূপবিস্মৃত ব্যক্তিগণকে ধাক্কা দিয়া জাগাইতে চেষ্টা করিতেছেন। বড়ই অপূর্ব্ব খেলা! লীলাময়-লীলাময় সবাই বলে কিন্তু এই সংসারই যে তাহার লীলাভিনয়ের আসর। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিস্ময়ের উপর বিস্ময় জন্মিতে থাকিল। আর একটী চিত্র যাহা স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় তাঁহার চিত্তে প্রতিভাত হইল তাহা সরকার মহাশয়ের পত্নীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। শ্রীশ্রীঠাকুর নির্জ্জনে মানসনেত্রে উহা দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। লীলাময়ের এই অপূর্ব্ব মিথ্যা অভিনয়-চাতুর্য্য দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর উমাচরণ সরকারের পক্ষে নানাপ্রকার ওকালতি করিয়া, পুলিশকে অনেক অনুরোধ করিয়া সরকার মহাশয়কে অব্যাহতি দিয়া দিলেন এবং টাকা কড়ি জিনিসপত্র যাহা কিছু সরকার মহাশয় লইয়া গিয়াছিলেন—সবই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। কেহ কিছু বুঝিল না। যে জিজ্ঞাসা করিল, তাহাকে বলিলেন যে, তস্করস্পৃষ্ট জিনিস সাধুর রাখিতে নাই। অকপট গুরুভক্তির পারিতোষিক দেওয়া গেল। সরকার মহাশয় আশ্রম হইতে চলিয়া যাইবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার পত্নীকে ডাকিয়া নিজের স্বামীর সহিত গৃহে যাইতে আদেশ করিলেন। সরকার মহাশয় পুলিশের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন বটে কিন্তু অপমান ও আক্রোশ তাঁহার ভিতর গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি স্ত্রী হেমলতাকে গৃহে লইতে অস্বীকার করিলেন। পরন্তু তাঁহার শ্লেষোক্তি শ্রবণ করিয়া সতীত্ব গরবে গরবিণী হেমলতা দেবী দলিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আজ তুমি আমাকে যে কথা শোনালে, তাতে কোন রমণী বেঁচে থাকে না তুমি আজীবন লাম্পট্য করে এসেছ—তবু কোনদিন আমি তোমাকে অবজ্ঞা করিনি। দেবতার ন্যায় পূজা করে এসেছি—আর আজ তুমি—" বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিবেন ভিন্ন আর কি করিবেন? হিন্দু স্ত্রী অবজ্ঞাতা এবং পরিত্যক্তা

হইলে তাহার ক্রন্দন ভিন্ন আর কি উপায় আছে? প্রেমের আদর্শেই যে এ দেশের নারীর হৃদয় গঠন করিতে হইবে—এই ত সমাজের ধারা বা নিয়ম, তা সে লাঞ্ছিতা হউক আর যাই হউক। যখন সত্যসত্যই সরকার মহাশয় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন তখন তিনি বলিলেন, "যখন স্বেচ্ছায় বিনা অপরাধে আমাকে ছেড়ে চলে গেলে তখন আর কখনও অনুতাপ করে ফিরে এলেও আমি যাব না। তোমাকে এতদিন শুধু লম্পট বলিয়াই ধারণা ছিল কিন্তু এখন দেখিতেছি তুমি বিশ্বাসঘাতক ও চোর!"

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "না গেলে থাকবে কোথায়—এটা আশ্রম—স্বামীর সহিত চলিয়া যাও।" কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডাবে? সরকার মহাশয় চলিয়া গেলেন। হেমলতার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

ক্রমে দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, সরকার মহাশয় আর ফিরিল না। হিন্দুনারীর স্বামীর গৃহই তীর্থস্বরূপ—সে স্বামী যেরূপই হউক। কিন্তু যে স্বামী স্ত্রীর পত্নীত্বের দাবী অস্বীকার করিয়া—ঘৃণায় অবজ্ঞায় তাকে প্রত্যাখ্যান করে—যার সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রমেও আজ সূচ্যগ্রপরিমিত স্থান নাই—যেখানে এত বড় পৃথিবীতে তার মাথা রাখিবার এক কাঠা ভূমিতে সারা জীবনেও অধিকার বর্ত্তায় না—তবে কি নারীর দেহ শুধু পুরুষের উদ্দাম প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি জোগাইবার যন্ত্রস্বরূপ? তবে কি হিন্দু-নারীর সাধুজীবন যাপন করিবার অধিকার হিন্দুশাসন স্বীকার করে না? পুরুষের যে যে অবস্থা ও অধিকার লাভের জন্মগত অধিকার আছে, ন্যায়ধর্ম্মানুসারে স্ত্রীলোকেরও ঠিক তাই থাকার সম্ভাবনা। হেমলতা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্ত্রীলোকের আত্মা আছে কি?"

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, আছে বৈ কি।

হেমলতা। তবে আমি যে স্ত্রী হইয়া জন্মিয়াছি এবং আমার দেহে অন্যেরই অধিকার—আমার অধিকার নাই—ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? আমি নিজেকে যদি চিন্মাত্র আত্মা বলিয়া চিন্তা করি তবে আমার পত্নীত্ব খসিয়া যাইতে পারে না কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অধীনতা অস্বীকার করিলে তখন থেকেই স্বাধীন। তবে নির্ব্বিশেষভাবে আত্মার উপলব্ধি করা সবিশেষ আত্মার পক্ষে বিশেষ সাধনা সাপেক্ষ। নির্ব্বাণমুক্তির প্রারম্ভে তদ্বোধ আসিতে পাবে মাত্র।

হেমলতা। আত্মার আবার সবিশেষ নির্ব্বিশেষ কি? আত্মা কি সব সময়ই নির্ব্বিশেষ নহে?

পুরুষ ও স্ত্রীর সম্বন্ধ বিচার—শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, আত্মার স্বরূপ অবস্থাই হচ্ছে নির্ব্বিশেষ সদ্বস্তু—অক্ষয়—অব্যয়। আত্মা কথা একত্ব-বোধক বটে, যেরূপ বিদ্যুৎ বলিলে বুঝায়। বিদ্যুতের ভিতর যেরূপ

আবার নেগেটিভ ও পজেটিভ আছে, পুরুষের আত্মা ও স্ত্রীর আত্মাও ঠিক তদ্রূপ। মানুষের আত্মার স্বরূপের বিভিন্নতা আছে। সগুণ আত্মা নারীর একরূপে—পুরুষের অন্যরূপে প্রকাশ। সগুণ স্ত্রী-আত্মা স্ত্রী-শরীর তৈরী করে নেয়, সগুণ পুরুষ-আত্মা পুরুষশরীর তৈরী করে নেয়। একমাত্র নির্ব্বিশেষ মুক্ত আত্মা—যেরূপ ইচ্ছা তদ্রূপ শরীর ধারণ কর্ত্তে পারেন। সাধনার দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ ধীরে ধীরে উন্নত হইয়া স্ত্রীভাব ও পুরুষভাবে ভাবিত হইয়া স্ত্রী ও পুরুষের চরম-আদর্শে অর্থাৎ শক্তি ও শিবে অথবা রাধা ও কৃষ্ণে লয় হয়। একমাত্র জ্ঞানের সাধনার দ্বারা চরম অবস্থায় পরমহংসত্ব লাভ হয়, তখনই আত্মার নির্ব্বিশেষ অবস্থার উপলব্ধি হয়। দেহান্তে তাহাদের ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হয়। কোটী কোটী জীবন্মুক্তের ভিতর কদাচিৎ কোন ভাগ্যবানের এরূপ অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং নির্ব্বিকল্প সমাধি ভিন্ন আত্মার নির্ব্বিশেষ অবস্থা বুঝিতে পারিবে না। অন্য সমস্ত সাধনাই গুণময়ী। নির্ব্বিশেষ অবস্থা লাভ হইলেই তখন স্ত্রী-পুরুষ ভেদবুদ্ধি লোপ হইয়া যায়। তৎপূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের পরস্পর আসক্তি থাকে সুতরাং তুমিও তদ্ভাববর্জ্জিত নও। তবে তোমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক পরিণতিহেতু ঐ পত্নীভাব কমিয়া যাইবে—এরূপ হইতে পারে। তোমরা গৃহস্থ ; গৃহে স্বামী স্ত্রী একে অন্যের সংস্পর্শে আসিয়া পরস্পরের ভাব আত্মস্থ করিয়া উন্নতির পথে যায়। এরূপ বড় দেখা যায় না যে কোন নারী স্বামীকে ছাড়িয়া গিয়া কঠোর সাধনা করিতে সক্ষম হইয়াছে। স্ত্রীর দৈহিক দুর্ব্বলতা ভগবৎসৃষ্ট—সাধনা কর আর যাহাই কর, আহারান্বেষণ ত করিতেই হইবে। পুরাকালের ইতিহাসেও দেখা যায় যে ঋষিকাগণ সকলেই সব-সময় স্বামীগৃহে বাস করিয়া সাধনাদি করিতেন।

হেমলতা। তৎপরবর্ত্তী যুগে দেখা যায় যে গোপিকাগণ স্বামীগৃহে সাধনা করেন নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর। গোপীরা সাধনা করিতে যায় নাই। তাহারা রূপাসক্তি-বশে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়াছিল। আর তৎকালে সমাজবন্ধনও এরূপ দৃঢ় ছিল না। এখনও ঐ দেশে সমাজবন্ধন অতীব শিথিল।

হেমলতা। মীরাবাঈ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মীরা গিয়াছিল বটে। একমাত্র উৎকট বৈরাগ্য হইলে সর্ব্ববন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।

হেমলতা। মহাপুরুষদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদবুদ্ধি লোপ হইয়া যায়; তজ্জন্য আপনি ত আমায় একটু স্থান দিতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। না, তা পারি না। আমি শুধু আমাকে নিয়ে নয়। আমার কর্ম্মের গণ্ডির ভিতর যাহারা আসিয়া জুটিবে—তাহারা ত আর ভেদবুদ্ধিনাশের পর আমার নিকট আসিবে না।

হেমলতাদেবী কিন্তু কিছুতেই বুঝিতে চাহিলেন না—ব্যগ্রভাবে বলিলেন "আমাকে সমাজবন্ধন হইতে মুক্তি দিন—আমাকে সন্ন্যাস দিন।"

তাঁহার কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কয়েক দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, কেবলই হেমলতাদেবীর কথা তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে হেমলতাদেবীকে দেখিলেন। দেখিয়া প্রথমতঃ মানুষভাবে শিহরিয়া উঠিলেন কিন্তু গুরুভাবে চমৎকৃত হইলেন। কালধর্ম্মে সকলেরই পরিবর্ত্তন হয়। সে পরিবর্ত্তনের সূচনা কি তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের দ্বারাই সাধিত হইবে? এ যে ভগবদিচ্ছা—এড়াইবার উপায় নাই। ভারতের হিন্দুসমাজে যুগপ্রভাবে অনেক কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে বটে কিন্তু নারীদের স্থান যাবহমানকাল ধরিয়া পুরুষ একই প্রকার রাখিয়া আসিয়াছে। অতীতকালের ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় যে যুগের পর যুগ হিন্দুনারী সমাজে ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত, অপমানিত ও পদদলিত

হইয়া আসিতেছে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান ভারতে নারীজাতির চারিদিক হইতে জাগ্রত হইবার সাড়া আসিয়াছে। সুতরাং শ্রীশ্রীঠাকুরকে কলঙ্কপসরা শিরে লইয়া সমাজের আবহমান আচরিত দুর্নীতি ভাঙ্গিয়া দিয়া নারী-প্রগতির আর এক দিক উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। কলঙ্ক, অপবাদ, মান, অপমান এই নিয়েই ত সমাজ! সাধু-সন্ন্যাসীর তাতে কি আসে যায়? ভূতগ্রস্তের ন্যায় পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার কাজ করিয়া যাইতে হইবে; তাঁহার ত আর স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই যে সুবিধামত পথ বাছিয়া লইবেন। সাধুর নিন্দাস্তুতিতে কি আসে যায়? দু'দিন পরে সকলেই এই নূতন ভাব বুঝিয়া ধীরে ধীরে মানিয়া লইবে। জাতির একটা চিরন্তন ভাবধারাকে আজ সহসা একটা ধাক্কা দিতে হইবে এজন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

ভগবান বিভিন্ন দেহের ভিতর বিশেষ বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়া সামান্য সময়ের মধ্যে পূর্ব্বানুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপাদি সমস্তই পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া অতিসত্বর কলিযুগের অবসান করিয়া ভাবস্রোত ফিরাইয়া দিতেছেন। বুদ্ধদেব শ্রীকৃষ্ণগঠিত সমাজের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। শঙ্করাচার্য্য বুদ্ধের সমাজ-সংস্কারের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতিসম্পন্ন না হইয়া উহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িলেন। শঙ্করাচার্য্যের সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত প্রবুদ্ধ ভারতকে শ্রীগৌরাঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিয়া বহিরঙ্গ-ক্রিয়াতৎপর ও সর্ব্ব সৎসংস্কার-অর্জ্জনরূপ অনুষ্ঠানমূলক সমাজ সৃষ্টি করিলেন। আবার তারই ঠিক ৩৫০ বৎসর পরে আর একজন মহাপুরুষ শঙ্করের "কিমত্র হেয়ং—কনকঞ্চ কান্তা"-বাণীর পুনরাবৃত্তি করিয়া তদপেক্ষা উচ্চকণ্ঠে জগদ্বাসীকে কামিনী-কাঞ্চন দূরে রাখিয়া অদ্বৈতবা[দ] আঁচলে বাঁধিতে বলিলেন। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায় যে, এ[ই] কলিযুগের ভিতর অতিদ্রুত ভগবদিচ্ছায় ভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছে এখন নারীকে দূরে রাখিয়া সমাজের অর্দ্ধেক অঙ্গকে পঙ্গু করিয়া রাখিতে

সমাজ চলিতে পারিবে না, তাহাকেও যোগ্য আসন দিতে হইবে। তাহাদেরও মনোবিকাশের সুযোগ দিতে হইবে। অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের ন্যায্য অধিকার দেখাইয়া দিতে হইবে। এ যে ভগবদিচ্ছা——এ যে ভগবদ্বাণী! তাহাদেরও আত্মবোধ জাগরণের সময় আসিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর কৃতনিশ্চয় হইলেন—হেমলতাকে সন্ন্যাস দিবার জন্য মনে মনে স্থির সঙ্কল্প করিলেন।

৪

এইরূপে প্রায় মাসাধিক কাল চলিয়া গেল, সরকার মহাশয় আর আসিলেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে যাহাই দেখুন না কেন তাহা প্রকাশ না করিয়া হেমলতাকে তাঁহার স্বামীর নিকট পাঠাইতে চাহিলে হেমলতা তাহাতে অসম্মতি জানাইলেন বরং আত্মোৎকর্ষ করিবার নিমিত্ত সাংসারিক ও সামাজিক সর্ব্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন করিয়া তন্ত্রোক্ত সন্ন্যাস লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানাইলেন।

হেমলতা দেবীর তান্ত্রিক সন্ন্যাস—অতঃপর সন্ন্যাস দিবার জন্য সমস্ত আয়োজন ঠিক হইল। যথারীতি সংস্কারে সংস্কৃত করিবার পর সন্ন্যাস দিবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর চাহিয়া দেখিলেন, "প্রেমময়ী" হেমলতার গলদেশ ধরিয়া সন্ন্যাসের সাক্ষ্য-স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সংসারের সমস্ত সংস্কারের মূলঘাতী উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে "যোগমায়া" নাম প্রদান করিলেন। প্রেমময়ী ধীরে ধীরে যোগমায়ার দেহে বিলীন হইলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাতে সাধনার শক্তি

উদ্বোধন করিবার জন্য শক্তিসঞ্চার-উদ্দেশ্যে যোগমায়াকে স্পর্শ করিলেন। স্পর্শমাত্র যোগমায়া সংজ্ঞাহীনা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। প্রায় দুই তিন ঘণ্টা পরে যোগমায়ার বাহ্যচৈতন্য ফিরিলে তিনি বলিলেন "কেন আমায় ফিরাইয়া আনিলেন—আমি যে বেশ ছিলাম।"

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "কোথায় ছিলে ?"

যোগমায়া। তা জানি না—কোন এক অব্যক্ত মাধুর্য্যময় অবস্থায় ছিলাম। কেন আমায় ফিরাইয়া আনিলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সময়ে আবার ঐ অবস্থা আপনাআপনিই ফিরিয়া পাইবে। এখন ঐ অবস্থা আমার সংস্পর্শে আসিয়াছে কিন্তু ঐ ভাব পরিপক্বতা লাভের পর উহা তোমার নিজের ইচ্ছায়ই যখন-তখন আসিবে।

যোগমায়া। কেন এরূপ হ'ল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাপসহযোগে যেমন রসযুক্ত কোন বস্তু বা কোন তরল পদার্থ স্ফীত হইয়া উঠে, মানুষের ভিতরও তদ্রূপ রস বিদ্যমান। ঐ রস বলিতে ঠিক স্থূলভাবের রস নয়—ইহাকে আনন্দ বা ভাব বলিতে পার। কোন শক্তিশালী ব্যক্তি যদি তাহার শক্তি অন্যের দেহে চালনা করেন তবে সাময়িকভাবে গুণাবরিত বা মালিন্যমিশ্রিত ভাব স্ফীত হইয়া উঠে। এইপ্রকারে সেই ভাবটী জাগিয়ে তোলা মাত্র।

যোগমায়া। কি ভাবে আমার ভিতর এই শক্তিকে অনুক্ষণ জাগ্রত রাখিয়া ঐরূপ ভাবে ভাবিত থাকিতে পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে শক্তিবলে তোমার অধ্যাত্মভাব জাগ্রত রাখিতে পার তাহা তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত রহিয়া তোমার দৈহিক যন্ত্রকে ক্রিয়াশীল রাখিয়াছে। যদি দৈহিক সমস্ত পরিব্যাপ্ত শক্তিকে মানসিক শক্তিবলে একত্রিত করিয়া মূলাধারস্থিত শক্তির সহিত মিলিত করিয়া পরে সেই শক্তিকে সুষুম্নাপথে সহস্রারে

চালনা করিয়া পরম শিবের সহিত মিলন করাইতে পার তবেই তোমার মোক্ষলাভ—অন্যথায় পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর গতানুগতিক পথ। মনে রাখিও তুমিই সেই শক্তিরূপা মহেশানী আত্মবিভ্রান্ত হইয়া বিপথে চলিতেছিলে, এইক্ষণে তুমি এই কুণ্ডলিনীশক্তির সহিত নিজেকে অভেদ চিন্তা করিয়া সাধনায় অগ্রসর হও। তিনি এতদিন তোমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। এইরূপে প্রত্যেকের প্রতীক্ষায় তিনি প্রতিদেহে বসিয়া আছেন—সময়ে তাঁর দিকে প্রত্যেকেরই নজর পড়ে।

হেমলতা দেবীকে সন্ন্যাস দেওয়ায় কুমিল্লায় বেশ একটু চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। গৃহস্থগণ ঘটনাটী প্রীতির চক্ষে দেখিলেন না। মায়ারচিত সংসারের কেহ যে মায়াপাশ হইতে মুক্ত হউক ইহা সাধারণতঃ কোন সংসারীর অভিপ্রেত নহে। সরকার মহাশয় কুমিল্লা হইতে অন্তর্ধান করিলেও জমিদারদের যে শরিক পরোক্ষভাবে সরকার মহাশয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তিনি প্রত্যক্ষভাবে শত্রুতায় সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। এই শত্রুতার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রম ছাড়িয়া কিছু দূরে একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। জনশূন্য আশ্রমে একটী গৃহে ত্রিশূল সহ গুরুব্রহ্মের আসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের জনৈক গৃহী ভক্ত জয়চন্দ্র বিশ্বাস লোকমুখে অবগত হইলেন যে জমিদারের আদেশে আশ্রমস্থিত গুরুব্রহ্মের আসন ভাঙ্গিয়া ঐ স্থানে পায়খানা তৈয়ার করিবে এবং দুই একদিনের ভিতরেই ঐ আসন ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। শ্রীশ্রীঠাকুর একথা শুনিয়া খুবই ক্ষুন্ন হইলেন। গৃহী ভক্তদের মধ্যে তখন উপস্থিত ছিলেন যোগেন সরকার উকিল, কামাখ্যা রায় হেড্‌মাষ্টার ও জয়চন্দ্র বিশ্বাস। শ্রীশ্রীঠাকুর যোগেন সরকারকে (স্বামী যোগানন্দ) বলিলেন—যোগেন, গুরুব্রহ্মের আসন ভাঙ্গিয়া ত্রিশূলটা আন্‌তে পার? যোগেন বলিলেন—আপনার আদেশ হ'লে নিশ্চয়ই পারি। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—হ্যাঁ, আমার আদেশ।

গভীর রাত্রে তিনজনে একত্রে বাহির হইলেন। জমিদারের তরফ হইতে বা অপর কেহ যদি এদিকে আসিতে থাকে তবে যাহাতে সাড়া পাওয়া যায় তজ্জন্য আশ্রমের অনতিদূরে কামাখ্যাবাবু পাহারায় নিযুক্ত রহিলেন। যোগেন সরকার ও জয়চন্দ্র উভয়েই আসনগৃহে প্রবেশ করিলেন। অন্যের অলক্ষ্যে দিবাভাগেই জয়চন্দ্র আসনঘরের এক কোণে একটা শাবল রাখিয়া আসিয়াছিলেন। অতঃপর যোগেন গুরুব্রহ্মের আসনে প্রণাম করিলেন এবং জোড়করে নিম্নস্বরে দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, "গুরুর আদেশে আমরা এ গুরুব্রহ্মের আসন ভেঙ্গে ফেল্‌তে এসেছি। আপনারা যে যে দেবতা এই পবিত্র ত্রিশূলে অধিষ্ঠিত আছেন তাঁহাদিগকে আমি প্রণাম জানাইতেছি। আমার প্রার্থনা, আপনারা এ ত্রিশূল ত্যাগ করুন"। অতঃপর পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া যোগেন শাবল দ্বারা গুরুব্রহ্মের আসন ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং ত্রিশূল স্কন্ধে লইয়া কালভৈরবের ন্যায় ঘোর নিশীথে সঙ্গীদ্বয় সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ত্রিশূল অর্পণ করিলেন। যোগাযোগ এমনিই যে ঠিক সেই সময়ে ঢাকার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী জমিদার শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। শ্রীশ্রী-ঠাকুরকে দেখিতে আসার হেতু কি তাহা তিনি এইরূপ বলিলেন:— তিনি সম্মোহিনী শক্তি ভালরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন এবং ছেলেদিগকে যখন তখন সম্মোহিত করিয়া তাহাদের আত্ম-বিস্মৃতি ঘটাইয়া থাকেন। এইরূপ একটী ঘটনায় তাহার মনে হইয়াছে যে তিনি নিত্য সত্য ব্রহ্মবস্তু— সুখ-দুঃখের অতীত। সুতরাং এই সব বালকগণ যেরূপ সম্মোহিত হইয়া "রাম" নিজেকে "শ্যাম" মনে করিতেছে, তিনিও তদ্রূপ অবিদ্যার দ্বারা সম্মোহিত হইয়া নিজের ব্রহ্মস্বারূপ্য বিস্মৃত হইয়া অবিদ্যার ক্রীড়নক হইয়া পড়িয়াছেন। কি ভাবে এই অবিদ্যার সম্মোহন হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন, তাহা জানিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পদাশ্রয় গ্রহণ করিতে চান।

অতঃপর নরেন্দ্রবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হইলেন এবং কুমিল্লার অস্থায়ী আশ্রম উঠাইয়া দিয়া ঢাকায় লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। এদিকে তখন কুমিল্লায় জ্ঞানের বীজ বপন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত ডাক্তার নৃপেন্দ্রবাবুর বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টায় এবং নরেন্দ্রবাবুর প্রার্থনানুযায়ী শ্রীশ্রীঠাকুর কুমিল্লার আশ্রম উঠাইয়া দিয়া তাঁহার স্বগণ লইয়া ঢাকায় আসিলেন। বলা বাহুল্য, দীর্ঘদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুর যখন পুরীতে অবস্থান করিতেছিলেন তখন শত্রুভাবাপন্ন উপরোক্ত কুমিল্লার জমিদার মহাশয় নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পুরীতে আসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী ও ডাক্তার নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রভৃতির আগ্রহাতিশয্যে শ্রীশ্রীঠাকুর ঢাকায় আসিলেন। ঢাকার ফরিদাবাদ অঞ্চলে গেণ্ডারিয়ায় ডিস্‌টিলারী রোডে রামপ্রসাদ নামে জনৈক ব্যক্তির একটা বাগানবাড়ী ছিল। বাগানবাড়ীটা ভূতের বাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কেহ ঐ বাড়ীতে দুই তিন দিনের বেশী টিকিতে পারিত না। মাত্র ২০ টাকা মাসিক ভাড়ায় ঐ বাড়ীটা ভাড়া লওয়ার প্রস্তাব শ্রীশ্রীঠাকুর অনুমোদন করিলেন এবং তথায় শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ-নিকেতনের নাম দিয়া একটা আশ্রম খুলিলেন। এই ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অস্থায়ী আশ্রমের কার্য্য চলিতে থাকিল। এই সময় বহুলোক উক্ত আশ্রমে যাতায়াত করিতে লাগিল। খুব ঘন ঘন যাতায়াতে যাহাদের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইতেছিল, রাজচন্দ্র ধর তন্মধ্যে অন্যতম। শ্রীশ্রীঠাকুরের অধ্যাত্ম-বিভূতিতে তিনি ক্রমশঃ অভিভূত হইতে থাকিলেন।

রাজচন্দ্র ধর ছিলেন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার, ময়মনসিংহ জিলায় তাঁর নিবাস। তিনি স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন।

তাঁহার দুই পুত্র এবং দুই কন্যা। দুইটী পুত্রের ভিতর জ্যেষ্ঠ নরেন্দ্র তখন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তাঁহার সংসারবৈরাগ্য বাড়িতে থাকিল। একদা তিনি তাঁহার হৃদয়ের ইচ্ছা সরলভাবে ব্যক্ত করিলেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর যদি আশ্রয় দেন তবে ডাক্তারী ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারেই তিনি সাধুজীবন যাপন করিবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর চিন্তা করিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে তাঁহাকে যে কর্ম্মের সূত্রপাত করিতে হইবে, এই ডাক্তারের পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের দ্বারাই তাহার কিয়দংশ পরিপূরণ হইবে। এরূপ অস্থায়ীভাবে আশ্রম পরিচালনা সুবিধাজনক হইয়া উঠিবে না। জীবমাত্রেরই একটী নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানের প্রয়োজন আছে সুতরাং একটী ভাল স্থান দেখিয়া সেখানে যদি গৃহাদি নির্ম্মাণ ও আশ্রম স্থাপন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় খোলা যায়, তাহা হইলে এই এক পরিবারের দ্বারাই শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ও আদর্শানুযায়ী তিনটী উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে।

প্রথমতঃ রাজচন্দ্র নিজে ডাক্তার; সুতরাং কোন আশ্রম স্থাপন করিলে ডাক্তারের প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাকে আশ্রয় দিলে তাঁহার দুই পুত্রকে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে পাওয়া যাইবে। তৃতীয় অভাব পূরণ যাহা হইবে তাহা এই যে, যোগমায়া দেবীকে যখন আশ্রয় দিয়াছেন তখন তাঁহার পক্ষে একাকী কোন আশ্রমে থাকা অপেক্ষা অনাথা, দুঃস্থা ও অসহায়া হইয়া যাহারা ধর্ম্মপথে জীবন যাপন করিতে চায়, তাহাদের লইয়া একটী স্ত্রী-বিভাগ খুলিলে তাহারা তথায় অবস্থান করিয়া সাধন-ভজন করিতে পারিবে। সুতরাং রাজচন্দ্রের স্ত্রী ও তাহার শিশু কন্যাদ্বয় ঐ বিভাগ পূর্ণ করিবে। কন্যাদ্বয় বড় হইলে শিষ্য সেবক দেখিয়া বিবাহ দিলে চলিয়া যাইবে। অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি অনুসারে ডাক্তারী ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া রাজচন্দ্র ধর সপরিবারে আশ্রমভুক্ত হইলেন এবং ক্রমেই বৈরাগ্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে

লাগিলেন। এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া রাজচন্দ্র ধরের শ্যালক যোগেন সরকার উকিলও শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। এই যোগেন সরকার উত্তরকালে স্বামী যোগানন্দ নামে পরিচিত।

এই সময় অপর যে যুবকটি শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাঁহার নাম মোহিনী মোহন চক্রবর্ত্তী। মুর্শিদাবাদ জেলার ভগীরথপুরে তাঁহার নিবাস। মৃতদার এই যুবক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী বোধানন্দ নামে পরিচিত হন। ব্রাহ্মণবংশের আভিজাত্যবোধ তাঁহার এত প্রবল ছিল যে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে সন্ন্যাসগ্রহণের দিনে তাঁহাকে বারটী জাতির উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিয়া পূর্ব্ব আভিজাত্যবোধ নষ্ট করিতে হইয়াছিল।

আশ্রমে ক্রমশঃ লোকের সংখ্যা বেশী হইয়া পড়ায় বেশী স্থানের প্রয়োজন হইয়া পড়িল। অল্প টাকায় বেশী স্থান হইতে পারে এইরূপ একটি স্থানের কথা এক সময় সরুরাম নামে আসামবাসী জনৈক শিষ্যের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুর অবগত হইয়াছিলেন। সরুরাম শিবসাগর জেলার জোরহাট মহকুমার অধিবাসী। সে চট্টগ্রামে আসাম বেঙ্গল রেলের ষ্টোর্স বিভাগে চাকুরী করিত। কুমিল্লায় অবস্থানকালে সে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিত। সুতরাং শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে সংবাদ দিয়া আনিয়া আসাম সরকার যে সমস্ত পতিত জঙ্গলাকীর্ণ জমি বন্দোবস্ত করিতেছেন তাহা হইতে কিছু জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইতে সরুরামের নিকট ৪০০৲ টাকা দিয়া তাহাকে আসামে পাঠাইলেন।

এই সময় ঢাকায় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিপত্তি বেশ প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে। নানাস্থান হইতে তিনি আহূত হইতে থাকিলেন। মাণিকগঞ্জের মোক্তার শ্রীযুক্ত রজনীমোহন বসাক মহাশয় একদা তাঁহাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া যান। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রজনীবাবুর

বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে আসিলেন। স্থানীয় কালীবাড়ীতে মাস-মাহিনায় রামকমল ভট্টাচার্য্য নামে জনৈক কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। মাণিকগঞ্জ হরিসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আগমন উপলক্ষ্যে উক্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তন শ্রবণে শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবস্থ হইয়া ভাবমুখে বলিলেন—"কে আমায় কোল দিবে, এস।" তখন সেই কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা হইয়া যে কেহ শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্পর্শ করিতে থাকিলেন তিনিই তৎক্ষণাৎ ভাবস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এইরূপ কয়েক ব্যক্তি বর্ত্তমানে স্বনামধন্য হইয়া পড়িয়াছেন সুতরাং তাঁহাদের নাম করিয়া তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত জন্মাইতে ইচ্ছা করি না। অপর ব্যক্তিদের মধ্যে একটী ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ রায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে তদবস্থায় স্পর্শ করামাত্র ৩।৪ ঘণ্টাকাল সংজ্ঞাহীন অবস্থায় অবস্থানের পর তাঁহার ভাবোন্মত্ত অবস্থা আইসে। পাছে তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি হইয়া যায় এই ভয়ে স্থানীয় লোকজন বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়ে। যাহা হউক শ্রীশ্রীঠাকুর পুনরায় তাহাকে স্বভাবে আনয়ন করেন। সাময়িকভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহস্পর্শে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া যাইবার হেতু ইতিপূর্ব্বে পাঠক যোগমায়া দেবীর সন্ন্যাস-প্রসঙ্গে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে এরূপ বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া যাওয়াটা শুধু জীবন্ত-বৈদ্যুতিক আধারবৎ (living battery) সাধুর জাগ্রতশক্তির সংস্পর্শে আসা। সুতরাং ঐ প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ঐ দিন কীর্ত্তনের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর রামকমল ভট্টাচার্য্যকে স্পর্শ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এখন হতে কীর্ত্তন আপনার সাধনা বলে মনে করুন।" ইহার পর হইতেই তাঁহার ভিতর কীর্ত্তন-সঙ্গীতের অসাধারণ প্রতিভা স্ফুরিত হয়।

রজনী বসাককে বলিয়াছিলেন, "আপনি আমার কাছে কি চান বলুন। আপনি আমার কাছে যা চাইবেন আমি আপনাকে তাই

দিতে পারি।" রজনী বসাক তখন বলিয়াছিলেন, "আমি টাকা চাই।" ঠাকুর বলিলেন "তাই হবে।" কিন্তু ইহার ২ দিন পরে রজনীবাবু অপ্রত্যাশিত ভাবে রাজফুলবাড়িয়া আসিয়া ঠাকুরকে বলেন, "সেদিন আপনার কাছে যা চেয়েছিলাম, তা ভুল চেয়েছি। আমি টাকা চাই না, ভগবান্ চাই।" তখন ঠাকুর বলিলেন, "সেদিন যা বলেছিলাম তা ব্যর্থ হবে না। তবে বর্ত্তমানে আকাঙ্ক্ষার পরিবর্ত্তনে যতটা টাকা পাওয়ার কথা তার চেয়ে কিছু কম পাবেন। আর এই জন্মে ভগবান্ লাভ হবে না। সামনের জন্মে আপনার অভীষ্ট পূর্ণ হবে।" উত্তর-কালে এই রজনীবাবু ঢাকেশ্বরী কটন মিল্‌স্‌এর অন্যতম ম্যানেজিং ডিরেক্টার হইয়া প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। সেই কীর্ত্তনের সময় কামাখ্যা রায়েরও জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।*

শ্রীশ্রীঠাকুরের মাণিকগঞ্জে আগমনে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বেশ একটু ধর্ম্মোৎসাহ লক্ষিত হইল। তাঁহার ঐশ্বরিক ভাব দর্শনে লোক এতই মুগ্ধ হইয়াছিল যে তৎকালীন প্রসিদ্ধ দৈনিক সংবাদপত্র "বেঙ্গলী"র স্তম্ভে প্রায়ই তাঁহার অসাধারণ যোগৈশ্বর্য্যের কথা প্রকাশ হইত। অতঃপর মাণিকগঞ্জ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঢাকায় অবস্থান কালেই শ্রীশ্রীঠাকুর "তান্ত্রিকগুরু" ও "প্রেমিকগুরু" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

শান্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠা—শ্রীশ্রীঠাকুর ঢাকায় প্রায় একবৎসর অতিবাহিত করিলেন। এদিকে সরুরাম কর্ত্তৃক আসাম প্রদেশের শিবসাগর জেলার অন্তর্গত জোড়হাট মহকুমায় কিছু জমি খরিদ করিয়া তথাকার কতকাংশের জঙ্গল কাটিয়া একখানি বড় ঘর তৈয়ারী হইলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার দলবল লইয়া আসামে গমন করেন। ব্রহ্মপুত্র নদের অনতিদূরে প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্যকেন্দ্রে বঙ্গাব্দ ১৩১৯ সালে বৈশাখ মাসে

* ঢাকার ভক্ত শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্রমের নাম দিলেন "শান্তি আশ্রম।" কারণ পরাশান্তিই সাধুজীবনের একমাত্র কাম্য। পরে এই শান্তি আশ্রমই **"আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ"** নামে পরিচিত হইয়াছে, ইহা আমরা যথাস্থানে দেখিতে পাইব।

প্রাথমিক অবস্থায় এই লম্বা বড় ঘরখানিকে কয়েকটা ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া হয়। এই খড়ের ঘরের এক কামরায় অতুল চক্রবর্ত্তী নামে একজন সেবক পাক করিতেন। অতুল চক্রবর্ত্তী অবিবাহিত, সংসারবিরাগী; তিনি গৃহীও নহেন, সন্ন্যাসীও নহেন। ব্যবহারিক, সাংস্কারিক বা আনুষ্ঠানিক কোন বেশের ধার তিনি ধারিতেন না। তিনি কেবলমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানিতেন। তখন সেবকরূপে চিদানন্দ, স্বরূপানন্দ, প্রেমানন্দ, যোগানন্দ, বোধানন্দ, রমাপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠে ছিলেন। সে সময়ে এই সব গুরুভক্ত সেবকের আহার্য্য ছিল কলমিশাক, লাউ ও ভাত। প্রতি তৃতীয় দিবসে ডাল হইত। যেদিন ডাল হইত—অল্পবয়স্ক বালক সেবক নরসিংহ ও অন্যান্যরা আনন্দে নৃত্য করিত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহে জগন্মাতার আবির্ভাব—এই সময়ে যেখানে-সেখানে অনিচ্ছাকৃত ভাবে তাঁহার বিভূতিসকল বিকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল তাহাতে তাঁহাকে অনেক বিড়ম্বনা—মর্ম্মান্তিক বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছে। এই বিড়ম্বনার কথা কিছুটা স্বামী যোগানন্দজী লিখিয়াছেন[১]—

১৩১৯ সনের ২রা আশ্বিন শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে ও চিদানন্দদাদাকে লইয়া আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ (তখন শান্তি আশ্রম) হইতে যাত্রা করেন। পরদিন গৌহাটীতে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান ও জলযোগাদি সমাপন করতঃ বৈকালের গাড়ীতে রওনা হইয়া ঠাকুর ভোরে তিস্তা ষ্টেশনে

১। ১৩৪৯ সালের আশ্বিন সংখ্যা আর্য্যদর্পণ অবলম্বনে।

অনুকূলদাদার (শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায়) ওখানে বিশ্রামার্থে অবস্থান করিলেন। অপরাহ্ণে সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের অনুরোধে ঠাকুর ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্রনগর ষ্টেশনের সহকারী ষ্টেশনমাষ্টারের ব্যাকুলতায় অনেক প্রকার ধর্ম্মালাপ হইল; সন্ধ্যায় হঠাৎ ঠাকুর ইজিচেয়ারে বসিয়াই ভাবাবিষ্ট হইলেন এবং আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভাবসমাধিস্থ হইয়া যেন অস্ফুট স্বরে কাহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন—দুই চারিটী কথা বোধগম্য হইল। তাহাতে আমরা সিদ্ধান্ত করিলাম, তাঁহার দেহে জগন্মাতার আবির্ভাব হইয়াছে। আশ্রম সম্বন্ধে এবং ভক্তবৃন্দের সম্বন্ধে যেন কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। ঘণ্টাখানেক পর ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইলেন।

এখানে ২ দিন থাকিয়া ৫ই আশ্বিন ঠাকুর ১২টার গাড়ীতে আলিপুরদুয়ারে আসিলেন। শ্রীতারাপ্রসন্নবাবুর বাটীতে কথাপ্রসঙ্গে নির্ব্বাণ-মুক্তি সম্বন্ধে বলিলেন। পরদিন রাত্রে শিবদয়াল পালের বাটীতে ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমে কীর্ত্তন করি। যখন মাতৃবিষয়ক কীর্ত্তন চলে তখন ঠাকুরের ভাবসমাধি হইল। তিনি শবাসনে চিৎ হইয়া শুইয়া রহিলেন। মাতা যেন তাঁহার হৃদয়োপরি বসিয়া কথোপকথনে রত। সুদীর্ঘকাল এইভাবে চলার পরে সেদিন মাতা চলিয়া যান।

৮ই আশ্বিন কীর্তন আরম্ভ হইলে কিছুকাল পরে ঠাকুর ভাবাবেশে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি, চিদানন্দদাদা ও আরও দু'এক জন হাত ধরাধরি করিয়া একটি বেষ্টনী করিলাম। বেষ্টনীর মধ্যে ঠাকুর উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। যখনই পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয় তখনই তাঁহার ভাবাবিষ্ট দেহখানি আমাদের হস্তবেষ্টনীতে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ স্থির হয়। তিনি ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া আকাশপানে কি যেন দেখিয়া আনন্দিত হন—আবার ভাবাবেশে নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন।

তাঁহার জটার ন্যায় চুলগুলি ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে উত্থিত ও পতিত হইয়া যেন অপূর্ব্ব আনন্দতরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছিল। আমরাও যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সেই নৃত্য-ভঙ্গিমা দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু হঠাৎ একটী দুর্ঘটনাতে সকলেরই আনন্দোচ্ছ্বাস বিষাদ-সিন্ধুতে বিলীন হইয়া গেল। সেই দুর্ঘটনাটী নিম্নে বর্ণিত হইল।

ঠাকুর যখন ভাবাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন, তখন স্থানীয় কতকগুলি ব্যক্তি (প্রায় ১০।১২ জন হইবে) ঠাকুরের পা সজোরে ধরিয়া রাখিল, কিছুতেই তাহারা পা ছাড়িল না। আমাদের পুনঃ পুনঃ নিষেধ তাহারা অগ্রাহ্য করিল। ঠাকুর যতই পা ছাড়াইতে চেষ্টা করিলেন, ততই লোকগুলি আরও জোরে পা ও হাঁটু চাপিয়া ধরিল। পরে অবগত হই যে,সমাধি অবস্থায় পা চাপিয়া ধরিলে নাকি বিশেষ ভাবে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত হয়। যাহা হউক ঠাকুর হুঙ্কার দিয়া সজোরে পা ছাড়াইয়া লইলেন এবং ধ্বস্তাধ্বস্তিতে পড়িয়া গেলেন। তখন সেই লোকগুলি পুনরায় তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল ; তখন ঠাকুর যেন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং অনায়াসে ১০।১২ জন লোককে পায়ের ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং চিৎকার করিতে করিতে কীর্ত্তনের অঙ্গন পরিত্যাগ করিয়া রাস্তাতে ছুটিতে লাগিলেন ; আমারাও তাঁহার পেছনে পেছনে ছুটিলাম। তিনি আর চলিতে না পারিয়া সড়কের মধ্যস্থলে বসিয়া পড়িলেন এবং চিৎকার করিয়া আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন— "চেলাগিরি করিতে এসেছিস্, আমাকে মেরে ফেলেছে। তোদের মুখ দেখিতে ইচ্ছা হয় না।" আবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "আমার আজ কি ভাবই নষ্ট হইয়াছে! আজ মা আসিয়াছিলেন— আমার দেহ ধরিয়া নাচিতে চাহিয়াছিলেন—আমি একটু জায়গা দিতে পারিলাম না। তিনি রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন ; ঊর্দ্ধপানে চলিয়া গেলেন। সবদিন ত নীচ দিয়া যান, আজ ঊর্দ্ধপানে কেন গেলেন ?

তবে বুঝি আর আসিবেন না ; আমার এ দেহ দ্বারা আর কি হইবে ? আমার কেন মৃত্যু হইল না !" এই সকল উক্তি করিয়া আকুল ক্রন্দন করিতে করিতে কখনও রাস্তায় বসিয়া পড়েন, আবার কখনও বা উঠিয়া দৌড় দেন। এইরূপ করিতে করিতে ডাকঘর অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। কখন বা বুকে কিল দিতে লাগিলেন, কখনও বা মাথার চুল ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। এই প্রকার উন্মাদনার অবস্থায় মাথায় তড়িৎ উঠিয়া তিনি রাস্তায় পড়িয়া গেলেন ; তখন আমরা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাসায় আনিলাম। বারান্দায় বিছানা কবিয়া তাড়াতাড়ি শোয়াইয়া দেওয়া হইল এবং পাখা করিতে লাগিলাম। তাঁহার শরীর ধূলায় ধূসরিত হইয়াছে। তিনি শয়ন করিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলাম। মাথায় জল দেওয়া হইল, হাত দুইটি যথাক্রমে উপরদিকে ও নীচের দিকে উঠাইতে নামাইতে লাগিলাম। তখন কতকগুলি উদ্গার হইয়া পেটের বায়ু কিছু কমিল, চোখে জলের ঝাপ্‌টা দেওয়া হইতে লাগিল। এইরূপে দুই ঘণ্টার পর তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। তখন বলিতে লাগিলেন—"আজ আমার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া যাইত—কেননা ভাবের উন্নত অবস্থায় কুণ্ডলিনী সহস্রারে চলিয়া যায়, ক্রমে তিনি নামিয়া আসেন। কিন্তু আজ তিনি নামিতে পারেন নাই—সুতরাং এইরূপ অবস্থায় অনেকের দেহত্যাগ হইয়া যায়। আজ গুরুগিরি বাহির হইয়া যাইত।" আমাদেরও এই ব্যাপারে বেশ শিক্ষা হইল ; আমরা সংকল্প করিলাম, ভবিষ্যতে বাজে লোককে কোন প্রকার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না।

* * * পূর্ব্বরাত্রের ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া ঠাকুর পরদিন আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন—"কাল মা আসিয়াছিলেন—আলিপুর ধন্য হইয়া যাইত—অর্ধেক লোকের সমাধি লাভ হইত।……যোগ-

সমাধি সহজেই আনা যাইতে পারে, কিন্তু ভাব-সমাধি কঠিন—কেননা উহা ইচ্ছা করিলেই হয় না। সমাধির প্রথম অবস্থায় আবেশকারী ও আবিষ্ট পৃথক্ থাকে কিন্তু সমাধির পরিপক্ক অবস্থায় উপরোক্ত দুই ভাবই এক হইয়া যায়। তখন পা ছুঁইলে ক্রিয়া (শক্তিসঞ্চার) হইলে হইতে পারে, কিন্তু প্রথম অবস্থায় সেরূপ কিছু হয় না।"

* * * ১০ই আশ্বিনের কীর্ত্তনে স্থানীয় মোক্তার রসিকবাবুরও ভাবসমাধি হইয়াছিল—তিনি দেখিয়াছিলেন ঠাকুর নিজ শরীরকে অতি বৃহৎ করিয়া বিরাট মূর্ত্তিতে যেন দাঁড়াইয়া আছেন। * * * ১৩ই আশ্বিন রবিবার স্থানীয় ডেপুটী এবং মুন্‌সেফ যতীনবাবু দিনে ও রাত্রে ঠাকুর-দর্শনে আসেন। যতীনবাবু খৃষ্টান হইলেও ঠাকুরের নিকট যোগশিক্ষা করিয়াছিলেন। * * * ঠাকুর যে-সকল বাটীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই সকল বাটীর কেহ কেহ তাহাদের বাটীতে গভীররাত্রে নূপুরধ্বনি, কোথাও বা ঘুঙ্গুরশিঞ্জনাদি শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও বিমোহিত হইয়াছিলেন। জগন্মাতা সাক্ষাৎভাবে যেন ঠাকুরের দেহ এবং ভক্তবৃন্দের দেহাদি আশ্রয় করিয়া লীলানন্দ করিয়াছিলেন। সেই অপরূপ লীলা দর্শনে ও শ্রবণে আমরাও যেন নবজীবন লাভ করিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইয়াছিলাম।

ঠাকুর অতঃপর সরাসরি মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তাঁহার ঘরে অর্গলাবদ্ধ হইয়া রহিলেন।

শান্তি আশ্রমের বিবরণ—১৩২০ সালের দামোদর-অজয়-রূপনারায়ণের বন্যায় কেনারাম, ঈশ্বর, বিমলা প্রভৃতি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাহাদের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আশ্রমের সেবকবৃন্দ ও অতিথি-অভ্যাগত লইয়া প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন লোক দুই বেলা আহার করিত। এক সের

ডাল এতগুলি লোকের জন্য প্রতি তৃতীয় দিবসে বরাদ্দ ছিল। রান্নার জন্য ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে ভাসমান কাষ্ঠ শীত গ্রীষ্ম উভয় কালেই ধরিয়া আনিতে হইত। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ হইত পাঁচটী ব্যঞ্জনে—যথা কোন তরকারি, সিদ্ধ, ডাল, একটু ঘি, দুধ ও দুই চামচ ভাত। এতেই তাঁহার জন্য প্রায় ৭০৲ টাকা মাসিক খরচ হইত. একদা হিসাব করিয়া দেখা গেল। তখন বোধানন্দ কোনক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের গোচরে আনিলেন যে এই ৭০৲ টাকার কিছু কম খরচ করা যায় কিনা। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর প্রকাশ করিলেন যে তাহাদের নিকট হইতে তাঁহার ভোগ বাবদ তিনি এক পয়সাও লইবেন না। তাঁহার যে কথা সেই কাজ। অতঃপর মৈমনসিংএর অন্তর্গত ধীতপুরের জমিদার দেবেন্দ্র রায় মাসিক ২৫৲ ও নগেন্দ্র রায় মাসিক ৫৲ এবং অন্যান্য ভক্তগণের নিকট হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের জন্য মাসিক প্রায় ১০০৲ টাকা করিয়া আসিতে লাগিল। এদিকে আশ্রমে সন্ন্যাসী হইয়াও বোধানন্দ ব্রাহ্মণেতর জাতির স্পৃষ্ট অন্ন খাইতে চাহিতেন না। তজ্জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর ব্রাহ্মণেতর জাতির সেবক কয়েকটিকে সন্ন্যাস দিবেন স্থির করিয়া তাহাদিগকে সন্ন্যাস দিলেন। তখন হইতে এক এক জনকে এক এক দিন পাক করিতে হইত। বোধানন্দ, স্বরূপানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ, সারদানন্দ, চিদানন্দ ও অতুল চক্রবর্তী এই ৭ জন সেবক আশ্রমের প্রাথমিক অবস্থায় মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিলেন।

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে হাওয়া করিতে হইত। তালের বড় বড় পাখা ঐ দেশে পাওয়া যাইত। তাহাতে হাওয়া করা সুবিধা হইত না বলিয়া যোগানন্দ নিজ হাতে একখানি টানা পাখা তৈয়ারী করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জুতা ছিঁড়িয়া গেলে যোগানন্দ নিজেই কোন রকমে উহা সেলাই করিতেন কারণ ওখানে মুচী পাওয়া যাইত না। ক্রমে আশ্রমের রূপান্তর হইতে থাকিল। খড়ের ছাউনির পরিবর্ত্তে এখন টিন দেওয়া হইতে থাকিল। ওখানে তখন ছুতোর পাওয়া যাইত

না। সন্ন্যাসীরা নিজেরাই ঐ সব করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাঠের পায়খানা মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া পড়িত। যোগানন্দ নিজেই কাঠ ও টিন লাগাইয়া ঠিক করিতেন। একদা যোগানন্দ টিন দিয়া ঘর ছাইতেছেন —ঠিক এমনি সময়ে যোগানন্দের মা মঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাহার উকিল পুত্র সন্ন্যাসী হইয়া এখানে মঠের ঘরের চালে উঠিয়া টিন আঁটিতেছেন। তখন তাঁহার মা তাঁহাকে ঐরূপ কাজ করিতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—"তুই কি এইজন্য এখানে এসেছিস ?" মঠের তখনকার কাজই ছিল শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা আশ্রমকে গড়িয়া তোলা। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া রাত্রে শুইয়া পরদিন কি কাজ করিতে হইবে সেই চিন্তা। ঘুমের ভিতর ঐ কর্ম্মেরই স্বপ্ন। এক বৎসর এইরূপ কাজ করিবার পর যোগানন্দ একদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিলেন—ঠাকুর, বাড়ীতে থাকাকালীন কিছু কিছু সাধন-ভজন করেছি। এখানে ত কেবল শারীরিক পরিশ্রম করছি। সুতরাং ইহার দ্বারা কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে ? শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"তুমি যে কাজ করছো, এ কাজের ভিতর তোমার কোন আসক্তি আস্‌তে পারে না। কারণ তুমি আজ এখানে আছ, কাল নাও থাকতে পার। কাজেই এ সব নিষ্কাম কর্ম্ম। এই নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা জন্ম-জন্মান্তরের মলিনতা দূর হয়ে চিত্তশুদ্ধি হবে। তাতে তোমরা সাধন-ভজন না করেও যে কোন মুহূর্ত্তে ভগবানের কৃপা পেতে পার। গুণক্ষয় নিয়ে কথা। পূর্ব্বকালে গুরুর গরু চরিয়েও সেবকেরা ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞানের অধিকারী হয়েছে।"

যোগানন্দ প্রভৃতি বুঝিলেন যে গুরুর আশ্রমে কোদাল মারাই তাহাদের সাধন-ভজন। তখন হইতে তাঁহাদের উৎসাহ ফিরিয়া আসিল। শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া আবার তাঁহাদের অনাবিল আনন্দ চলিতে লাগিল অভাব-অভিযোগের দিকে দৃষ্টি নাই। অবসর সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া সবাই অভিনয় করিতেন। শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধদেব, বিল্বমঙ্গল, রাজারাম

প্রভৃতি নাটকে শ্রীশ্রীঠাকুর নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন। কখনও কখনও শ্রীশ্রীঠাকুরকে রথে বসাইয়া ঐ রথ টানা হইত। রথখানি মৈমনসিংহ হইতে ঢাকায় আনা হয়। আবার ঢাকা হইতে মঠে আনা হয়। অতঃপর মুর্শিদাবাদের ভক্তদের নিকট হইতে আহ্বান আসিল শ্রীশ্রীঠাকুরকে তথায় যাইতে হইবে। তথাকার ভক্ত কালী সান্যাল ও ননী সা শ্রীশ্রীঠাকুরকে মুর্শিদাবাদে থাকিবার জন্য খাগড়ায় একখানি বৃহৎ আটচালা ঘর বাঁধিলেন—মেঝে তার সিমেণ্ট দিয়া পাকা করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুর্শিদাবাদ যাওয়ার দিন স্থির হইল। চিদানন্দ, যোগানন্দ ও দীনেশকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর মুর্শিদাবাদে আসিলেন। গঙ্গার এপার-ওপার হইতে বহুলোক শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। উত্তরকালে যিনি শুদ্ধানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছেন তিনিও আসিয়া জুটিলেন। একদা তত্রত্য জজ, সবজজ ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে আসিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একখানি আরাম কেদারায় বসিয়াছিলেন। সম্মুখে একখানি তক্তপোষ ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইজি চেয়ারখানি নীচু ছিল এবং তক্তপোষখানি উঁচু থাকায় তাঁহারা উহাতে বসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—উঁচু নীচুতে কিছু আসে যায় না। বানর খুব উঁচু ডালে থাকে কিন্তু মানুষ নীচেই চলাফেরা করে, তাতে কি বড় ছোট হয় অথবা উহাতে অসম্মান দেখান হয়? উঁচু নীচু আসনে মান-অপমানের প্রশ্ন আসে না। তখন সবাই হাসিতে হাসিতে তক্তপোষে বসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিলেন। এইরূপে খাগড়ার আনন্দবাজারের মধ্যে তিনি এক মাস অবস্থান করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর খাগড়ায় আসিয়াছেন—এ কথা লোকমুখে তাঁহার জন্মভূমি কুতবপুরে পৌছিল। গঙ্গাস্নান যোগের উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের খুল্লতাত যুধিষ্ঠির ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্য অনেকে এখানে আসিয়া জন্মভূমি কুতবপুর একবার যাইবার জন্য অনুরোধ

করিলে শ্রীশ্রীঠাকুর অগত্যা যাইতে সম্মত হইলেন। খাগড়ায় আশ্রম করিবার যে প্রস্তাব কালী সান্ন্যাল ও ননী সা করিয়াছিলেন ও তদ্দরুন বহু ব্যয়ে আটচালা ঘর বাঁধিয়াছিলেন—অতঃপর ঐ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল কারণ তাঁহারা কেবলমাত্র ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন কিন্তু মাসিক ব্যয় বহন করিতে প্রস্তুত হইলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মভূমি দর্শন—অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুর জন্মভূমি দর্শনের জন্য যাত্রা করিলেন। পলাশী ষ্টেশন হইতে বরাবর গরুর গাড়ীতে মাতামহের বাড়ী রাধাকান্তপুরে পৌছিলেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের মাথায় পাগড়ী ছিল। তাঁহার মাথায় পাগড়ী দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্ব্বাশ্রমের মাতামহী আনন্দোল্লাসে চীৎকার করিতে থাকিলেন—ওরে তোরা দেখে যা আমার নলিনী রাজা হয়েছে—ওরে তোরা দেখে যা।

তাহাদের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। দুদিন সেখানে অবস্থান করিয়া জন্মভূমি কুতবপুরে নৌকাযোগে রওনা হইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে বোধানন্দ, যোগানন্দ, চিদানন্দ, সুরেন (শুদ্ধানন্দ) ও দীনেশ, এই কয়জন সেবক ছিলেন। তন্মধ্যে দীনেশই সর্ব্বকনিষ্ঠ। 'অর্দ্ধকালী' বংশীয় দীনেশ ভট্টাচার্য্য ময়মনসিংহ জেলা-নিবাসী এবং কলেজের ছাত্র। সে ডাঃ রাজচন্দ্র ধরের ডিস্‌পেনসারীতে শুইত এবং কালিদাস গুহের বাটীতে খাইত। এই ভাবেই সে পড়াশুনা করিত এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাহার বড় ভাল লাগিত বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে মাঝে মাঝে ঘুরিত। রাধাকান্তপুরে দীনেশের জ্বর হয় এবং ঐ জ্বর নিয়াই নৌকাযোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কুতবপুরে রওনা হয়। নৌকা কুতবপুরের ঘাটে লাগিল। লোকে লোকারণ্য—বহু সংকীর্ত্তনের দল আসিয়াছে শ্রীশ্রীঠাকুরকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইয়া যাইতে। শ্রীশ্রীঠাকুর

অবতরণ করিলেন কিন্তু পরক্ষণেই অন্যের অলক্ষ্যে সমাধিস্থ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া সংকীর্ত্তনদল কীর্ত্তন করিতে থাকিল। বহুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাহ্য চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। তখন বোধানন্দ ও চিদানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধরিয়া ধীরে ধীরে লইয়া চলিতেছেন, আর কীর্ত্তনদলও সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। দীনেশ নৌকায় রহিয়াছে, তাহাকে ফেলিয়া যাওয়া যায় না সেজন্য যোগানন্দ ও সুরেন (শুদ্ধানন্দ) তাহাকে ধরিয়া সংকীর্ত্তনের দলকে পিছনে রাখিয়া শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দিলেন।

পূর্ব্বাশ্রমে যাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের পরমাত্মীয় ছিলেন এখন তাঁহারা তাঁহাকে আত্মীয় না ভাবিয়া সম্ভ্রমজ্ঞাপক ভাব দেখাইতেছে। বাটীস্থ স্ত্রীলোক যাহারা তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া তাহারা অন্তরালে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে দেখিয়া লইতেছে—পাছে শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাদিগকে দেখিয়া ফেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যেন একেবারে অপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ীতে অতিথি। পূর্ব্বাশ্রমে যাঁহারা নলিনীকান্তের প্রণম্য ছিলেন এখন তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্বেচ্ছায় ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেছেন। যাঁহারা নলিনীকান্তের সম্পর্কে ভ্রাতৃবধূ হইতেন এখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাঁহারাও ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতেছেন। জন্মভূমিতে অবস্থানকালে বহু আত্মীয়স্বজন ও দেশবাসী তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্ব্বাশ্রমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপদ চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শে এতই অনুপ্রাণিত হইলেন যে তিনি তরুণ যৌবনে বিবাহিত জীবন যাপনে সংসারে যে সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন তাহা সহসা ভাঙ্গিয়া গেল। আজ দ্বাদশ বৎসর যিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি আজ স্বেচ্ছায় গৃহে আসিয়াছেন। তাঁহার আগমনে আত্মীয়-স্বজন গ্রামবাসী ও দেশবাসীর মনে একটা অভিনব ধর্ম্মভাবের প্রবাহ, উৎসাহ ও ঔৎসুক্য

লক্ষিত হইতেছে। কি জানি কেমন তিনি দেখিতে। রাস্তাঘাট বাড়ী সব পরিষ্কার হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর গ্রামে পদার্পণ করিলে গ্রামবাসিগণ সংকীর্ত্তন দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া গৃহে লইয়া গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাদের গ্রাম প্রদক্ষিণ করিলেন। জন্মভূমিতে আসিয়া শুনিলেন তাঁহার পিতা বহুদিন হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থান কালে প্রতিদিনই সংকীর্ত্তনদল কীর্ত্তন করিত। শ্রীশ্রীঠাকুরেব প্রায়ই সমাধি আসিয়া যাইত। যখন কীর্ত্তন অন্তর্ম্মুখীন হইত, বিশেষতঃ যোগানন্দ কীর্ত্তনে যোগদান করিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহজেই সমাধি আসিত। এদিকে দীনেশের জ্বর ছাড়ে না বরং রোগের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

•

দীনেশের গুরুনিষ্ঠা—ছয় সাত দিন পরে দীনেশের পূর্ব্বজন্মস্মৃতি জাগিয়া গেল। প্রত্যহই শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে দেখিতে আসিতেন। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর যখন দেখিতে আসিলেন, তখন দীনেশ তাঁহাকে "দাদা" সম্বোধন করিয়া বলিল, "দাদা এসেছ?" এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর সেবকদিগকে বলিলেন—"দীনেশ এই বাড়ীরই শরতের ছেলে—২২ বৎসর আগে সে মারা যায়। এই সেই দীনেশ, বয়সও কুড়ি। এর জাতিস্মরত্ব আসা ভাল নয়। তা'তে আমার সঙ্গে ওর গুরু-শিষ্য সম্পর্কের হানি হবে। কাজেই আমি কয়েকদিন দেখা দিব না। ওর যখন আমাকে দেখবার জন্য ব্যগ্রতা আসবে তখন বুঝবে যে আমার উপর টান পড়েছে এবং পূর্ব্বস্মৃতি নষ্ট হয়েছে।" তার পরদিন দীনেশ বলিল—"আমাকে মাটিতে বিছানা করে দাও—আমি খাটে শোব না।" অতঃপর তাহাই করা হইল। ডাক্তার রোজ দেখিতেছেন, ঔষধ দিতেছেন কিন্তু রোগের কোন উপশম হয় না। একদিন দীনেশ বলিল—"শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখবার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে।" যোগানন্দ বলিলেন—"বেশ তু!

আমি ঠাকুরকে জানাচ্ছি।” বেলা তখন প্রায় ন’টা। শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়া দাঁড়াইতেই দীনেশ শিবনেত্র হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। তরুণ যুবক দীনেশের মন স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল—সেখানে বাসনার দ্বন্দ্ব নাই—বিষয়তৃষ্ণার তাগিদ নাই—আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলন নাই—সংস্কারের সঙ্কীর্ণতা নাই। তার মানসমুকুরে যাঁহার ছাপ পড়িয়াছে—যাঁহাকে সে সবচেয়ে সুন্দর দেখিয়াছে—যাঁহার রূপে ও, রসে সে মজিয়া আছে—তিনি স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুর।

সে বলিল—ঠাকুর! তুমি আর আমি—মাঝে কেউ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হ্যাঁ—তাই।

দীনেশ। তোমার ডান পাখানি আমার বুকের উপর তুলে দাও।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাই করিলেন। দীনেশ দু’হাতে পা ধরিয়া রাখিল। দীনেশ চোখ মেলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে লাগিল—সৌম্য স্নিগ্ধ স্মিত বয়ান, কুটিল-কুন্তল-মণ্ডিত-মৌলি, কৃপা-কাতর প্রেমারুণ নয়নের অজস্র স্নেহধারা বর্ষণে যেন উন্মাদ। চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল দীনেশ—দেখার যেন শেষ নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—দীনেশ, তুমি আমার এই অবস্থার মূর্ত্তি ধ্যান কর। আর কোনও চিন্তা করো না। আমি এখন যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর পা তুলিয়া লইলেন। দীনেশ হাত জোড় করিয়া শ্রীশ্রী-ঠাকুরকে দর্শন করিতে লাগিল।

সেদিন সন্ধ্যার পর চণ্ডীমণ্ডপে কীর্ত্তন হইতেছে। সে রাত্রে মাতৃ-সঙ্গীত চলিতেছে। যোগেন দীনেশের সেবায় নিরত আছেন। দীনেশ তখন বলিল—দাদা, তুমি আমাকে বাইরে নিয়ে চল।

যোগেন—সে কি! বাইরে নিয়ে যাব—তুই কি পাগল?

দীনেশ। ঐ যে মা এসেছেন। ঘরের ভেতর ঢুকছেন না—নোংরা ঘর। তোমার পায়ে পড়ি।

দীনেশকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া যোগেন বারান্দায় লইয়া গেলেন। দীনেশ ভূমিষ্ঠ হইয়া মাকে যেন প্রণাম করিয়া পড়িয়া রহিল। এইভাবে কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিবার পর দীনেশ বলিল—দাদা, আমাকে এখন ঘরে নিয়ে চল—মা চলে গেছেন। যোগেন দীনেশকে ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলেন। রাত্রি ১২টার পর দীনেশের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়িল, নাড়ী বসিয়া গেল। ডাক্তার আসিলেন, তিনি নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, কোন আশা নেই। ঘণ্টা দুয়েকের ভেতরেই মারা যাবে।

যোগেন শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—কি খবর?

যোগেন ডাক্তারের সমস্ত কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করিলে শ্রীশ্রী-ঠাকুর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে কোন কথা বলিলেন না। তারপর বলিলেন—যাও, ভয় নেই। শুয়ে থাক গে। আজ মরবে না। কাল একটার পর মারা যাবে। এসব বিষয় কাউকে বলবে না।

দীনেশের নাড়ীর স্পন্দন পুনরায় দেখা দিল। পরদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে সবারই আহারাদি একটার ভিতর শেষ হইল। বেলা একটা থেকে দুটার ভিতর শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিতে তাহাকে ধরাধরি করিয়া তুলসী-তলায় লইয়া যাওয়া হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর একটা চৌকিতে বসিলেন এবং চারজন সেবক চারপাশে দাঁড়াইলেন। গ্রামের বহুলোক তখন আসিয়া পড়িয়াছে। দীনেশ শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিল। শ্রীশ্রীঠাকুর সেবকদিগকে বলিলেন—দীনেশকে নিতে এসেছে জ্যোতির্ম্ময় দেহধারীরা। দীনেশের সূক্ষ্মদেহ একটা জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ ক'রে তাদের সঙ্গে নিজ ধামে চলে গেল।

দীনেশের দেহ চতুর্দ্দোলা করিয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল।

একটা চিতা (গুরুমার চিতা) দেখাইয়া দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—এখানে মাটী খোঁড়। ওকে পোড়ান হবে না। আমরা সবাই ওকে

মাটী দিব। ৪ হাত গভীর গর্ত্ত খোঁড়া হইল। যে ভাবে সে শায়িত ছিল, সেই ভাবেই তাহাকে গর্ত্তমধ্যে রাখা হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথমে মাটী দিলেন, পরে উপস্থিত সকলেই তাহাকে মাটী দিলেন। তারপর শৃগালে যাহাতে সমাধিস্থল না খুঁড়িতে পারে তজ্জন্য বাবলা কাঁটা দিয়া উহা ঘিরিয়া দেওয়া হইল। এইভাবে ১১ দিনের মধ্যে দীনেশকে বিদায় দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া নিজ সেবকসঙ্গে কলিকাতায় রওনা হইলেন।

আলিপুরদুয়ারে শ্রীশ্রীঠাকুর—কলিকাতায় দুই একদিন অবস্থান করিয়া অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুর আলিপুরদুয়ারে রওয়ানা হইলেন। আলিপুর-দুয়ারে শিবদয়াল পাল মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের নানাভাবে ঐশ্বর্য্য বিকাশ হইতে থাকিল। কখনও কখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের চতুর্দ্দিকে নূপুরধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। কীর্ত্তনাদি শ্রবণে শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবস্থ হইয়া পড়িতে থাকিলেন। বিশেষতঃ যোগানন্দের সঙ্গীত শ্রবণে শ্রীশ্রীঠাকুরের দীর্ঘস্থায়ী সমাধি হইয়া যাইতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের এইরূপ ভাব-বিকাশ অবস্থা দর্শনে বহু লোক দীক্ষা গ্রহণ করিল। যাহারা দীক্ষিত হইল তন্মধ্যে প্রকাশ ঘোষ অন্যতম। প্রকাশ ঘোষ তাহার হাতের গলিত কুষ্ঠ গোপন করিয়া দীক্ষিত হইয়াছিল। সে বলিল—ঠাকুর, ভবব্যাধির উপায় হইল, এবার এই কুষ্ঠ ব্যাধির উপায় কি? তারপর সে এক গামলা জল আনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণামৃত করিয়া ঐ জল সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিতে লাগিল—"সর্ব্ব রোগ হর গুরু"।

বলা বাহুল্য কয়েকদিনের মধ্যেই প্রকাশ ঘোষের কুষ্ঠ নিরাময় হইল কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর সেবকগণের উপর বিরক্ত হইলেন, কারণ কে কি উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহার কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করিতেছে, তাহা তাহাদিগের দেখা কর্ত্তব্য। অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুর বগুড়া হইয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বরূপ—তীব্র কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার ফলে একই আধারে সাত প্রকার বিভিন্ন সাধনায় সিদ্ধির ফল আসিয়া পড়িয়াছিল ; কোন সাধকের যে কোন একটার সিদ্ধির ফলে জীবন মধুময় ও ধন্য হইয়া যায়। আর একই আধারে এতগুলি সিদ্ধির প্রভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের যোগাগ্নিময় শরীরের প্রাকৃত অংশ পুড়িয়া ক্ষার হইয়া গিয়া সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত অবস্থা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তবুও নিজের স্বরূপের কথা তিনি স্বেচ্ছায় কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই। বিভিন্ন প্রকার লোকের প্রশ্নের উত্তরপ্রসঙ্গে ভাবমুখে কখনও কখনও নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কিয়দংশ এখানে পরিবেশিত হইল।

"এই দেহের ভিতরই আমার চিন্ময় দেহ আছে—আমি সেই চিন্ময় দেহ লাভ করেছি। আমি স্থূল দেহধারী হলেও যুগপৎ কেন্দ্র এবং পরিধির জ্ঞান আমার আছে। আমি এই দেহে থেকেও ব্রহ্ম।" (১)

* * *

"তোমরা মনে কর পরাশর, বিশ্বামিত্রের চেয়ে আর কেউ বড় হতে পারে না। কত ব্যাস, বশিষ্ঠ, পরাশর এই দেহে লীন হয়ে আছে, তাদের জীর্ণ করে ফেলেছি অর্থাৎ তাদের সমস্ত জ্ঞানরাশি তো আয়ত্ত করেছিই—তা ছাড়াও আরও কিছু জানি।" (২)

* * *

"ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্—তিনটাকে এক চোঙ্গায় এককালে দেখা যায়। এ না করতে পারলে পূর্ণ জ্ঞানই হয় না। আর ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্—এই

১, ২—শ্রীশ্রীনিগমানন্দের জীবনী ও বাণী।

তিনটাকে এক সঙ্গে যুগপৎ দর্শন করতে হলেই তিনের উপরে অর্থাৎ দ্রষ্টার আসনে বস্‌তে হবে। আমি একসঙ্গে ব্রহ্ম আত্মা ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেছি। আমি যুগপৎ তিনটাতেই প্রতিষ্ঠিত আছি। আমাকে ধরলে তোমাদের ভিতর ব্রহ্ম আত্মা ভগবানের জ্ঞান আপনা হতে ফুটে উঠ্‌বে।" (৩)

* * *

"আমাকে ধরে থাক শুধু।" (৪)

* * *

"জান না কি—আমি নির্গুণ সন্ন্যাসী—গুণ ও শক্তির তোয়াক্কা রাখি না। আমি জ্ঞান ও ভক্তির সাধক। গুণের সংস্পর্শে আমার গুরুত্ব অন্তর্হিত হবে। তাই গুরুকরণ সম্বন্ধে শাস্ত্র বিশেষ আজ্ঞা দিয়াছেন। এই জন্যই মুমুক্ষু ব্যতীত সংসারীর সন্ন্যাসী-গুরু করিতে নাই।" (৫)

* * *

"তোমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য—তাই আমার নিকট আসিয়াও তোমাদের আধ্যাত্মিক দৈন্য গেল না।" (৬)

* * *

"আমাকে বিশ্বাস করিয়া নিজের হৃদয়স্থ জানিয়া ভয় ত্যাগ করিতে অভ্যাস কর।" (৭)

* * *

"গুরুই গৌরাঙ্গের স্বরূপ।" (৮)

* * *

"জীব মাত্রেরই আত্মার পরিচয় আমার নিকট প্রকাশিত।" (৯)

৩, ৪—শ্রীশ্রীনিগমানন্দের জীবনী ও বাণী।

৫, ৬—ঠাকুরের চিঠি ১ম খণ্ড। ৭, ৮ ৯—ঠাকুরের চিঠি, তৃতীয় খণ্ড।

"আমি যে মৃত্যুর সময় সকলের কাছে উপস্থিত থাকি—সে কিন্তু আমি কিছুই করি না—আমার শক্তিতে সব হয়ে যাচ্ছে। আমি সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।" (১০)

* * *

"তোমাদের প্রত্যেকের উপর আমার শক্তির লক্ষ্য আছে। গুরুকে ভালবাস্‌লে শক্তি তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন।" (১১)

* * *

"আমার আবার গুরু কে? আমিই গুরু। আমি কে তা আমি জানি। বরং ঈশ্বর কে—তা তিনি জানেন না।" (১২)

* * *

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন—একটু কিছু বিভূতি দেখ্‌লেই লোকে তাকে অবতার বল্‌তে থাকে। কিন্তু অবতার যখন আসেন তখন তা কেউ জানতে পারে না। অবতার নানা প্রকার। অংশ অবতার—কলা অবতার—যুগাবতার প্রভৃতি। এঁরা সবাই সাময়িক প্রয়োজনে অবতীর্ণ হন কোন দেশের অধোগতি রোধ করতে—দেশের নিম্নগতির মোড় ফিরিয়ে দিতে। এঁরা যে-সব আদর্শ দেখিয়ে যান তা সাময়িক। কালক্রমে এঁদের প্রভাবও ম্লান হয়ে যায়—এঁদের কথা তখন আর কেউ বলে না—তাঁদের কেউই মানে না—এরূপ এমন অনেক অবতার আছেন যাঁদের কথা ভারতে এখন আর কেউ বলে না।

আর এক আছে পূর্ণব্রহ্ম অবতার—তাঁর আদর্শ পূর্ণ আদর্শ—কখনও ম্লান হবে না। পূর্ণব্রহ্ম অবতার স্বয়ং ভগবানের। ধরায় মানুষরূপে লীলা করা—তাঁর পরশ দেবার জন্য, যাতে পরশমণির সংস্পর্শে সব সোনা হয়ে যায়। এ সমস্ত লীলা-অনুধ্যান লোককল্যাণকর।

১০, ১১—শ্রীশ্রীনিগমানন্দের জীবনী ও বাণী।

১২—শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-কথা-সংগ্রহ ১ম খণ্ড।

পূর্ণব্রহ্ম অবতার যেন সমুদ্র—আর অংশ কলা অবতার যেন তরঙ্গ, ঢেউ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা—যদিও সমুদ্র ও তরঙ্গ স্বরূপতঃ সব এক। এ জগতে আলো দিতে সূর্যকে আসতে হয় না, কিরণ এলেই যথেষ্ট। তবে তিনি আসতে পারেন, আলো দিতে নয়—ছদ্মবেশে একটু বেড়িয়ে গেলেন—আনন্দ ক'রে গেলেন—কেউ জানতে পারলো না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে এসেছিলেন—জনসাধারণ বুঝেছিল তিন পুরুষ পরে—রামচন্দ্রকে বুঝেছিলেন ভরদ্বাজাদি ১২ জন ঋষি—শ্রীচৈতন্যকে বুঝেছিলেন সাড়ে তিন জন। মাধবী দাসী স্ত্রীলোক কিনা, তাই আধ জন ধরা হয়েছে।

আমাকে অবতার ব'লে আজকাল কোথাও কোথাও ঢাক পিটান হচ্ছে, প্রচারপত্র ছাপান হচ্ছে—পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রচারপত্র বিলি করা হচ্ছে—এর আমি তীব্র প্রতিবাদ করেছি। আমি অবতার নই—সাধনসিদ্ধ সদ্‌গুরু। এক অদম্য কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার বশে আমি ভারতীয় হিন্দুসাধনশাস্ত্রের বিভিন্ন সাধনায় পরীক্ষামূলক ভাবে ব্রতী হ'য়ে প্রতি সাধনায় সিদ্ধ হয়েছি বলেই অন্যান্য সদ্‌গুরুগণ অপেক্ষা নানা সম্প্রদায়ের অনেক বেশী লোককে পথ দেখিয়ে দিতে পারছি। আগেও বলেছি—এখনও বলছি—আমি জীব-জগৎকে খুব ভালবেসে ফেলেছি। তাই পাপী-তাপী, বিষয়ী-অবিষয়ী, গৃহী-সন্ন্যাসী, স্ত্রী-পুরুষ, পচা-ধসা-গলা—সবাই আমার দুয়ারে এসেছে—কাউকে নিরাশ হ'য়ে ফিরতে হয়নি। আর এরাই এসেছে আমার কাছে বেশী—আর এদেরই ত দাবী বেশী—আমি যে সার্ব্বভৌম গুরু!

* * *

আমি যখন ভাবস্থ হয়ে থাকি, আমি যখন ভিতরে ডুবে যাই—আমার ব্যষ্টি সত্তা যখন সমষ্টিতে—ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায়—যখন আমি আমার স্বরূপ উপলব্ধি করি—তখন তাঁকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে

পাই না। তিনিই আমি—নিত্য সত্য নিরঞ্জন—অক্ষয় অব্যয়রূপে দেখি—শাশ্বত পুরুষ—নিত্যলোকের পুরুষ বলে দেখি। তোমাদের সবারই ভিতর আমাকেই দেখি—তোমাদের দেহ আমার দেহ—তোমাদের দেহ শুদ্ধ কর, পবিত্র কর—তোমরা সেখানে আমাকে প্রতিষ্ঠিত দেখবে। আমি ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—এই তিনেই যুগপৎ প্রতিষ্ঠিত আছি।

বামদেব বলেছিলেন—অহং মনুরভবম্—সূর্য্যশ্চেতি; স্বরূপ অনুভূতিতে এই দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়। কোন কোন সুফীরও এই দৃষ্টি খুলে গিয়েছিল। তোমাদের স্বরূপও সেই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বলার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। আগে আগে প্রাতে শয্যা থেকে উঠে লোকে বলতো—অহং দেবো ন চান্যাস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্। এখন দেশকাল সব অন্য প্রকার হয়ে গেছে—কালের প্রভাব।

এই ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে তাঁহার নিজের স্বরূপের কথা মাঝে মাঝে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার জীবনের শেষের দিকে গুরু ও শিষ্য-ভক্তের মাঝে যে ব্যবধান তাহা তাঁহার আর ভাল লাগিত না। আসনঘরের বাহিরের দেওয়ালে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধক ও সিদ্ধ জীবনের যে-সব লোটা কম্বল চিমটা সহ গেরুয়াধারী বা ন্যাংটো ফটোসমূহ ঝুলান ছিল, সে-সব সরাইয়া ফেলিয়া মাত্র প্রেমিকগুরুরূপী ফটো টাঙ্গাইয়া রাখিতে সেবকদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'; মানুষের চেয়ে দেবতা বড় নয় বলিয়া তিনি দেবতাদের ফটোগুলি খুলিয়া সেইস্থানে শঙ্কর গৌরাঙ্গের ফটো টাঙ্গাইতে বলিয়াছিলেন। কারণ দেব-দেবী পূজার সংস্কারাচ্ছন্ন উপাসকগণ মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে কোন ধারণাই করিতে পারে না।

সাত প্রকার সিদ্ধির ফলে শক্তি তাঁহার এতই আয়ত্তে আসিয়াছিল যে তিনি তাঁহার সমস্ত অধ্যাত্ম বিভূতি এবং ঐশ্বর্য্য ভিতরে টানিয়া লইয়া

সাধারণ মানুষের মত সকলের সহিত মিশিয়া থাকিতেন। তার কারণ এই, সাধারণ ভাবে তাঁহাকে ভালবাসিয়া কেহ যদি উদ্ধার হইয়া যায়। তিনি তাঁহার স্বরূপ গোপন করিয়া সাধারণের সঙ্গে একস্তরে দাঁড়াইতে চাহিয়াছিলেন কারণ তিনি জীবজগৎকে বড়ই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। অধ্যাত্ম-বিভূতিসমন্বিত থাকিলে লোকে ভয়ে দূরে সরিয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় তিনি সর্ব্বপ্রকার বিভূতি সংবরণ করিয়াছিলেন। তিনি যে-সত্য দর্শন করিয়াছিলেন—তিনি যে-ভাবসম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন—সেই সত্য ও আনন্দ সবাইকে পরিবেশন করিয়া তৃপ্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—"শিষ্য করা সদ্‌গুরুর ব্যবসা নহে—প্রাণের প্রেরণা। শিষ্যহৃদয়ে শ্রীভগবানের বিকাশ দেখিবার আশাতেই গুরু শিষ্যের ভার গ্রহণ করেন।" (১)

বহু লোকের ভিতর দিব্যভাব বিলাইয়া দিবার জন্য তিনি স্বরূপ গোপন করিয়া অতি সহজ ভাবে—সাধারণ ভাবে দিব্য জীবনের সংস্পর্শে সবারই ভিতর দিব্যভাব বিকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই দিব্য জীবন সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"আমি জীবজগৎকে খুব ভালবেসে ফেলেছি। সকলের সঙ্গে মিশে আমি এক হয়ে গেছি। * * * প্রাণ খুলে কথা বল্‌ব এমন কাউকে পাই না। এতে কি আমার কম দুঃখ? চিরকাল গুরুগিরি ক'রে আমি কি কেবল শ্রদ্ধার আসনে ব'সে তোদের কাছ থেকে দূরে দূরে থেকে যাব? গুরুগিরি—এ ত উপাধি মাত্র। এই নিদারুণ বোঝা থেকে কবে যে নিষ্কৃতি পাব আমি! আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে। তোরা আমায় একটু ভালবাসতে শেখ্‌।" (২)

"গুরুগিরি অবস্থা সবচেয়ে সেরা অবস্থা নয় কিন্তু, এর উপরেও আর একটি উচ্চ অবস্থা আছে। গুরুগিরি অভিনয়ের মোহও একদিন ভেঙ্গে

(১) ঠাকুরের চিঠি ৩য় খণ্ড। (২) শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-উপদেশামৃত

যাবে। আজকাল আমার আর গুরুগিরিতেও স্পৃহা নেই। গুরুগিরি ক'রে লোকের উপকার করব এও একটি অভিমান।" (৩)

"আমি ভালবাসার কথাই প্রচার করতে চাই। আমার শিষ্য-ভক্তদের মাঝে সাধন-ভজন ক'রে কেউ তেমন কিছু পায়নি—যা কিছু পেয়েছে আমাকে ভালবেসে। সুতরাং ভালবাসাই হ'ল আসল।" (৪)

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই ভালবাসার বিস্তৃতি স্ত্রী-পুরুষের ভেদবিচার ছিল না। পশুপাখী, বৃক্ষলতা, তৃণ ও গুল্মকে পর্য্যন্ত তিনি ভালবাসায় জড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। কাশী-গম্ভীরায় অবস্থানকালে আসাম মঠে লিখিয়াছিলেন—দধিরাম নামে যে রোগীটি সেবা বিভাগে আছে তার যেন অযত্ন না হয়। মঠের উদ্যানের মধ্যে সান্ধ্যভ্রমণের সময় বলিতেন "এই তৃণ গাছপালা আমাকে কি কথা বলে, কি জানাতে চায়—তা আমি জানি।" গৌহাটীতে অবস্থানকালে—পুষ্পভারে আনত কামিনী ফুলগাছকে জড়াইয়া ধরিয়া কতই না চুম্বন করিয়াছিলেন। সুখশ্রাব্য সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় নিজেকে বিস্মৃত হইয়া পুরুষ-নারীভেদবিচারহীন হইয়া যে কোন ভক্তকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। ফণীবাবু প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার প্রতি বন্ধুর ন্যায় আচরণ করিতেন। কোন কোন ভক্ত তাঁহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন—'মা' বলিয়া পত্রাদি লিখিতেন। তাঁহারা বলিতেন—ঠাকুর, তোমাকে "মা" বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার এই অপ্রাকৃত দেহের ভিতরে প্রেমের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার লুকান ছিল—যাহা স্ফুরণের কখনও কোন বাধা মানে নাই। তাঁহার কাছে সবই ছিল সুন্দর—সবই প্রীতিময়—এক মহা আনন্দসাগরে আনন্দময় জীব-জগৎ। সুতরাং তাঁহার ভাবধারার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কোন কোন সন্ন্যাসী-শিষ্য সেইভাবে চলিতে পারিলেন না। তাঁহারা তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিলেন না। অনেকে সমাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে সন্ন্যাসী

(৩), (৪) শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-উপদেশামৃত।

হইয়াছিলেন। সুতরাং যে ব্যবহারিক জ্ঞান তাঁহাদের ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে তাহার অভাব ছিল। কারণ শ্রীশ্রীঠাকুরের লোকচরিত্র ও সমাজ-নীতি প্রভৃতি কিছুই জানা ছিল না। তাঁহার ভিতর যখন যে প্রেরণা আসিত তাহাকে তিনি সত্য বলিয়া মনে করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন—"আমি যখন প্রথম সমাজে গুরুগিরি করতে এলাম—তখন আমার লোকচরিত্র ও সমাজনীতি এ সব জ্ঞান আদৌ ছিল না। যত এদের সঙ্গে মিশছি ততই আমার ওসব শিক্ষা হচ্ছে। এক সময় নীলরতন ব'লে আমার একটি শিষ্য এসে আমায় অনুরোধ করল যে আমি তার স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে মঠে কিছুদিন রেখে শিক্ষা দেই। তার ছুটী ছিল না সেজন্য সে নিজে আসতে পারবে না। আমি তখন বাংলায় ভ্রমণে যাচ্ছি। তাকে বললাম—ফিরে আসার সময় তাকে নিয়ে আসব; সে যেন লামডিং ষ্টেশনে এনে তার স্ত্রীকে পৌছে দেয়। আসার সময় তাকে খবর দিলাম, সেও সেইমত করলে। পরে তিন চার মাস থাকার পর যখন কাশী গেলাম, তখন পুনরায় লামডিং থেকে নীলরতন তাকে নিয়ে গেল। এতে নাকি বড়ই নিন্দাবাদ রটলো। লোকে আমারও নিন্দা করতে লাগল, আর নীলরতনকেও নিন্দা করলে। আমি তো এর স্বরূপ বুঝতে পারলাম না। স্ত্রীর ইচ্ছা যে সে মঠে এসে কিছুদিন থেকে সৎশিক্ষা লাভ করে। স্বামীরও তাতে অনুমোদন আছে। ঐকান্তিক ইচ্ছা জানিয়ে সে অনুরোধও করলে। এতে কি দোষ হলো। পাঠালে গুরুর সঙ্গে। থাকলো গিয়ে অনাথ আশ্রমে মেয়েদের সঙ্গে। লোকে এই ব'লে নিন্দা করতে লাগলো যে নীলরতন ব্যাকুব; সে যুবতী স্ত্রীকে একলা পাঠিয়ে দিলে। আর 'আমার বিবেচনাই বা কি' এই ব'লে আমায় নিন্দা করতে লাগলো। এই কথা নিয়ে আমার অনেক প্রিয় শিষ্যদের সঙ্গে নিন্দুকরা বাক্‌বিতণ্ডা করেছে। তাতে তাদের নাকি মন খারাপ হয়ে গেছে। তারা কেউ কেউ বিশেষ

করে বগুড়ার সুরেন, হরপ্রসাদ প্রভৃতি শিষ্যরা আমায় বললে, 'ঠাকুর! লোকে নিন্দা করে, আমাদের প্রাণে লাগে।' লোকে ত তাদের মন দিয়ে বিচার করবে। আমি কথামালার বাপ বেটা ও ঘোড়ার দৃষ্টান্ত দিয়ে বললাম—'লোকের মতামতের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করা আমার দ্বারা হবে না। বিশেষতঃ লোকমতের দিকে চেয়ে কাজ করতে গেলে ঐ কথামালার গল্পের মতো হবে। আমি যা ভাল বুঝব, তাই করব, এতে যার ভাল লাগবে সে আমার কাছে আস্‌বে। আর কেউ না এলেও দুঃখ নেই'।"*

৬

মঠ প্রতিষ্ঠা করিতে যাইবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের এক অধ্যাত্ম-বিভূতি-সমন্বিত মূর্ত্তি লক্ষিত হইত তাহা যেন এ-জগতের নয়। মানুষ বলিতে যাহা কিছু সব যেন মরিয়া গিয়া যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা শুধু গুরুটুকু। তাঁহার তৎকালীন সে গুরুভাব শিষ্যভক্তদিগের নিকট সহজবোধ্য ছিল। তাঁহার উপদেশাবলী একই প্রকার অর্থবোধক ছিল এবং সমুদয় কার্য্যের সহিতও বেশ মিল থাকিত। তিনি শিষ্যভক্তদের উপর সহানুভূতি ও প্রীতিসম্পন্ন হইয়া তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগে তাহাদের বাসনা কামনার মূলোৎপাটন করিয়া যাদুদণ্ডস্পর্শে লৌহকে স্বর্ণ করিয়া ফেলিবার ন্যায় যাহাতে তাঁহার উপর আস্থাবান হয় তাহা করিতেন।

---

* শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী-প্রণীত "শ্রুতিস্মৃতি"।

কাশীতে গম্ভীরা নামক আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থিতি—
দেড় বৎসর মঠে থাকিবার পর যখন মঠ হইতে কুম্ভমেলায় যাইবার উদ্দেশ্যে কাশীধামে আসিয়া কিছুদিনের জন্য গম্ভীরা নামক আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তখন যেন তিনি এক অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া লোকলোচনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বীয় শক্তিপ্রভাবে গুরুভাব ঢাকিয়া রাখিয়া শুদ্ধসত্ত্বময় মানুষভাবে অবস্থান করিতে থাকিলেন। আত্যন্তিক সরলতা হেতু তাঁহার ব্যক্তিগত বাহ্যিক ব্যবহারিক জীবন রহস্যময় হইয়া পড়ায় অনুগত সেবকদিগের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িতে লাগিল। পূর্ব্বে সবাইকে একপ্রকার উপদেশ দিতেন, এখন বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন ভাবের উপদেশ দিতে থাকিলেন এবং কোন কোন সময় তাঁহার উপদেশাবলী বহু অর্থবোধক হওয়ায় হেঁয়ালির মত বোধ হইতে থাকিল। শিষ্য-ভক্তদের বাসনা-কামনাবিদগ্ধ মানসিক অবস্থা দর্শনে স্থূলদৃষ্টিতে তদ্বিষয়ে তাঁহার ঔদাসীন্য ও প্রীতিশূন্যতার পরিচায়ক বলিয়া সবার মনে হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের এতাদৃশ পরিবর্ত্তন ও অবস্থা দর্শনে সবার মন সন্দেহ ও সংশয়ে উদ্বেলিত হইতে লাগিল। সংশয় না হইবারই বা কারণ কি? মানুষ ত আর দেবতা হইয়া জন্মায় নাই যে তাহাতে সন্দেহ সংশয়ের লেশমাত্র থাকিবে না। অর্জ্জুন, পরীক্ষিৎ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগে বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত সবাইকে দেখিতে পাই যে প্রত্যেকেই সংশয়-সন্দেহের দাস। সাধারণ মানুষের ভিতর যাহাদের পশুত্ব কম তাহারা বিচার করে, বিচারে যাহা টিকে তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার নিজের ভিতরটার উপর বাহ্যিক আবরণে এইরূপ ভাবে ঢাকিয়া ফেলিলেন যে তাঁহার স্বরূপ সাধারণের দুর্ব্বোধ্য হইয়া দাঁড়াইল। "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য" কথাটী এরূপ কঠোরভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে খাটি হইতে লাগিল যে তাঁহার

অতি নিকটতম শিষ্যভক্তগণও মাঝে মাঝে তাঁহার দুর্ব্বোধ্য স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া অবসন্ন হইতে থাকিলেন। কি সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ শিষ্যগণ সবারই মন ভিতরে ভিতরে বিরূপ হইতে থাকিলেও কেহ কোন কথা তাঁহাকে বলিতে সাহস করিল না। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সহিত অবাধ সংমিশ্রণ হেতু গৃহীগণ নিজেদের অবস্থানভূমি হইতে বিচার করিয়া তাঁহাকে "ভোগমুখী" এবং সন্ন্যাসীগণ "ত্যাগের আদর্শের হানিকর" বলিয়া চীৎকার করিল বটে কিন্তু আবার আর এক শ্রেণীর গৃহীগণের ভিতর শত শত লোক তাঁহার বাহ্যিক ঐশ্বর্য্য কিছু দেখিল না, কিছু বিচার করিল না, আপন ইচ্ছায় তাঁহার চরণতলে লুটিয়া পড়িতে লাগিল। কেন পড়িল কেহ তাহার যুক্তি দিতে পারিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বরূপের দুর্ব্বোধ্য বহিরাবরণ—অনেকে ভাবিল সাধারণ লোকের সহিত তাঁহার পার্থক্য কোথায়? রাজপরিবার-ভুক্ত নবীন যুবকের ন্যায় তাঁহার বেশভূষা; শয্যাগারের পারিপাট্য ধনী বিলাসী যুবকের শয্যাগৃহের ন্যায়। সাধনাদি দিতে স্ত্রী-পুরুষ বিচার করেন না; তাঁহার এমন কোন বিধিনিষেধও নাই যে স্ত্রী ত্যাগ করিয়া গৃহের বাহিরে না আসিলে সাধনা হইবে না। তীর্থস্থানের অপ্রশস্ত মন্দিরের ভিতর গিয়া লজ্জাসঙ্কোচহীন হইয়া নারীগণ যেমন পরপুরুষের সহিত এক সঙ্গে দেববিগ্রহ দর্শন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করে, তদ্রূপ অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দু ললনাগণ যাহারা কোনদিন পরপুরুষের মুখ হয়ত জীবনে দর্শন করে নাই, এই বিংশশতাব্দীতে যাঁহারা স্থানান্তরে যাইতে হইলে রেলষ্টেশনে দেহরক্ষীর পাহারায় পর্দ্দানশীন অবস্থায় যাতায়াত করেন—এমন কি গঙ্গাগর্ভেও তদ্রূপ অবস্থায় স্নান করেন—ঐরূপ নারীগণও অবাধে লজ্জাসঙ্কোচহীন দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত নিতান্ত বালকের ন্যায় ভগবদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য পায়ে ঠেলিয়া সন্ন্যাসমার্গ লইয়া তাঁহাকে সেবা করিতে

উদ্‌গ্রীব ব্যক্তিগণকেও শ্রীশ্রীঠাকুর জোর পূর্ব্বক গৃহে রাখিলেন। কি যেন এক মোহময় আকর্ষণে জনসাধারণ তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। কিন্তু কেহ ভালবাসিয়া অথবা বিশ্বাস করিয়া যে তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিতে লাগিল তাহা নয়। চুম্বক দেখিতে লৌহের মত, কিন্তু প্রকার-ভেদ আছে; লৌহ অবশ হইয়া চুম্বকে আকৃষ্ট হইয়া তৎসংলগ্ন হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট লোক ঠিক তদ্রূপভাবে আসিতে লাগিল। কেহ তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিল এ কথা বলা যায় না। যেখানে সন্দেহ বা দেনা-পাওনারূপ শিষ্যের প্রার্থনা আছে সেখানে ভালবাসার অবকাশ নাই। ভালবাসা লোককে এক করিয়া ফেলে, ভালবাসা একত্বজ্ঞাপক। যদি তাহারা ভালবাসিয়াই থাকিবে তবে তাহাদের মনে রং ধরিল না কেন? সূর্য্যের সহিত অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের বিকর্ষণ থাকিলেও সূর্য্যের প্রবল আকর্ষণে যেমন গ্রহগণ গ্রহরাজ সূর্য্যের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রাম্যমাণ, শ্রীশ্রীঠাকুরও এইরূপভাবে শিষ্যসেবকগণে পরিবৃত হইয়া থাকিলেন। কেহ তাঁহাকে ত্যাগ করিল না বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহাদের মন দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। এইসময় শ্রীশ্রীঠাকুর কাশী গম্ভীরায় অবস্থিতি করেন।

এইস্থানে কয়েকমাস অতিবাহিত করিয়া অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুর কুম্ভে যোগদান উপলক্ষ্যে হরিদ্বার যাত্রা করেন। পূর্ব্ব হইতেই বাসা ঠিক করা হইয়াছিল। হরিদ্বারে কুম্ভমেলা বার বৎসর অন্তর বসিয়া থাকে। হরিদ্বারে কুম্ভ বলিতে কন্‌খল, হরিদ্বার ও হৃষীকেশব্যাপী স্থানে সাধু-সম্মিলনীকেই বুঝায়। হরিদ্বার কুম্ভযোগের সাধুসম্মিলনীর কোনরূপ বিবরণ দেওয়া মৎসদৃশ ব্যক্তির পক্ষে বড়ই দুরূহ ব্যাপার। বিনা আহ্বানে যোগ উপলক্ষে এরূপ বিরাট সাধুসম্মিলনী জগতের আর কোথায়ও দেখা যায় না। ভারতে যে এরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত লক্ষ লক্ষ সাধু পাহাড়-জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া ভগবানের বিভিন্ন ভাব লইয়া

কিভাবে অবস্থান করেন তাহা লেখনীমুখে কি প্রকারে বুঝাইব? যাহা হউক শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

"১৩২১ সালের কুম্ভে বহু সাধুসন্ন্যাসীর সমাবেশ হইয়াছিল। এর ভেতর কে সিদ্ধ সন্ন্যাসী এই কথা জানার জন্য চট্টগ্রামবাসী একজন ব্রাহ্মণ তিন দিন ধন্না দিয়ে পড়ে থাকে। পরে প্রত্যাদেশে সে দু'জনের নাম পায়, আমার আর গণপৎ গিরি ব'লে একজন সিদ্ধপুরুষের। সে সিদ্ধ সন্ন্যাসীর নাম উল্লেখ করতে বলেছিল কিনা, তাই শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীর মধ্যে দুজনের নাম উঠল, নতুবা সেখানে গম্ভীরনাথ বাবা, নেপালী বাবা—এ সব সিদ্ধ মহাপুরুষও ছিলেন। উক্ত কুম্ভের সময় সেই লোকটী এসে একদিন আমায় এ কথা বল্লে।"*

১৩২১ সালে কুম্ভে কয়েকজন প্রসিদ্ধ সাধু আসিয়াছিলেন। তাঁহারা স্থানে স্থানে নিজ নিজ শিষ্যসেবক লইয়া আস্তানা করিয়াছিলেন। উক্ত কুম্ভে গম্ভীরনাথ বাবা, বড়হজের মহাপ্রভু অনন্তানন্দজী ও হৃষীকেশের নেপালী বাবা কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুর কিরূপ ভাবে সমাদৃত হইয়াছিলেন তাহা প্রত্যক্ষদর্শী শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা পণ্ডিত ক্ষেপাদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লিখিত নিম্নে উদ্ধৃত পত্রে অবগত হইবেন :—

"জয়গুরু"

১১।১।৩১ ইং

২৫, ল্যান্সডাউন রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

শিশিরদা,

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী লিখিবার ভার পাইয়াছ এবং তজ্জন্য আমার নিকট হইতে কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহের আশা করিয়া অনেকদিন

* শ্রীশ্রীনিগমানন্দের জীবনী ও বাণী।

হইতে আমাকে স্বয়ং বাচনিক, পত্রদ্বারা এবং লোক পাঠাইয়া তাগাদা করিয়া কিছুই না পাইয়া এখন বোধ হয় খুব বিরক্ত হইয়া আমার উপর রাগ করিয়াছ। অবশ্য তুমি রাগ করিতে পার এবং রাগ করিলে তাহা অন্যায় হইবে না ইহা তোমার পক্ষ হইতে আমিই বলিতেছি, কিন্তু আমার পক্ষ হইতেও একটু বলিতেছি যে আমার বর্ত্তমান অবস্থায় আমি এখন তোমাদের দয়ার পাত্র, রাগের পাত্র নই। অবস্থা সাক্ষাৎ হইলে কিছু বলিতে পারি। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী লিখিবার যোগ্য উপাদান আমার কাছে যথেষ্ট ছিল, এবং আশা ছিল সেইগুলি খুঁজিয়া পাইলে তোমাকে দিয়া তোমার রাগ মিটাইব; কিন্তু আমার বড়ই দুর্ভাগ্য যে আমার সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে সেগুলিও নষ্ট হইয়াছে। আরও সংসার-চক্রের আবর্ত্তনে পড়িয়া স্মৃতিও অনেক পরিমাণে নষ্ট হওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই সকল উক্তি আর লিপিবদ্ধ করিবার সামর্থ্যও হারাইয়াছি। নচেৎ আজ ১৬ বৎসর পূর্ব্বে হরিদ্বার কুম্ভের সময় হৃষীকেশের একটা নিভৃত ধর্ম্মশালায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহার পর যখন আসাম মঠে প্রথম ভক্তসম্মিলনী আহ্বান করেন তখন আবার সেই সকল ঘটনার পুনরাবৃত্তি করিয়া বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। নিপুণ শ্রোতা উভয় ক্ষেত্রেই আমি এবং বনমালী সরকার। আমি সেগুলি বেশ গুছাইয়া লিখিয়া রাখিয়া-ছিলাম। আশা ছিল কালে কাজে লাগিবে। বনমালী আর ইহজগতে নাই। সে যাহা হউক তোমার তৃপ্তির জন্য নিজের জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট একটু ঘটনা লিখিয়া দিলাম যদি ইহা তোমার কাজে লাগে। আমি গত ১৩২০ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণাশ্রয় পাই। চরণাশ্রয়প্রাপ্তির কিছুদিন পর হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে কিছু কিছু কুৎসা কর্ণগোচর হয়। মনটায় কেমন যেন একটা খোঁচা বিঁধিতে লাগিল। অবশ্য সেজন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি কোন ভাবান্তর হয় নাই। তাহার কারণ,

প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে একজন অসাধারণ মানুষ বলিয়া একটা ধারণা হয়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে নিজের একজন অতি পুরাতন বন্ধু বলিয়া মনে হয়। কাজেই কুৎসার কথা যখন শুনিলাম তখন স্থির করিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুরকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাপারটা জানিব। মনে খুব বিশ্বাস ছিল, ঘটনা যতই গুরুতর হউক শ্রীশ্রীঠাকুর আমার কাছে অন্ততঃ কিছু গোপন করিবেন না। কিন্তু সে সুযোগ ঘটিবার পূর্ব্বেই সেই বৎসর হরিদ্বার কুম্ভমেলায় যাইবার সাড়া পড়িল। শ্রীশ্রীঠাকুর যাইবেন, আমি ও বনমালী যাইবার জন্য প্রার্থনা করায় মঞ্জুর হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন ৺কাশীধাম গম্ভীরায় অবস্থিতি করেন। তিনি তথা হইতে এক মাস পূর্ব্বে হরিদ্বার বড় রাস্তার উপর দ্বিতলস্থ একখানি ঘর একমাসের জন্য একশত টাকায় ভাড়া বন্দোবস্ত করান। স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ বাসা ঠিক করিয়া দেন। আমি তখন সৈয়দপুরে থাকি, বনমালীও সেখানে রেলে চাকুরি করে; যথাকালে আমরা হরিদ্বার কুম্ভে রওনা হইলাম। পথে বিশ্রাম করিতে করিতে চতুর্থ দিবস অপরাহ্ণে হরিদ্বারে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাসায় উপস্থিত হইলাম। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বাসায় ছিলেন না, বেড়াইতে গিয়াছিলেন। আমরা পৌছিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিলাম এবং বোধানন্দ দাদার স্বহস্তে পক্ক পিণ্ডাকার অন্নপ্রসাদ অতি তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই শ্রীশ্রীঠাকুর বাসায় ফিরিলেন। আমরা তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঠাকুর! আমরা গৃহী, একটা মহাতীর্থে আসিয়াছি, আমাদের কর্ত্তব্য কি? এখানে কি করিতে হইবে?" উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "এখানে ব্রহ্মকুণ্ড ও কুশাবর্ত্ত ঘাটে স্নান এবং সাধু-মহাত্মাদিগকে দর্শন বন্দন ভিন্ন তোমাদের আর কিছু করিতে হইবে না।" তাহাতে আমি বললাম "ঠাকুর, এখানে ত সন্ন্যাসী গড়াগড়ি যাচ্ছে, সাধু-মহাত্মা চিনিব কি করিয়া?" তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "আমি সঙ্গে লইয়া তোমাদের

সাধু-মহাত্মা দর্শন করাইব” বলিয়াই তখনই বলিলেন, “চল”। আমরা তাঁহার সঙ্গে বাহির হইলাম। সঙ্গে আমি, বনমালী এবং স্বামী যোগানন্দ ও আর একজন কেহ ছিলেন তাঁহার নাম ঠিক মনে হইতেছে না। প্রথমেই পথ হইতে একজন সাধু বাবা গম্ভীরনাথের আখ্ড়ায় ডাকিয়া লইয়া গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদিগকে বলিলেন “দেখ সাধু-মহাত্মা দর্শন করিয়া তাঁহাদের চরণস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে, যেন খাঁড়া হাতে প্রণাম করিও না; সাধু-মহাত্মাদিগকে প্রণাম করিলে তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করেন এবং সে আশীর্ব্বাদের মূল্য বড় বেশী।”...... আমরা বাবা গম্ভীরনাথের আশ্রমে যাইতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে দিলেন। তাঁহাকে পূর্ব্ব উপদেশ মত প্রণাম করিয়া বসিলাম। দু’জনেই চুপ করিয়া রহিলেন, কোন কথা কেহই কহিলেন না, কিন্তু একটু ঘাড় নাড়া, চোখ ঠারা দু’জনের মধ্যেই হইল, তাহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিলাম না। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর উঠিলেন, বাবা গম্ভীরনাথও উঠিয়া কিছুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সে দিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ায় অন্য কোন সাধুর আশ্রমে আর যাওয়া হয় নাই। সন্ধ্যার পর ব্রহ্মকুণ্ডের প্লাটফরমের উপর আমাদের একটী বেশ জমকাল আসর বসিল। অনেক ভাল ভাল কথার আলোচনা হইল। এইরূপ প্রতিদিনই হইত। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর ক্রমে ক্রমে হরিদ্বারে সমাগত বড়হজের মহাপ্রভু অনন্তানন্দজী ও অন্যান্য সমস্ত সাধু-মহাত্মার দর্শন করাইয়া দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বাবা গম্ভীরনাথ যে ভাবে অভ্যর্থনা আলাপ ও বিদায় করিয়াছিলেন, সকলেই একইভাবে অভ্যর্থনা আলাপাদি করিলেন। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিলাম, “ঠাকুর, ‘সীতা নাড়ে ঘাড় বানরে নাড়ে মাথা, বুঝিতে না পারি নর-বানরের কথা।’ আপনাদের এই যে ঠারে ঠোরে ঘাড়-নাড়ানাড়ি হয় এর বাঙ্গলা মানে কি?” শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু সে সমস্ত

কথার কোনই উত্তর দেন নাই। আমি অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন উত্তর পাই নাই।

আরও একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমাদের ঠাকুর যখনই বাহিরে বেড়াইতেন, বিলাসী বাঙ্গালী বড়লোকের মত পরিচ্ছদে বেড়াইতেন, সঙ্গে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী শিষ্যেরা থাকিতেন; কিন্তু ও দেশের গৃহী স্ত্রী পুরুষ এবং সন্ন্যাসীরা সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরকে "গোড়্ লাগি মহারাজ" বলিয়া অভিবাদন করিত। আমি কতবার শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি "ঠাকুর, আপনার এমন কি লক্ষণ আছে যাহা দেখিয়া এ দেশের সাধারণ লোক পর্য্যন্ত আপনার পদবন্দনা করে?" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন "উহারা সাধু-মহাত্মা চেনে, বাঙ্গলার মত নয়।" আমি কিন্তু ঠিক বুঝিতে পারিতাম না, এখনও পারি নাই। কুম্ভের শেষ স্নান চৈত্রসংক্রান্তির দিনে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে ও বনমালীকে এবং দুই-একজন সন্ন্যাসী শিষ্যকে লইয়া চৈত্র মাসের ২৪।২৫ তারিখে হৃষীকেশে গেলেন। তথায় একটী ধর্ম্মশালায় আমরা আশ্রয় লই। ধর্ম্মশালায় গিয়া শ্রান্তিবিনোদনার্থ শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে তামাক সাজিবার জন্য আদেশ করিলেন। উক্ত ধর্ম্মশালায় যে ধূমপান নিষেধ ছিল তাহা উক্ত ধর্ম্মশালার পাঞ্জাবী অধ্যক্ষ খুব রাগতভাবে জানাইয়া দিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে শিষ্যগণ তাকাইতে থাকিলে তিনি বলিলেন যে তিনি ধর্ম্মশালার নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া সম্মুখে গাছের নীচে বসিয়া ধূমপান করিয়া আসিবেন। অতঃপর তাহাই করিলেন। যেদিন হৃষীকেশে পৌঁছিলাম, তৎপরদিন প্রাতে আমরা লছমনঝোলাদি দর্শন জন্য বাহির হইলাম। সমস্ত দিন ভ্রমণান্তে অপরাহ্নে অনন্তানন্দ ওরফে নেপালীবাবার আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদিগকে লইয়া গেলেন। ইনি একজন খ্যাতনামা সিদ্ধ মহাপুরুষ। গত বৎসর জানুয়ারী মাসে ইনি দেহরক্ষা করিয়াছেন।...... পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধু-মহাত্মাদিগের ন্যায় ইনিও গৃহস্থবেশী শ্রীশ্রীঠাকুরকে বাহুর

মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। অন্যান্য সাধু অপেক্ষা ইঁহার অভ্যর্থনা যেন কিছু বেশী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ে বসিয়া চোখ মুখ ঘাড়-নাড়ানাড়ি করিয়া নির্ব্বাক্ আলাপ হইল। আমরা উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইলে নেপালীবাবা তাঁহার জনৈক শিষ্যকে আমাদিগকে খাবার দিবার জন্য আদেশ করিলেন। তদনুসারে প্রচুর পরিমাণে লাড্ডু, জিলিপী, রুটী ও ডাল দিলেন। আমরা লইয়া রওনা হইলাম। নেপালীবাবা কিছুদূর শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আসিলেন। আমাদিগের খাদ্যের পরিমাণ যেন তাঁহার বিবেচনায় অল্প বোধ হইল, তজ্জন্য একজন শিষ্যকে পুনরায় খাদ্য আনিবার জন্য আদেশ করিলে তখন এক ঝুড়ি খাবার আসিল। নেপালীবাবা দুই হাতে তুলিয়া আমাদিগের ঝোলা বোঝাই করিতে লাগিলেন। ঝোলা ছিঁড়িবার উপক্রম, তথাপি তাঁহার তৃপ্তি নাই, বালকের ন্যায় ক্রমাগতই দিতেছেন; আমরা নিষেধ করিতেছি তবুও মানিতেছেন না। অবশেষে তাঁহার একজন শিষ্য বলিলেন এখনও যে অনেক লোক বাকি; শেষে তিনি নিরস্ত হইলেন এবং আমাদিগকে অনেক আশীষে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিলেন। এরূপ বালকস্বভাবের সাধু আর দেখি নাই। আকার কিছু খর্ব্ব, স্ত্রী কি পুরুষ দেখিয়া বুঝা যায় না।

নেপালীবাবার আশ্রম হইতে ফিরিবার সময় পূর্ব্ববর্ণিত ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষ কতকগুলি ফুল লইয়া আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ের উপর দিয়া বলিল, "মহারাজ, কসুর মাপ কিজিয়ে"। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন "কেয়া কসুর?" তখন সে গতরাত্রে ধূমপান করিতে না দিয়া যে অপরাধ করিয়াছে তাহাই মাপ করিতে প্রার্থনা জানাইতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝিলেন যে নেপালীবাবার আশ্রমে তাঁহার সমাদর দেখিয়া সে এখন অনুতপ্ত হইয়া পূজা করিতে আসিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন "কুছ কসুর নেহি হুয়া"। তখন সে শ্রীশ্রীঠাকুরের চর্ম্মপাদুকার উপর পুনঃ পুনঃ

গড় করিয়া জুতার ধূলি মাথায় লইয়া জোড়হাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

অতঃপর আমরা আমাদের সেই ধর্ম্মশালায় আসিলাম; তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিলাম, "ঠাকুর, আজ অনেক পথ ভ্রমণ করিয়াছেন, পায়ে বড় বেদনা হইয়াছে, একটু তেল জল মালিশ করিয়া দিবার প্রার্থনা করি।" শ্রীশ্রীঠাকুর নানা ওজর-আপত্তি করিয়া বাধা দিতে লাগিলেন। শেষে প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর সান্ধ্য জল-পানের পর রোয়াকে একটা বিছানায় শয়ন করিলেন, আমি ও বনমালী একটা বাটীতে সরিষার তৈল ও জল লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পদসেবায় নিযুক্ত হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিন খুব আনন্দে ছিলেন। শয়নাবস্থাতেই তাঁহার জীবনী বলিতে লাগিলেন, প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল ক্রমাগত বলিলেন। আমরা দু'জনে নিবিষ্ট মনে শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে সেই স্থানটা একটা অপূর্ব্ব সদ্‌গন্ধে ভরপুর হইয়া উঠিল। গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে প্রথমে বুঝিতে পারিলাম না, শেষে বুঝা গেল শ্রীশ্রীঠাকুরের গাত্রগন্ধ। পরে দেখি আমার হাতও সেই গন্ধে পূর্ণ। বনমালীকেও হাত শুঁকাইলাম। বনমালীর হাতেও সেইরূপ গন্ধ পাইলাম। ঐ গন্ধ তাহার পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্তও আমার হাতে ছিল। আমি প্রাতঃকালেই হাঁটিয়া হৃষীকেশ হইতে হরিদ্বার চলিয়া আসিলাম; শ্রীশ্রীঠাকুর, বনমালী এবং সন্ন্যাসী-শিষ্যগণ বৈকালে গাড়ী করিয়া আসিলেন। আমি বনমালীকে বলিলাম, "ভায়া! তুমি একদিন শ্রীশ্রী-ঠাকুরের সম্বন্ধে কুৎসার কথা জানিয়া মনে মনে চাপিয়াছিলে, শেষে তাহার তথ্য সংগ্রহ করিয়া মনের কষ্ট দূর করিয়া তবে আমার কাছে প্রকাশ করিয়াছিলে, মনে আছে? আমি কালো বামুন, আমার মনের খট্‌কা তখন তো যায় নাই এবং এ পর্য্যন্তও ছিল। আজ আমার সব ভ্রম দূর হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর কৃপা করিয়া হরিদ্বারে আনিয়া বেশ করিয়া

বুঝাইয়া দিলেন যে, "তোমরা আমাকে কি চিনিবে? ভারতের যতগুলি খ্যাতনামা সাধু-মহাত্মা আছেন, যাঁহারা সাধু চেনেন, তাঁহারা আমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিলেন দেখিয়া তোমরা তোমাদের গুরুর ওজন বুঝিয়া লও। মণিকার ভিন্ন অন্যে রত্ন চেনে না, সাধু-মহাত্মা চেনা সাধারণের সাধ্যাতীত।" তারপর একটু বিভূতি দেখাইবার জন্য যে সরিষার তেল সমস্ত গন্ধ দূর করে সেই সরিষার তেলের ভিতর দিয়া নিজের শ্রীঅঙ্গ হইতে অপূর্ব সদ্‌গন্ধ বাহির করিয়া আমাদিগের দেহ পর্য্যন্ত সদ্‌গন্ধে আমোদিত করিয়া দিলেন। বনমালী তো নির্ব্বাক্; আমিও শ্রীশ্রী-ঠাকুরের কৃপার কথা চিন্তা করিয়া হতভম্ব হইয়া গেলাম। ইচ্ছা ছিল এ ঘটনা আর কাহাকেও বলিব না, কিন্তু এখন যেন বলা দরকার বোধ হইতেছে, তাই সামান্য একটু লিখিয়া জানাইলাম।

* * * * *

অনেক অশান্তির মধ্যে পড়িয়াও এই দুই ছত্র তোমাকে লিখিয়া দিলাম। জানি না তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কতটুকু সাহায্য হইবে। ইতি।—

তোমার

ক্ষেপাদাদা

হরিদ্বার কুম্ভ হইতে বারাণসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর গম্ভীরায় অবস্থান করিতে থাকিলেন। গম্ভীরায় অবস্থানকালে হরিদ্বারের সুপ্রসিদ্ধ সাধু স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ভোলানন্দ গিরি মহারাজের জনৈক বাঙ্গালী শিষ্য তাঁহার সাহায্যে শ্রীশ্রীঠাকুরকে হরিদ্বারে বাড়ী ভাড়া করিয়া দেন। কিন্তু হরিদ্বারে তাঁহাদের সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা না হওয়ায় তিনি কার্য্যব্যপদেশে বারাণসীতে আসিলে একদা শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত গম্ভীরায়

সাক্ষাৎ করতে আসিলেন। যেদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন সেদিন কাশী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিন। গিরিমহারাজ অতি প্রত্যূষে কাশীর মাঘ মাসের দারুণ শীতের ভিতর গম্ভীরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে জানান হইল যে শ্রীশ্রীঠাকুর এত প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করেন না, সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাতে বিশেষ বিলম্ব হইয়া যাইবে। কিন্তু তিনি তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র অসুবিধা বা অধৈর্য্য প্রকাশ না করিয়া ৯॥ টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। ৯॥ টায় উভয়ের সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইবার পর তিনি বিদায় গ্রহণ করেন।

* * *

কাশী গম্ভীরায় অবস্থানকালে এমন একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটিল যাহা শ্রীশ্রীঠাকুরকে পূর্ব্ববঙ্গে টানিয়া আনিয়াছিল। ঘটনাটি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রবীণ ভক্ত শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় ধরের নিকট হইতে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

চট্টগ্রাম হইতে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক কাশীধামে আসিয়াছিলেন বিশ্বনাথ-দর্শনে। বিশ্বনাথ তাঁহার দর্শন হইয়াছে কিন্তু অন্নপূর্ণার দর্শনলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। অন্নপূর্ণার মন্দিরের পাণ্ডারা যে দর্শনী চাহিয়াছে তাহা দিলে চট্টগ্রামে ফিরিয়া যাওয়া তাঁহার হয় না। তিনি ৪৲ চার টাকা পর্য্যন্ত তাহাদের দিতে চাহিয়াও ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন। বৃদ্ধের বয়স ৬৫ বৎসর। জীবনে আর কাশী আসিয়া অন্নপূর্ণা দর্শন করিবেন, এ আশা তাঁহার নাই এবং পত্র লিখিয়া টাকা আনিবেন সে সময়ও নাই, তদুপরি নির্দ্দিষ্ট ঠিকানাও নাই। এইরূপ অবস্থায় নৈরাশ্যকাতর হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসিয়া পৌছিলেন গঙ্গাতীরে দশাশ্বমেধ ঘাটে। যে স্থানে তিনি আসিয়া বসিলেন তাহার একটু দূরে উপবিষ্ট এক তরুণ সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সন্ন্যাসীর আশেপাশে বসিয়া আছেন কয়েকজন, যাঁহারা তাঁহার কথামৃত শ্রবণে মগ্ন হইয়া

রহিয়াছেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ভাবিলেন, ইনি সন্ন্যাসী, ইঁহার সহিত পরিচিত হইলে হয়ত ইনি কোন উপায় করিতে পারিবেন। এইরূপ মনে করিয়া উঠিয়া গিয়া সন্ন্যাসীর নিকটে উপবেশন করিলেন। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। তখন অন্যান্যেরা উঠিয়া গেল, কিন্তু বৃদ্ধটি বসিয়া রহিলেন। তখন তরুণ সন্ন্যাসীটি জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার কিছু বলবার আছে কি ?

বৃদ্ধটি আনুপূর্ব্বিক সবই তাঁহাকে বলিলেন এবং সন্ন্যাসীকে অত্যন্ত আকুলতার সহিত অন্নপূর্ণা-দর্শনে সাহায্য করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। তখন সন্ন্যাসীটি বলিলেন—আচ্ছা, আমি আপনাকে অন্নপূর্ণা দর্শন করাইব, আসুন আমার সঙ্গে। ভদ্রলোক চলিলেন অনেক দূর তাঁহার সঙ্গে। কিন্তু এ ত সে-পথ নয় যে-পথে অন্নপূর্ণা-মন্দিরে যাইতে হয়। ভদ্রলোক মনে করিলেন হয়ত বা নিজগৃহ হইতে টাকা-পয়সা লইয়া তবে যাইবেন। অবশেষে উভয়ে উপনীত হইলেন নিগমানন্দ-গম্ভীরা নামক এক আস্তানায়। সন্ন্যাসী তাঁহাকে গৃহমধ্যে বসিতে দিয়া বলিলেন—আপনি এখানে বসুন, চোখ বুঁজিয়া বসুন। আমি গৃহের বাহিরে যাইতেছি, যখন আমি আপনাকে চোখ মেলিতে বলিব—তখন অন্নপূর্ণার দর্শন পাইবেন। এখানেই তাঁহার দর্শন লাভ হইবে। সন্ন্যাসী বাহিরে গেলেন, বৃদ্ধটিও চোখ বুঁজিয়া বসিয়া রহিলেন। অগুরু চন্দন ও সুগন্ধ পুষ্পের সৌরভ চারিদিক আমোদিত করিল। অতঃপর সন্ন্যাসী তাঁহাকে চোখ মেলিয়া জীবন সার্থক করিতে বলিলেন। বৃদ্ধ চোখ মেলিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়ে স্তব্ধীভূত হইয়া দেশকালজ্ঞানরহিত হইয়া জীবন্ত অন্নপূর্ণার পাদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন।

সন্ন্যাসী পুনরায় তাঁহাকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলিলেন। ভদ্রলোক তখন আত্মসংবরণ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পুনরাদেশে চক্ষুরুন্মীলন করিলে তিনি দেখিলেন সম্মুখে সন্ন্যাসী বসিয়া রহিয়াছেন। বিস্ময়ের পর

বিস্ময় ! বৃদ্ধটি কিয়ৎকাল সম্বিৎ হারাইয়া ফেলিলেন। অতঃপর প্রকৃতিস্থ হইলে, উভয়ে উভয়ের নিকট পরিচিত হইলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, তাঁহার নাম হরচন্দ্র দে, ডাক্তার, বাড়ী চট্টগ্রামে—মেখলা গ্রামে। এই সংক্রান্ত পরবর্তী ঘটনাটিও এই স্থলে বর্ণিত হইল।

এই মেখলা গ্রাম শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির জন্মভূমি। মুকুন্দ দত্তের ঐ গ্রামেই জন্ম হয়; চন্দ্রনাথ তীর্থের সন্নিকট এই মেখলা গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক্তার হরচন্দ্রের আকর্ষণে শুভ পদার্পণ করেন। সে স্থান হইতে ধীরে ধীরে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও যোগৈশ্বর্য্যের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। হরচন্দ্রের পুত্র দীনবন্ধু ও জামাতা গুরুদাসের এবং অন্যান্য অনেকের দীক্ষা এই মেখলা গ্রামেই হয়। দীক্ষার পর গুরুদাস বিবাহিত হইয়াও সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবনযাপন করেন। মহেন্দ্রলাল ধর নামে এক যুবক গুরুদাসের সংস্পর্শে আসেন; তাঁহার মামার বাড়ী ও মাসীমার বাড়ী ঐ গ্রামেই। এই গুরুদাসই মহেন্দ্রের আধ্যাত্মিক উদ্দীপনার কারণ হন। তাঁহারই প্রভাবে মহেন্দ্র অবশেষে পুরীধামে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হন। দীক্ষার পর ধ্যান-ধারণা করিতে থাকেন, তৎসহ সাত্ত্বিক আহারাদি গ্রহণে অভ্যস্ত হন। ইহাতে তাঁহার পিতা তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বক্রভাবাপন্ন হইলেন। পিতা তখন নানাভাবে বিরক্তি প্রকাশ ও বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে থাকেন যাহাতে মহেন্দ্র ঐ পথ পরিত্যাগ করেন। কারণ গুরুদাসের যেরূপ মতিগতি হইয়াছে তাহাতে তাঁহাকে সংসারে একজন সন্ন্যাসী বলা যায়। মহেন্দ্রও যদি ঐরূপ হইয়া যায় বা সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যায়—পিতা ঈশ্বরচন্দ্রের মনে এই ভয়। কারণ তিনি একজন সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থ, তেজারতি তাঁহার ব্যবসায়। পুত্র সংসার ত্যাগ করিলে তাঁহার কত বড় ক্ষতি! অত্যাচারের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিল। একদা তিনি তাঁহার পুত্রবধূকে বলিলেন—নিরামিষ আহারের পরিবর্ত্তে মহেন্দ্রকে

এদিকে যেমন অত্যাচার উৎপীড়ন বাড়িয়া গেল, ভিতরে ভিতরে তেমনি তিনি তীর্থদর্শনের আকর্ষণ অনুভব করিতে থাকিলেন। একদা তিনি সস্ত্রীক কাশী যাত্রা করিলেন্। মহেন্দ্র তখন বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে অসহায় ভাবে পথযাত্রা করিতে দিতে পারিলেন না। অতঃপর পিতার অনুমতি লইয়া তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন কাশী-গম্ভীরায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। সঙ্গে সেবক ছিলেন প্রজ্ঞানন্দ। মহেন্দ্র পূর্ব্ব হইতে প্রজ্ঞানন্দকে তাঁহাদের কাশী যাইবার সংবাদ দিয়া রাখিয়াছিলেন।

কাশী-গম্ভীরায় আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে মহেন্দ্রের পিতা ঈশ্বর ধর চাক্ষুষ দেখিলেন—দেখিয়া তন্ময় হইয়া গেলেন। শান্ত সৌম্য মাধুর্য্যমণ্ডিত অরুণকান্তি সন্ন্যাসী দর্শনে ঈশ্বর মুগ্ধ হইলেন—চক্ষু দরবিগলিত আনন্দ-ধারায় সিক্ত হইয়া গেল। এ ত ভস্মমাখা পিঙ্গল জটাজালমণ্ডিত সন্ন্যাসী নয়! এ ত রাজার কুমার—দেখিয়াও আনন্দ। অতঃপর আনন্দঘন সচল মূর্ত্তির সম্মুখে মস্তক আপনি নত হইয়া গেল। ভক্তি-আপ্লুত মনে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—ঈশ্বর! তোমার নাম ঈশ্বর—পুত্রই তোমার ঈশ্বরলাভের সেতুস্বরূপ। পুত্রের দ্বারা তোমার সদ্‌গুরু লাভ হইল। মহেন্দ্র কোনদিনই সন্ন্যাসী হইবে না। সে গৃহে থাকিবে—তোমার কোন ভয় নেই, আদর্শ গৃহস্থ ধর্ম্ম স্থাপনই আমার উদ্দেশ্য; গৃহী লইয়াই সমাজ ও শ্রীভগবানের সংসারলীলা।

অতঃপর মহেন্দ্রের পিতা ঈশ্বরের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার বাড়ী যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ঈশ্বর দেশে ফিরিলেন। তাঁহার তেজারতি ব্যবসা মন্দীভূত হইয়া গেল। কষাকষি করিয়া সুদ গ্রহণ করেন না। পাওনাগণ্ডা মাফ করিয়া দেন। পুত্র মহেন্দ্রের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। ধ্যান-ধারণা জপাদিতে তাঁহার বেশ সময় যায়।

প্রায় ৮।১০ বৎসর পরে পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে বাহির হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর সন্দ্বীপের ভক্ত প্রসন্নকুমার দাসের বাসা চট্টগ্রাম সহরের হাজারী গলিতে কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া সন্দ্বীপে যাইবেন এবং সন্দ্বীপে যাইবার পথে পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত মত দোহাজারী লাইনে চাঁদগাঁও গ্রামে ঈশ্বর মহাজনের বাটি যাইবেন এইরূপ স্থির ছিল। ঈশ্বরের বয়স তখন ৬০ বৎসর। একদা স্নান সমাপন করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে ১২টার সময় স্তোত্র-প্রাণায়ামাদির পর মুখ দিয়া ফেনা উঠিতে থাকিল। সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইয়া অজ্ঞান হইয়া গেলেন। ২॥ আড়াই ঘণ্টা হইয়া যায়, ঈশ্বর তখনও চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বাহির হয়েন না। ব্যতিব্যস্ত হইয়া সকলেই আসিয়া দেখে—তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া রহিয়াছেন। চণ্ডীমণ্ডপে মাঝে মাঝে সাপ দেখা যাইত। সাপে কাটে নাই ত?

ঈশ্বর মহাজন সংজ্ঞাহীন—এই কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ তিনি, বহুলোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছে, ডাক্তার বৈদ্য আসিতেছে। এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঈশ্বর মহাজনের গৃহে আগমনের আর বিলম্ব নাই। চারদিন পূর্ব্বেই দিন স্থির করা হইয়াছে। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া মহেন্দ্রকে প্রসন্ন দাসের বাড়ীতে পাঠাইলেন—যাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর এই মুমূর্ষু ভক্তের বাড়ীতে না আসিয়া পরে অন্য কোন একটা দিন স্থির করেন। শরৎ রক্ষিতের ন্যায় প্রসিদ্ধ কবিরাজ বলিয়াছেন যে অদ্য রাত্রি ৮টার পর এই সন্ন্যাসের রোগী কিছুতেই টিকিতে পারে না। শিবেরও অসাধ্য। মহেন্দ্র প্রসন্ন দাসের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রজ্ঞানন্দ, ভুবন ও ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী তখন সেবক। প্রসন্নদাদা প্রজ্ঞানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন গড়গড়ায় ধূমপানে রত। মহেন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তাহাকে কিছু বলিতে সুযোগ না দিয়াই রুক্ষস্বরে বলিতে লাগিলেন—আমাকে নিয়ে যাবার কথা ছিল না?

ট্যাক্সি এনেছ—এই ভুবন ! জিনিষপত্র বাঁধ। তখন প্রসন্নদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধীরে ধীরে বলিলেন—ঠাকুর ! ঈশ্বরদাদা আজ ২।৩ দিন অজ্ঞান, সন্ন্যাসে আক্রান্ত। শরৎ কবিরাজ বলিয়াছেন, আজ রাত্রি আর কাটিবে না। আপনি যদি যান এবং ঈশ্বর যদি মারা যায়—তবে এরূপ স্থলে আপনার একটা দুর্নাম হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুর একেবারে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরও রুক্ষস্বরে বলিলেন—গুরুর দুর্নাম হবে ? এই ভুবন ! জিনিষপত্র বেঁধেছ ? মহেন্দ্র, শীঘ্র ট্যাক্সি ডাক। এই বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর উঠিয়া পড়িলেন।

ঈশ্বরদাদার বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমনের কথা মেখলা গ্রামবাসীর জানাই ছিল। সেখানকার শতাধিক ভক্ত ঈশ্বরদাদার বাড়ীতে রওনা হইল। আর ওদিকে ঈশ্বরদাদার আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ রাষ্ট্র হওয়ায় বহু লোক জমায়েত হইল। ঠাকুরের ভক্ত এবং স্থানীয় গ্রামবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এরূপভাবে জমায়েত হইল যে বহির্বাটীতে তিল ধারণের স্থান রহিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর আসিতেছেন—এ সংবাদ আগেই পাঠানো হইয়াছিল। ঠাকুর আসিয়া তাঁহার বসিবার জন্য যে স্থানের ব্যবস্থা হইয়াছিল সেখানে না বসিয়া সরাসরি যেখানে ঈশ্বর সংজ্ঞাহীন হইয়া আছেন, সেখানে নিয়া যাইতে বলিলেন। তাহাই করা হইল। একখানি ছোট চেয়ার ছিল, তাহাতে তিনি কোনমতে কাত্ হইয়া বসিলেন এবং ২।৩ মিনিট ঈশ্বরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিলেন। তারপর রুক্ষস্বরে—'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' বলিয়া চিৎকার করিয়া কয়েকবার ডাকিলেন। ১২ বৎসর বয়স্ক পুত্র দেবেন্দ্র পিতার নাকে কবিরাজী নস্য দিতেছিল ; সে ভাবিল —ইনি কি প্রকার গুরু ? তাহার বাবা মৃত্যুশয্যায় শয়ান—এরূপ রুক্ষস্বরে চিৎকার করিয়া তাহার পিতার শেষ সময়ে ব্যাঘাত জন্মানো ; তারপর সিল্কের জামা, চাদর গায়ে—এত নির্দ্দয় কেন ? বালক এই

ভাবিতেছে—এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুর চেয়ার হইতে উঠিয়া হো হো করিয়া অট্টহাসি হাসিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ঘরে আসিয়া বসিলেন।

এদিকে ঈশ্বরের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তিনি চারিদিকে তাকাইয়া সবিস্ময়ে বলিলেন—বাড়ীতে এত লোক কেন?

দেবেন্দ্র বলিল—ঠাকুর এসেছেন। * * * কিছুক্ষণ পরে ঈশ্বর নিজেই উঠিয়া বসিলেন। দেবেন্দ্রকে বলিলেন—এক ঘটি জল আন। দেবেন্দ্রকে ভর করিয়া তিনি চলিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। জনতা উৎসুক নয়নে সবিস্ময়ে দেখিল দেবেন্দ্রকে ভর করিয়া ঈশ্বর আসিতেছেন —হাতে একটি ঘটি। সকলেই পথ ছাড়িয়া দিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে পৌছিলে ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন—কি ব্যাপার?

ঈশ্বর। ঠাকুর একটু চরণামৃত।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঘটির জলে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ডুবাইলেন, বলিলেন—যাও, শুয়ে থাকগে।

* * *

শ্রীশ্রীঠাকুর চাঁদগাও ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে প্রসন্ন দাসকে বলিলেন—দ্যাখো প্রসন্ন, রাত্রে শুয়ে আছি, ঘুম ভেঙ্গে গেল। মশারীর ভিতর থেকে দেখতে পাচ্ছি, একটি স্ত্রীলোক—প্রৌঢ় বয়স, মাথায় কোঁকড়ান চুল—চুল পেকেছে। এ বাড়ীতে কি কেহ মারা গিয়াছে?

প্রসন্ন বলিলেন—হ্যাঁ ঠাকুর। ঈশ্বরের ভগ্নী তিন বৎসর হইল মারা গিয়াছে। সে হয়ত এসেছে। সে নিঃসন্তান—ভাই-এর সংসারভুক্ত হয়ে ছিল। আপনার নিকট এসেছে হয়ত কিছু প্রার্থনা নিয়ে।

যেদিন প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল, সেদিন ঈশ্বরের বাড়ীতে বহু লোকের দীক্ষা হইয়াছিল, এমন কি ১২ বৎসর বয়স্ক দেবেন্দ্রেরও দীক্ষা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—হ্যাঁ, আজ অনেকের দীক্ষা হয়েছে, তাই ও এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আসামে আসিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন বটে কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেও আসামবাসীরা বাঙ্গালীর প্রভুত্ব প্রথমতঃ মানিতে চাহিল না। আসামবাসীর ধর্ম্ম "ভাগবতীয়া ধর্ম্ম"। প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে শঙ্করদেব এই ধর্ম্ম আসামে প্রবর্ত্তন করেন। "ভাগবতীয়া ধর্ম্ম" অর্থে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত আচার ও অনুষ্ঠানমূলক ধর্ম্ম। এই ভাগবতীয়া ধর্ম্মকে আবার 'মহাপুরুষধর্ম্ম' বলা হয়, কারণ এই ভাগবতীয়া ধর্ম্মের ভিতর শঙ্করদেবের নিজের মতামতও বিশেষভাবে প্রবেশলাভ করে। প্রতিগৃহে "নামঘর" প্রভৃতির প্রবর্ত্তন তাঁহার সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। একে কলিকাল, তার উপর ৪০০ বৎসরের প্রাচীন ধর্ম্ম। এই সুদীর্ঘ কালের ভিতর এই অনুষ্ঠানমূলক ধর্ম্মের ভিতর কত আগাছা জন্মিয়াছে, কতস্থানে যে ঘুণ ধরিয়াছে, কতস্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর কতস্থান কালের ময়লায় মলিন হইয়া গিয়া উক্ত ধর্ম্মের স্বরূপ যেন হারাইয়া গিয়াছে। ঠিক এই সময়েই শ্রীশ্রীঠাকুর আসামের নিভৃত প্রান্তরে আশ্রম সংস্থাপন করেন। আশ্রমের নাম দেন "শান্তি আশ্রম"। কারণ সাধু-সন্ন্যাসীদের লক্ষ্যই একমাত্র ভগবান। ভগবদ্‌ভাবের উদয়ে পরা শান্তি। শান্তি আশ্রম কাহারও নামের সহিত সংযোজিত নহে। এই শান্তি আশ্রমের অভ্যুদয়ে আসামবাসীদের জড়ত্ব ভাঙ্গিয়া গিয়া আশ্রমের নিয়মসংযম—ত্যাগবৈরাগ্য—কার্যকলাপ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের মতবাদে তাঁহাবা ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। কোন ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্মে যখন সাধারণ লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তখন প্রথমতঃ কেহ উহা বুঝিতে চেষ্টা করে না। বরং তাঁহারা উহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। ফলে এই হয় যে বিরুদ্ধাচরণ প্রতিরোধ করিতে করিতে ক্রমেই সেই ব্যক্তির কর্ম্মশক্তির উদ্বোধন, স্ফুরণ ও প্রতিষ্ঠা হয়। এইভাবে এ জগতের

অনেক প্রতিভাপন্ন পুরুষ ও নারী অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন, যাহার ফলে তাহাদের ভাবই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

যে সরুরাম শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য—শুধু শিষ্য নহে—ভক্ত, আসাম-বাসীগণ তাহাকে পাইয়া বসিল। নানা অজুহাতে সে আশ্রম তহবিল হইতে টাকা লইত। তাহার ধারণা ছিল যে শ্রীশ্রীঠাকুর যোগবলে টাকা তৈয়ারী করিতে পারেন। স্বামী স্বরূপানন্দ (রাজচন্দ্র ধর) মঠে আসিবার সময় মৈমনসিংহের বাড়ী ১২০০৲ টাকায় এবং অন্যান্য জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া মঠের তহবিলে প্রায় ৩০০০৲ টাকা জমা দিয়াছিলেন। মঠের গৃহাদি নির্ম্মাণ জন্য উক্ত সরুরাম প্রায় ১২০০৲ টাকা হস্তগত করে। মঠের অদূরে যে ব্রহ্মপুত্র নদী আছে তাহার অপর পারে আইনটী ছত্র। সেই ছত্রে হাতী আছে—বার মাসে তের পার্ব্বণ তথায় লাগিয়া আছে। মানুষের উচ্চতার সম পরিমাণ করতাল—যাহার এক একটা এক একজন ধরিয়া থাকে এবং দূর হইতে অন্য লোক তদ্রূপ করতাল লইয়া আসিয়া আঘাত করিলে বাজিয়া উঠে কিন্তু মঠে তদ্রূপ কিছু নাই। আইনটী ছত্রের অপেক্ষা বেশী জাঁকজমক করিতে হইবে, শ্রীশ্রীঠাকুর কেন ছোট হইয়া থাকিবেন? শ্রীশ্রীঠাকুর যখন টাকা তৈয়ারী করিতে পারেন তখন হাতী বা করতাল কেন কেনা হইবে না? এই সব কারণে সরুরাম বিরক্ত হইতে থাকিল এবং ক্রমশঃ নিজেই বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকিল। ঢাকায় অবস্থান কালে শ্রীশ্রীঠাকুর আসাম সরকারের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত লইতে সরুরামকে ৪০০৲ শত টাকা দেন। সরুরাম ঐ জমি নিজ নামে বন্দোবস্ত লয়। সুতরাং জমি হইতে যখন জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা হয় তখন জমির পরিমাণ কিঞ্চিৎ বেশী হইয়া যাওয়ায় উহার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেও শত্রুপক্ষীয়গণের হস্তে ক্রমেই সে ক্রীড়নক হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে সরুরাম সব ছাড়িয়া আসিয়া আশ্রমবাসী হইয়াছিল, সে এখন আশ্রম হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। সে মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুরকে

বলিত—ঠাকুর, তুমি বাঙ্গালী তাড়িয়ে দাও, আমি তোমাকে বহু অসমীয়া শিষ্য করিয়া দিব।

একদা সে সত্যসত্যই ভক্তের মুখোস খসাইয়া ফেলিল। শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিল যে এ জমা-জমি সব তাহার। দলিল তাহার নামে। সুতরাং দলিল তাহাকে ফেরৎ দিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ এরূপ উত্যক্ত করিতে থাকিলে শ্রীশ্রীঠাকুর দলিলখানি বাহির করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

সে দলিল লইয়া বলিল—এরূপ ভাবে দিলে হইবে না, লিখিয়া দিতে হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন একটা পেনসিল লইয়া দলিলের পিছন দিকে দলিলের সম্পত্তি ফেরৎ দিলাম বলিয়া নাম সই করিয়া দিলেন। অতঃপর যে জমি চাষবাস হইতেছিল তাহা তাহার বলিয়া সরুরাম দাবী করিতে থাকিল। লোকজন লইয়া আসিয়া পুষ্করিণী হইতে মাছ ধরিয়া দখল করিতে লাগিল। যোগানন্দ প্রভৃতি উপযুক্ত সন্ন্যাসী সেবকগণ তখন দামোদর বন্যায় সেবাকার্য্যে লিপ্ত থাকায় শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীতে চলিয়া গেলেন। যথাসময়ে যোগানন্দ মঠে আসিলেন। তখন যাহা অনিবার্য্য ফল তাহা হইল। শান্তি আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীসঙ্ঘের সহিত আসাম-বাসীদের প্রথমতঃ দৈহিক শক্তিপরীক্ষা হইল, পরে মামলা আদালতে গড়াইল। দীর্ঘকাল মামলা চলিবার পরে যখন অসমীয়াগণের জেলে যাইবার উপক্রম হইল তখন তাহারা স্থানীয় বড় বড় লোক সঙ্গে আনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধরাধরি করিতে থাকিল। তাহারা নিজেদের দাবী ত্যাগ করিল ও মামলার যাবতীয় ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হইলে মঠের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি অনুসারে মামলা মিটাইয়া ফেলিলেন। তখন হইতে শান্তি আশ্রমের নানাভাবে প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তৃত হইতে থাকিল। আসামে যেটুকু প্রচার প্রয়োজন ছিল এই মকদ্দমায় তদপেক্ষা বেশী প্রচার হইবার কারণ হইয়া পড়িল। যাহা হউক, এই

ঘটনার পর আশ্রমের অন্তর্নিহিত ভাবমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আসাম-বাসীগণ ক্রমে ক্রমে নিজেদের ভিতরে একটা সজীবতা অনুভব করতে থাকিল। এদিকে সরুরামও আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিল। তাহার পুনরাগমনে আশ্রমবাসীদের আপত্তি শ্রীশ্রীঠাকুর গ্রাহ্য করিলেন না। কারণ আশ্রমের যে যত বড় শত্রুতা করুক না কেন, শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বতশ্চক্ষু, তাঁহার কাছে সবই ধরা পড়িয়া যাইত। তিনি তাহার পুনরাগমনে বরং আনন্দিতই হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনে এই এক বিশেষ নীতি দেখিয়াছি যে স্ত্রী হউক বা পুরুষ হউক, আপাতস্থূলদৃষ্টিতে শত্রুই হউক আর মিত্রই হউক, তিনি কাহাকেও কোন দিন আহ্বান করেন নাই আবার বিসর্জ্জনও দেন নাই। যে একবার তাঁহার আশ্রয় চাহিয়াছে সে কখনও বিমুখ হয় নাই; সে যে-কোন ভাব লইয়াই তাঁহার নিকট আসুক না কেন সাধারণ সাধুদের ন্যায় তাহা প্রকাশ করিয়া লজ্জা দেন নাই এবং যে যখন ছাড়িয়া যাইতে চাহিয়াছে, তাহাকে কখনও নিষেধ করেন নাই। সরুরাম পূর্ব্ববৎ আশ্রমে রহিয়া গেল। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতে হতভাগ্য মতিভ্রান্ত সরুরাম রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সরুরামের মৃত্যুর কয়েক দিন পর হইতে আশ্রমপালিতা একটা কুকুরীর প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের একটু স্নেহাধিক্য দেখা যাইতে থাকিল। প্রায় ছ'মাস পরে কুকুরীটি একটি মাত্র ছানা প্রসব করিল। এই কুকুরছানাটির উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের অত্যধিক স্নেহ দেখা যাইতে লাগিল। প্রত্যহ ভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর ছানাটিকে এক মুঠা প্রসাদ দিতে ভুলিতেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের কার্য্যকলাপ যাঁহারা একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেন, এ ক্ষুদ্র ব্যাপারটি কিন্তু তাঁহাদের চোখ এড়াইল না। একদা দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীঠাকুর কুকুরছানাটিকে খাওয়াইতেছেন, এমন সময়ে শুদ্ধানন্দ দাদা তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া

আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কুকুরছানাটির দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া শুদ্ধানন্দকে বলিলেন, "এই কুকুরছানাটী কে জান? গুরুদ্রোহিতার ফলে সরুরাম এই জন্মে কুকুরযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে।" এই ঘটনার প্রায় কয়েক মাস পরে একদা দেখা গেল যে কুকুরছানাটী মঠের আসনগৃহের দিকে মাথা রাখিয়া মরিয়া রহিয়াছে।

* * *

সরুরামের ক্রিয়াকাণ্ডের পর আসামবাসীগণ শান্তি আশ্রমের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল বটে, কিন্তু কেহই তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল না। সুতরাং তাহাদের ভিতর অধ্যাত্ম-আলো প্রবেশ করাইবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রণীত পুস্তকের দু'এক খানির অসমীয়া সংস্করণ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। পরে আর্য্যদর্পণেও অসমীয়া ভাষায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে লাগিল। এত বড় একটা দেশ ধীরে ধীরে যেন অধ্যাত্মজগৎ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছিল। শঙ্করদেবের পর কত মহাপুরুষ আসিয়াছেন কিন্তু আসাম কাহারও বাণী গ্রহণ করে নাই। আজ শান্তি আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীসঙ্ঘের "ন মৃত্যু র্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদাঃ, পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম। ন বন্ধু র্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্" এবং গৈরিক বসনাবৃত সুকুমারমতি উৎফুল্ল ব্রহ্মচারী বালকগণ কর্ত্তৃক পঠিত "ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, তমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥"—প্রভৃতি স্তোত্র অরুণোদয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী নিদ্রিত আসাম-বাসীর কর্ণে যে সঞ্জীবনী সুধা ঢালিয়া দিল তাহার ক্রিয়া অমোঘ হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমশঃ আশ্রমের পরম বিরুদ্ধাচারী অসমীয়াগণ পরম মিত্র হইয়া দাঁড়াইল। এমন কি স্থানীয় আদালতও কোন প্রকার দান (charity) করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে শান্তি আশ্রমকে দান করিতে থাকিলেন।

যে অধ্যাত্ম-সম্পদ লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর আসামের নিভৃত উপত্যকায় লোক-কোলাহল হইতে দূরে শান্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—তাহার সন্ধান পাইয়া দলে দলে শিক্ষিত তরুণদল আশ্রমে যোগদান করিয়া তাহার রূপান্তর ঘটাইতে থাকিল। ক্রমেই আশ্রমের কর্ম্মের দিকে সুদূর বঙ্গবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে থাকিল এবং এমনকি সুদূর বার্ম্মা ও সিংহল হইতেও প্রবাসী বাঙ্গালীর সাড়া পাওয়া যাইতে লাগিল এবং বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরকে যাহাতে বৎসরে একবার পাইতে পারে ভক্তগণ তজ্জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বঙ্গের পাঁচটী বিভাগের বিভাগীয় শিষ্যভক্তগণ সুদূর আসামে গিয়া বৎসরে অন্ততঃ একবারও শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে যাইতে না পারায় তাঁহারা প্রত্যেক বিভাগে এক একটা আশ্রম গড়িয়া তুলিয়া উক্ত শান্তি আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে থাকিলেন, যাহাতে বৎসরে অন্ততঃ একবার দু'বার করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত মিলিতে পারেন। সুতরাং শান্তি আশ্রম শুধু সাধনার কেন্দ্রস্বরূপ না হইয়া বরং সত্যলাভের পথ ও অধ্যাত্মভাব অন্যত্র সঞ্চার করায় ইহার প্রকৃত আকার ধারণ করিল এবং শ্রীশ্রীঠাকুর শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত সরস্বতী সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় শান্তি-আশ্রম ধীরে ধীরে "সারস্বত মঠ" রূপে গড়িয়া উঠিতে থাকিল। মকদ্দমাদি সব মিটিয়া গেল এবং কিছু কিছু প্রচারও হইতে থাকিল। তখন সন্ন্যাসী সেবকগণের মধ্য হইতে যোগানন্দের—ভারতের সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ ও তৎপর সাধনা করিয়া সত্যলাভের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি একদিন সরাসরি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট নিজের মনোগত ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দিত হইয়া বলিলেন—

দুটী সর্ত্তে আমি তোমাকে অনুমতি দিতে পারি। প্রথম সর্ত্ত, ভারতের সর্ব্ব তীর্থ পরিভ্রমণ করিবার সময় কখনও গেরুয়ার সুযোগ লইয়া রেল কোম্পানীকে ফাঁকি দিবে না। লোকের নিকট ভিক্ষা করিয়া

টিকিট কাটিয়া প্রয়োজন বোধে ট্রেনে ভ্রমণ করিবে। দ্বিতীয় সর্ত্ত, তীর্থ ভ্রমণের পর তিন বৎসরে সাধনা সমাপনান্তে ফিরিয়া আসিবে।

* * *

অতঃপর স্বামী যোগানন্দ ভারতের সর্ব্ব তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া মেদিনীপুর জেলার কাঁথি হরিসভায় আসিয়া অবস্থান করিতে থাকিলেন। তথা হইতে তিনি মঠের ঠিকানায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানি শ্রীশ্রীঠাকুর "পরিব্রাজকের পত্র" শিরোনামা দিয়া বঙ্গাব্দ ১৩২৩ সালের "আর্য্যদর্পণের" চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশ করিলেন। আর্য্যদর্পণে মুদ্রিত দীর্ঘ পত্রের কিয়দংশ এইস্থানে উদ্ধৃত হইল।

আর্য্যদর্পণ—১৩২৩ সাল চৈত্র মাস

পরিব্রাজকের পত্র

কাঁথি, হরিসভা,
১লা মাঘ, ১৩২৩ সাল।

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

* * *

ঠাকুর, এক্ষণে তোমার দ্বিতীয় আদেশটা পালনের চিন্তা করিতেছি—তুমি আমাকে আদেশ করিয়াছ যে "সত্যলাভ করিয়া পুনরায় আমার সহিত দেখা করিবে, তিন বৎসরের মধ্যে উহা সম্পন্ন করিবে এরূপ সঙ্কল্প করিয়া বাহির হও।"

ঠাকুর, আমি তোমার নিকট বালকটী ছিলাম। আমার মনে হয় এখনও বালকই আছি এবং ভবিষ্যতেও তোমার নিকট বালকই থাকিব। আমায় বল, আমি কি করিব? কিরূপে সত্যলাভ করিব? কি উপায় অবলম্বন করিলে তোমার আদেশ পালন হইবে। শুনিয়াছি যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে হইলে যোগ-সাধন আবশ্যক। আমাকে যদি সেই সাধন করিতে হয়, তবে কোন্ যোগ কি ভাবে কতদিন সাধন করিতে

হইবে। কোন্ সময়ে আরম্ভ করা উচিত, দুগ্ধ ফলাদি আহার করিয়া থাকিতে হইবে কি না? মৌন অবলম্বন কিম্বা অন্য কোন প্রকার বিশিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে কি না? কিরূপ স্থানে করিতে হইবে? মাটীতে নীচে কোন গুহা করিয়া বসিতে হইবে কি না—এই সমস্ত বিষয় যথাযথভাবে উপদেশ না পাইলে কিরূপে সাধনে প্রবৃত্ত হইব? এই সমস্ত উপদেশ গ্রহণের জন্যই যদি সাক্ষাৎ উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন হয় তবে সেরূপ আদেশ পাইলে সাক্ষাৎ পৌছিব। তোমার মুখেই শুনিয়াছিলাম যে গারোহিলে তুমি সঙ্গে করিয়া রাখিয়া আসিলে সেখানে সাধনে সুবিধা হইতে পারে। এ সম্বন্ধে কামাখ্যা পাহাড়ে কিরূপ সুবিধা তাহাও আমি অবগত নহি। * * * * * * ঠাকুর, আর কতদিন দূরে ভুলাইয়া রাখিবে। আমাকে তোমার করিয়া লও। শ্রীচরণে যেমন আশ্রয় দিয়া ধন্য করিয়াছ, তেমনি প্রকাশ হইয়া ধন্য কর—জ্ঞাননয়নে তোমাকে দেখিয়া জীবন সার্থক করি। একবার কৃপা কর প্রভু। তোমার মহত্ত্বের নিকট আমার আমিত্বের বলিদান হ'ক। * * * *

ইতি

হতভাগ্য যোগানন্দ।

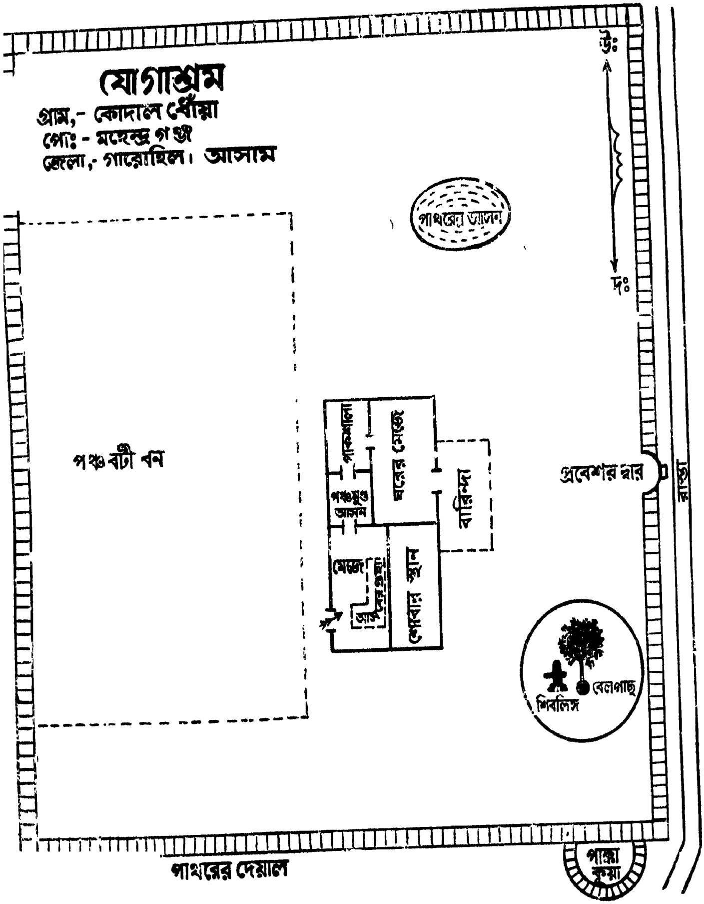
গারোহিল যোগাশ্রম—যথাসময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ আসিল যে যোগানন্দকে গারোহিলে যাইতে হইবে। তত্রত্য অধিবাসীদের সাহায্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের এককালে অধ্যুষিত স্থানে তাহাকে সাধনা-নিরত হইতে হইবে। আবশ্যকবোধে শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য ভক্ত মদন, সীতারাম প্রভৃতির সাহায্য লইতে হইবে। নিজে পাক করিয়া খাইতে হইবে; কিন্তু পাক করিবার সময়ে চুল্লীর অগ্নির তাপ হইতে শরীরকে রক্ষা করিতে হইবে এবং অগ্নির তাপ হইতে শরীরকে রক্ষা করিতে এক খণ্ড পাথর চুল্লীর সম্মুখে রাখিয়া তাপ নিবারণ করিতে হইবে। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে



গারোহিল যোগাশ্রম

প্রসিদ্ধ বিল্ববৃক্ষমূলে শ্রীশ্রীঠাকুরের পর্ণকুটীর স্থলে একখানি টিনের ঘর

গারোহিল যোগাশ্রমের নক্‌সা



(সরকারী ওভারসিয়ার শ্রীখেলারাম বর্ম্মণ মহাশয়ের সৌজন্যে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার মহাশয়ের প্রেরিত যোগাশ্রমের নক্‌সা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল।)

একমাত্র শরণাগত দুই চার জনকে শিষ্য করিতে পারিবে, অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাহাদের সাহায্য লইতে পারিবে কিন্তু প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী হইয়া শিষ্য করিতে পারিবে না।

অতঃপর যোগানন্দ আসাম রওনা হইলেন। তুরা হইতে ৫০ মাইল দুর্গম পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া হাজং বস্তীতে উপস্থিত হইয়া তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যভক্তদের সহিত পরিচিত হইলেন। সীতারামের ছেলেদিগকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অধ্যুষিত সেই পূত ভূমির সন্নিকট হইলে হাজং বস্তীবাসী ছেলেরা আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। তাহারা দূর হইতে একটা বিল্ববৃক্ষকে নির্দ্দেশ করিল। যোগানন্দ দেখিলেন যে স্থানটী বৃক্ষগুল্ম শাখা-প্রশাখা ঢিলা লতার আবেষ্টনীতে এমন জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে সেসব স্থানে সূর্য্যকরসম্পাতও ভালভাবে হয় না। দিনের বেলায়ই পাখীর কলরবে এই নিভৃত প্রদেশ মুখরিত। সাপ বাঘও এই ঘন ছায়াশীতল স্থানে বেশ রাজত্ব করিতেছে বলিয়া মনে হইল। তখন সীতারামের পুত্রকে যোগানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—শ্রীশ্রীঠাকুরের আস্তানা ছিল এককালে এখানে। তোমার বাবা শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য। তোমরা এই পবিত্র স্থানকে কেন জঙ্গলে পরিণত হ'তে দিলে?

যোগানন্দের প্রশ্নের উত্তরে সীতারামের পুত্র জানাইল যে সে এক সময় এইস্থানে তামাকের চাষ করিবে বলিয়া লাঙ্গল লইয়া আসিয়াছিল। লাঙ্গল চাষ দিতেই তাহার পীঠে কিল পড়িতে লাগিল কিন্তু সে কোন লোক দেখিতে পাইল না। তারপর তাহার গায়ে ফোঁটা ফোঁটা উষ্ণ রক্ত পড়িতে লাগিল। উপরের দিকে তাকাইয়া সে দেখিতে পাইল যে একটি ছিন্নমুণ্ড শূন্যে ঝুলিতেছে এবং সেই ছিন্নমুণ্ড হইতে টস্ টস্ করিয়া তপ্তরক্ত তাহার গায়ে পড়িতেছে। উহা দেখিয়া সে লাঙ্গল গরু ছাড়িয়া দিয়া ঐস্থান হইতে পলায়ন করিল। তদবধি এখানে আর কেহ আসে নাই। সেইজন্য এস্থান জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে।

মহাপুরুষের আস্তানায় চাষ করিতে আসিয়া সে বিভীষিকা দেখিয়া পলাইয়া গিয়াছিল উহা যোগানন্দ বেশ বুঝিতে পারিলেন। তিনি তখন নিজহস্তে ঐ জঙ্গল পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর ২।১ দিনের পর পাহাড়িয়াগণ যোগানন্দকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। যে বিল্ববৃক্ষের নিম্নে একটী ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর ছিল সেইটি শ্রীশ্রীঠাকুরের আস্তানা—সেই পূত ভূমির জঙ্গল পরিষ্কৃত হইল। এই সেই স্থান যেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেমোন্মাদের সময় কত অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া এই স্থানের ধূলিকণা সিক্ত করিয়াছিল। প্রেমোন্মাদ ঋষির তপ্তশ্বাস যেন শীতল বায়ুকে উষ্ণ করিয়া রাখিয়াছে—বৃক্ষগুল্মকে এখনও জড়াইয়া রহিয়াছে। তপ্ত প্রেমাশ্রুতে যেন এখনও সে মাটী তপ্ত রহিয়াছে। প্রকৃতি জঙ্গল দিয়া এই পূত ভূমির পবিত্রতা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। যোগানন্দ শুনিয়াছিলেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর পরীক্ষামূলকভাবে একটা পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাধনা করিয়াছিলেন—তান্ত্রিক সাধনার সত্যতা পরীক্ষা করিতে—এখন দেখিলেন যে সে পঞ্চমুণ্ডী আসনও ধরিত্রী তাঁহার বুকে সযত্নে ধরিয়া রহিয়াছেন।

বোধিদ্রুমের নিম্নে বুদ্ধদেবের বজ্রাসন যেমন আজ পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—যোগানন্দও তাঁহার গুরুর আস্তানার এই সিদ্ধপীঠকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করিতে যত্নবান হইলেন। বড় বড় পাথর ঢিলালতায় বাঁধিয়া ৩০।৩৫ জন একত্রিত হইয়া এবং কখনও কখনও মহিষের সাহায্যে রোমাই নদীর জলে ভাসাইয়া টানিয়া আস্তানায় আনিয়া বিল্বমূলে রাখিলেন। পঞ্চমুণ্ডী আসন পাথর দিয়া বাঁধাইলেন। বিল্বমূলে পর্ণ-কুটীরের স্থানে একটী টিনের ঘর বাঁধিলেন। কড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম অঙ্কিত করিলেন। পঞ্চবটী রোপণ করিলেন, একটা কুয়া খনন করাইলেন এবং ভূগর্ভে একটা সাধন-গুহা করিয়া নিজে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতি-বিজড়িত এই সিদ্ধপীঠই

এখন হইতে "গারোহিল যোগাশ্রম" নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধি লাভ করিতে থাকিল।

ক্রমে গারোহিল যোগাশ্রমের উপর লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। যোগানন্দের নিকট অনেক লোক দীক্ষিত হইতে থাকিল। প্রতিষ্ঠা তাঁহার একটা যোগবিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইল। অপর বিঘ্ন হইল—তাঁহার শরীর নানাপ্রকার ব্যাধির মন্দির হইয়া দাঁড়াইল। সাধনার সামর্থ্য আর রহিল না। মরণাপন্ন ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত হইলেন। তখন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট পত্র লিখিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত হইল :—

সারস্বত মঠ
২৩।২।২৫ বাং

কল্যাণবরেষু—

* * * * তুমি নানা কারণে বিশেষতঃ শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ক্রিয়াদিতে হতাশ হইয়া পড়িয়াছ এবং মৃত্যুই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিতেছ। বৎস! মৃত্যুর প্রার্থনা আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। যাঁহার ইচ্ছায় এ জগতে আসিয়াছ, মৃত্যুও তাঁহার ইচ্ছায় হইবে। তাঁহার ইচ্ছায় যোগ জপ সাধনা ব্যতীতও মুহূর্ত্তে মানুষ ধন্য হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহারই ইচ্ছায় সম্পূর্ণ নির্ভর কর। আর সাধন ভজন কিছু না করিতে পার, পড়িয়া পড়িয়া তাঁহার নাম কর, মরিয়া লাভ কি? * * * ইতি—

আঃ—
শ্রীনিগমানন্দ

যোগানন্দের অসুখ ক্রমে বাড়িতে লাগিল। ব্যবসায়ীগণ যাহারা মৈমনসিংহে যাতায়াত করিত তাহাদের নিকট হইতে যোগানন্দের

অসুখের কথা তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের বাড়ীতে পৌছিল। তখন স্বামী যোগানন্দের পূর্ব্বাশ্রমের শ্যালক ও স্ত্রী দশবৎসরবয়স্কা একমাত্র কন্যা শ্যামসোহাগিনী ও অন্যান্য ৭।৮ জন লোক লইয়া গারোহিল—কোদাল-ধোয়ার হাজং বস্তীতে গিয়া উপনীত হইলেন। পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া হাজং বস্তীতে উপনীত হইলে যোগানন্দ তাঁহাদিগকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের শ্যালক বলিলেন, "আপনার অসুখের সংবাদ শুনেছি, তাই এসেছি। আপনি সংসার ত্যাগ করেছেন, ভাল; কিন্তু আপনি কাহাকেও আমমোক্তারনামা (**Power of attorney**) দিয়া আসেন নাই। জমিদারের বাকী করে সব জমা-জমি বিকিয়ে যাচ্ছে। এরূপ স্থলে আপনার কর্ত্তব্য, একবার দেশে গিয়ে একটি আমমোক্তারনামা রেজিষ্ট্রী ক'রে দিয়ে আসা"। যোগানন্দ তাহাদিগকে জানাইলেন যে তিনি এখন সুস্থ হইয়াছেন বটে তবে দেশে যাওয়া সম্বন্ধে গুরুর অনুমতি ব্যতীত 'হাঁ' বা 'না' কিছুই বলিতে পারেন না।

অতঃপর তাঁহারা ব্যর্থমনোরথ হইয়া ময়মনসিংহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন বটে কিন্তু অন্য একটা যোগবিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। সেবক ভগবান ব্রহ্মচারীকে লইয়া যোগানন্দ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ভগবান ব্রহ্মচারী মঠের সেবক কিন্তু কার্য্য উপলক্ষে গারোহিলে আসিয়া স্থানটী সাধনানুকূল দেখিয়া যোগানন্দের কাছেই থাকিয়া প্রায় দুই বৎসর কাল তাঁহার সেবাযত্ন করিয়াছে। এখন কিছুদিন হইতে তাহার আল্‌জিহ্বায় যন্ত্রণা (**Tonsilitis**) এবং তৎসঙ্গে জ্বরও হইতেছে। এখানে ভাল ডাক্তার পাওয়া যায় না। অতিকষ্টে একজন ডাক্তার সন্ধান করিয়া তাহাকে দেখান হইয়াছিল। তিনি বলিলেন ইহার আল্‌জিব পাকিয়া উঠিয়াছে, শীঘ্রই অস্ত্রোপচার না করিলে বিষাক্ত হইয়া যাইবে এবং রোগী মারা যাইবে। যোগানন্দ বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ভগবান

ব্রহ্মচারীর জীবন বিপন্ন দেখিয়া তিনি অগত্যা তাহাকে লইয়া ময়মনসিংহে নিজের বাড়িতে আসিলেন এবং উক্ত ব্রহ্মচারীকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কর্ত্তব্য বিষয়ে নির্দ্দেশ পাওয়ার জন্য যোগানন্দ মঠের ঠিকানায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে পর পর তিনখানি পত্র লিখিলেন। কিন্তু একখানি পত্রেরও উত্তর আসিল না। বাড়ীতে আসিয়া তিনি বাকী কর, বিগত তিন বৎসরের পাওনা ধান প্রভৃতি আদায় করিতে থাকিলেন। এদিকে বিনা অস্ত্রোপচারেই—মাত্র ঔষধের দ্বারাই ভগবান ব্রহ্মচারী হাসপাতালে নিরাময় হইতে থাকিল। পর পর তিনখানি পত্রের উত্তর না পাওয়ায় যোগানন্দের শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর অভিমান হইল। তাঁহার মনে হইল, "স্বগৃহে এসেছি—এই অপরাধে যদি মঠে ঢুকিতে না-ই দেন, তবে গারোহিল ত' আছেই।" এই অভিমানের ফলে মঠের সহিত তাঁহার যোগসূত্র ছিন্ন হইল। ময়মনসিংহে যোগানন্দের পরিচিত সর্ব্বত্র রটিয়া গেল যে যোগানন্দ পুনরায় গৃহী হইয়াছেন এবং তাঁহার সন্তানাদিও হইতেছে। কিছুদিন পরে যোগানন্দের সহিত মঠের একটী সন্ন্যাসী সেবকের সাক্ষাৎ হইল। তাহার নিকট যোগানন্দ আনুপূর্ব্বিক সব কথা খুলিয়া বলিলেন এবং মঠের সেবকগণ তাঁহার সন্তানাদি হইতেছে এইরূপ দুর্নাম রটনা করিয়া লোকসমাজে তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিতেছে তাহাও জানাইলেন। যথাসময়ে সন্ন্যাসী সেবকটী শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যোগানন্দের অভিমানের কথা যথাযথ বিবৃত করিল। শ্রীশ্রীঠাকুর সব শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহাকে যোগানন্দ-লিখিত একটীও পত্র দেওয়া হয় নাই। কুৎসার ভিতর কোন সত্যতা নাই জানিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন —মঠের সেবকরাই যদি একজন সহকর্ম্মী ও গুরুভাই-এর পত্রাদি না দেয় এবং এরূপ কুৎসাদি রটনা ক'রে রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষি করে তবে

মঠাশ্রম-জীবনে ও সংসারী-জীবনে পার্থক্য রইল কি? মঠে থেকেই বা লাভ কি?

* * *

যাহা হউক মঠের সহিত যোগানন্দের আর কোন সম্পর্ক রহিল না, তবে শেষ পর্য্যন্ত তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত যোগাযোগ রাখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত যোগানন্দের প্রাণের যে একটী নিবিড় সম্বন্ধ ছিল তাহা শ্রীশ্রীঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত পত্র দেখিলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পুরী
৪।৪।৩৮

স্নেহের যো—,

তোমার পত্রখানা যথাসময়ে পাইয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। মধ্যে আমি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। উৎকট কাশি ও দুর্ব্বলতা কিছুদিন ছিল, এখনও একটু একটু আছে, তবে ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছি। একারণে উত্তর দিতে বিলম্ব হইল, ক্ষুণ্ণ হইও না। ভক্ত-শিষ্যে অনেকেই ত আমাকে "তুমি" "তোমার" বলিয়া থাকে, তবে তোমার লেখাতেই বা কিছু মনে করিব কেন? সম্ভ্রমে দূরত্ব রক্ষা করে, আর "তুমি" "তোমার" শব্দ ঘনিষ্ঠতার পরিচায়ক। গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ নিকট হইতেও নিকটতম সম্বন্ধ; প্রকৃত গুরু-শিষ্য এক আত্মা, কায়া ভিন্ন মাত্র। আবার উচ্চ স্তরে উঠিলে গুরুই কায়া, শিষ্য ছায়া মাত্র। এইরূপে একদিন ছায়া কায়ায় মিলাইয়া যাইবে। সুতরাং ইহা তোমার অলীক স্বপ্ন নহে, দুরাশা বা অসম্ভবও নয়; ভালবাসাই এ মিলনের সেতু। আমি জানি তুমি আমাকে কিরূপ ভালবাসিতে; সেদিনের কোন কথাই ত ভুলি নাই। তোমরাই যে এই সন্ন্যাসীর অন্তর্নিহিত রসকে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার আকর্ষণে বাহিরে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলে, কঠিনকে সহজ বা সরস করিয়াছিলে!

তোমাদের মধ্যে অনেকেই একে একে আনন্দধামে চলিয়া গিয়াছে, তাই আজ আবার সে রস ও আনন্দ অন্তরে লুপ্ত। বাহিরে কঠোর কর্ম্মী সাজিয়া কতকগুলা বালকের সঙ্গে কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছি। সে আনন্দ আর বাহিরে প্রকাশ হইতেছে না, সজোরে বার্দ্ধক্য আক্রমণ করিতেছে, সে জীবনের সাথীদের মধ্যে তুমিই অবশিষ্ট, তাই তোমার পত্র পড়িয়া আজ যুবকের আনন্দে এত কথা লিখিয়া ফেলিলাম নতুবা প্রাণ খুলিয়া প্রাণের কথা বলিবার আর লোক নাই, ভাব ও ভাষা সুপ্ত। বৎস! নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে পূর্ব্বের ন্যায় নির্ভর করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিয়া চল; মাঝে মাঝে আবর্ত্তে পড়িলেও নিশ্চয় জানিও তাহা কখন স্থায়ী হইবে না। একদিন আবার তোমাদের লইয়া আনন্দধামে উপনীত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রেমরস-মাধুর্য্যের সম্ভোগে আনন্দময় হইয়া যাইব। এখানকার অন্যান্য কুশল। শ্রীমতী ক্ষী— ও স্নে—কে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ দিবা। তুমি আমার প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী

ঠাকুর

শ্রীশ্রীঠাকুর আসাম মঠ পুরুষের সাধন-ভজনের জন্য ও বেদান্তচর্চ্চার কেন্দ্র করিয়াছিলেন; দুঃস্থ অনাথা বিধবাদের অনুরোধেও তদ্রূপ সাধন-ভজনের জন্য তিনি কাশীধামে গম্ভীরায় একটী আশ্রম স্থাপন করিয়া অসামান্যা প্রতিভাশালিনী বালবিধবা কুসুমকুমারী দেবীর উপর কর্ত্তৃত্বের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। কুসুমকুমারী দেবী, যিনি পরে "শান্তি মা" নামে পরিচিতা ছিলেন, তিনি পাবনা জেলার ৺রোহিণীকুমার বাগচীর পত্নী। তিনি ধনী শিক্ষিতা ও শক্তিমতী মহিলা ছিলেন। আধ্যাত্মিক সাধনায় তিনি যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, শারীরিক

ব্যায়ামচর্চ্চায়ও তদ্রূপ পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি আত্মরক্ষার্থ সর্ব্বদা ১খানি ছুরি (Dagger) বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিতেন।

সন্ন্যাসীদের মঠত্যাগ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন—সন্ন্যাসের কোন সাধনা নাই। প্রকৃত সন্ন্যাস যাহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—তাহার শুধু মহাবাক্য বিচার ও মননে স্বরূপজ্ঞান ফুটিয়া উঠিতে বাধ্য। অপরিশুদ্ধ আধারের দরুন গুরুকৃপা লোকে উপলব্ধি করিতে পারে না এবং গুরুর সান্নিধ্য হইতে দূরে গেলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। গুরুপ্রদত্ত নিষ্কাম কর্ম্মকে সাধনা বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। গুরু ত্রিকালদর্শী। তিনি যাহাকে দিয়া যে কাজ হইবে সেই কাজ দ্বারা গুণক্ষয় করিয়া লইয়া থাকেন। পশ্চাতে টান থাকিলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। সর্ব্বাসক্তিবর্জ্জিত হইতে হইবে এবং আসক্তির কারণ হইতে দূরে থাকিতে হইবে। এই প্রসঙ্গ বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক কথাই বলিলেন। অবশেষে শ্রীধর স্বামীর সন্ন্যাসগ্রহণের উপলক্ষ্যে একটী ঘটনা বিবৃত করিলেন—

শ্রীধর স্বামী সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে কিছুদিন হইতে বিচার করিতে থাকিলেন যে তিনি সংসার-আশ্রমেই থাকিবেন অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। তৎকালীন সমাজের নিয়মানুসারে অতি অল্প বয়সেই লোকের বিবাহ হইত। শ্রীধর স্বামীর সন্ন্যাসের প্রথম বাধা—তাঁর স্ত্রী। ভাবিতেছেন তিনি অনেক কিছু। তখন রাত্রি কাল, একটী প্রদীপ স্তিমিত ভাবে জ্বলিতেছে। গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন তাঁহার তরুণী স্ত্রীর জন্য এবং সদ্যঃপ্রসূত একটি সন্তানের কথা। কে তাহাদের আহার যোগাইবে—কে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে? প্রদীপটীর নিকটে আলো—আর চারিদিকে অন্ধকার, কয়েকখানি পুঁথি এদিকে ওদিকে প্রদীপের নিকটেই পড়িয়া আছে। পুঁথির দিকে লক্ষ্য পড়িতেই একটী পিপীলিকার উপর দৃষ্টি পড়িল। দেখিতে পাইলেন পিপীলিকাটি

প্রদীপের নিকটেই বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে—কেবলই ঘুরিতেছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া অভিনিবেশ সহকারে পিপীলিকার এই বৃত্তাকারে ঘুরিবার কারণ কি বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময় ঘরের চাল হইতে একটী টিক্‌টিকির ডিম ঐ বৃত্তের ভিতর পড়িয়া ফাটিয়া গেল। পিপীলিকাটী তখনও পূর্ব্বের মতই ঘুরিতেছে। এদিকে টিক্‌টিকির ডিমটা মাটীতে পড়িতেই ফাটিয়া গেল এবং ফাটা ডিম হইতে একটী বাচ্চা বাহির হইয়া পিপীলিকাটীকে ধরিয়া গলাধঃকরণ করিয়া চলিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, পরমকারুণিক জগদীশ্বর প্রত্যেকটী জীবের জন্য তাহার জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই আহার সংস্থান করিয়া রাখিয়াছেন। এই বিশ্বাসের অভাবেই তিনি তাঁর স্ত্রী-পুত্রের জন্য এত চিন্তা ও দুর্ভাবনা করিতেছেন। সুতরাং জগদীশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া তিনি নিশ্চয়ই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন স্থির করিলেন। এই ঘটনায় শ্রীধর স্বামীর একটী দিক খুলিয়া গেল। স্ত্রীর আহার-সংস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া এবং ভগবদ্বিশ্বাস লইয়া গৃহ হইতে তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যে ভগবৎ অন্বেষণে গৃহত্যাগ করে—ভগবৎ-শক্তি তার পরিবারের উপর দৃষ্টি রাখেন।

* * *

হরিদ্বার কুম্ভ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৩২২ সাল হইতে ১৩২৯ সাল পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর মঠেই অবস্থিতি করেন। এই সাত বৎসরের ভিতর মঠের সাধনোপযোগী বাহ্যিক আকার যেরূপ ধারণ করিয়াছিল তাহার যথাযথ বর্ণনা পাকুটীয়া হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব গণিত শিক্ষক শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার লেখনী-মুখে যেরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন তদধিক আমার কিছু বলিবার নাই বলিয়া উহার অংশবিশেষ এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

সারস্বত মঠ—"যোরহাট সহর হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে মঠ। মঠের তিন দিকে ২।১ মাইলের মধ্যে লোকের বসতি নাই। এক দিকে মাইল খানেক দূরে মিরি নামক স্বভাবসরল পার্ব্বত্য জাতি-অধ্যুষিত একখানি ছোট গ্রাম। গ্রামখানির নিকট দিয়া মরিয়ানী হইতে জোরহাট হইয়া লাইট রেলওয়ে লাইন কোকিলামুখ পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঐ লাইন হইতে মঠের বিশাল গৈরিক পতাকা উড্ডীয়মান দেখা যায়। উত্তরদিকে পর্ব্বতরাজ হিমালয়, পূর্ব্বে উদয়গিরি এবং দক্ষিণে নাগা পর্ব্বত পশ্চিমদিকেও কিছুদূর পর্য্যন্ত আসিয়া কালো মেঘের মত ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আকাশে মেঘ না থাকিলে হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গ ও দিগন্তে প্রসারিত পর্ব্বতমালার বিরাট গম্ভীর ছবি প্রাণমন বিমোহিত করে। মঠের পার্শ্বদেশ দিয়া পার্ব্বত্য নদীর ক্ষুদ্র একটী খাল প্রবাহিত রহিয়াছে। রেলওয়ে লাইন হইতে একটী অল্প প্রশস্ত কাঁচা রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া মঠ পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। প্রবেশপথের দুই পার্শ্বে নাগেশ্বর ফুলের নাতিদীঘ বৃক্ষবাজি সমোচ্চভাবে শ্রেণীবদ্ধ রক্ষিগণের ন্যায় দণ্ডায়মান। * * বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র; তাহার নিকটেই প্রকাণ্ড গোশালা। পুকুরের ঈশান কোণে রমণীয় বিল্ববৃক্ষের কুঞ্জমধ্যে শিবালয় ও যোগ-সাধনার কুটীর। পশ্চিম দিকে অসংখ্য গন্ধ-পুষ্পে সুশোভিত, সুবিন্যস্ত পুষ্প-বৃক্ষের সুরম্য কাননের মধ্য দিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে। সম্মুখে শান্তি আশ্রম,নিগমাগম পাঠাগার এবং দাতব্য ঔষধালয়। বাম দিকে ব্রহ্মচারী-নিবাস, তাহার উত্তরোত্তর দক্ষিণে আর্য্যদর্পণ মাসিক পত্রিকার মুদ্রণ-কার্য্যালয়, তাঁতশালা, নানা বৃক্ষছায়া-স্নিগ্ধ ঋষিবিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড শিক্ষা-ক্ষেত্র, সেবকদিগের কুটীর ও অতিথিশালা; শান্তি আশ্রমগৃহ পার হইয়া চতুষ্কোণ আঙ্গিনার উত্তরের ভিটায় মঠের আসন-গৃহ, পশ্চিমে ব্রহ্মচারী ও সেবকগণের পাকশালা এবং দক্ষিণে ভাণ্ডার-গৃহ। আসন গৃহের উত্তর-পশ্চিম কোণে নাতিদূরে মনোরম পঞ্চবটী অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ-গাম্ভীর্য্যে প্রতিষ্ঠিত

রহিয়াছে। সমস্ত মঠায়তনের বায়ুমণ্ডল সুগন্ধি কুসুম, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ ও অগুরুর মনোহর গন্ধে অমোদিত; সর্ব্বত্র একটা ঘনীভূত ভাব-সঞ্চারিত মহাশক্তির অনুভূতি, সর্ব্বত্র শান্ত-গম্ভীর নিস্তব্ধতা, সর্ব্বত্রই মনের উপর একটা বিরাট অন্তরাভিমুখী অপ্রতিহত প্রেরণা।

প্রাচীন ইতিহাস, পুরাণ ও কাব্য-গ্রন্থাদিতে তপোবনের বর্ণনা পাঠ করিলে কল্পনাবলে মানসপটে যে চিত্রের উদয় হয়, এই সারস্বত মঠে তদনুরূপ চিত্র প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। তেজোদীপ্ত ব্রহ্মচারী বালকগণের সহাস্য প্রফুল্লবদন, কায়মনোবাক্যে কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, গোচারণ, হল-চালন, ত্রিসন্ধ্যা সন্ধ্যাবন্দনা, পুষ্পচয়ন, শাস্ত্র অধ্যয়ন, তপস্যা আর যম-নিয়ম; সব প্রাচীন তপোবনের অক্ষুণ্ণ চিত্র। সে যেন সংসার-কোলাহলের বহু উর্দ্ধে, বহুদূরে, যুগ-যুগান্তরের সিদ্ধ ঋষি-মুনি-সেবিত হিংসাদ্বেষবর্জ্জিত, পবিত্র, শান্ত, নিভৃত প্রদেশে বাস।"

হিমাদ্রির সানুপ্রদেশে অবস্থিত সারস্বত মঠ হইতে গুরুশক্তি বাংলা এবং আসাম, উড়িষ্যা, রাজপুতনা, মধ্যভারত, ইন্দোর ও গুজরাট প্রভৃতির প্রবাসী বাঙ্গালীর ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিল। জনপদের সাহিত্যসেবী গৃহস্থগণ রামকৃষ্ণ-মিশন ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়-ভুক্ত হওয়ায় তাহাদের পরিচালিত লোকমতগঠনকারী প্রভাবশালী সংবাদপত্রের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া সারস্বত মঠ দিন দিন ধর্ম্মপিপাসু-গণের মতের উপর অধ্যাত্মভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিল। মঠ হইতে প্রকাশিত আর্য্যদর্পণ নামক মাসিকপত্র শিষ্যভক্তগণের মধ্যেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ। সংবাদপত্র দ্বারা বহিঃপ্রচারের চেষ্টা শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিপ্রেত ছিল না, কারণ অন্তঃসারশূন্য হইয়া কেবল বহিঃপ্রচারের চেষ্টায় সময় নষ্ট করিলে কিছু ফল সাময়িকভাবে হইতে পারে বটে, কিন্তু সত্য যাহা তাহা ধীরে ধীরে শিকড় গাড়ে—বড় গাছ যাহা তাহা ধীরে ধীরে বাড়ে। সারস্বত মঠের সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের ও তদন্তর্গত শিষ্যভক্তের সাধন-তৎপরতায়

মুগ্ধ হইয়া কেহ হয়ত স্বেচ্ছায় আসিবে, নাহয় না আসিবে। কারণ আধ্যাত্মিকতা কখনও সার্ব্বভৌম হইতে পারে না, উহা বিশাল জগতের ভিতর মুষ্টিমেয়ের জন্য। দল বাঁধিয়া আড়ম্বর করিয়া বা কোন প্রকার শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কোন সাধনাই হইতে পারে, না। কোথায়ও যদি কেহ মনে করে এরূপভাবে ফল হইতে পারে তবে ভিতরে ব্যক্তিগতভাবে কে কতটুকু উন্নত হইয়াছে তাহা দেখিতে যদি আত্মবিচার করে তখনই সে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে। যেখানেই ত্যাগ—প্রেমের বিকাশ সেখানেই। এতদ্ভিন্ন যদি কেহ বড় লেখক হয়, যদি বড় বক্তা হয়, যদি অত্যধিক শারীরিক বা ঐন্দ্রজালিক কসরৎ দেখাইতে পারে, তাহাকে উন্নত বলা যায় না। প্রচার সাহায্যে সম্প্রদায় বা লোকসংখ্যা আশাতীত-ভাবে বৃদ্ধি করিয়া যাওয়া সারস্বত মঠের কখনও উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু তাহা না হইলে কি হইবে? সারস্বত মঠ তাহার বিজয়বার্ত্তা সগৌরবে নানা দিকে ঘোষণা না করিলেও সরকারী বড় বড় শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীগণ মঠের কার্য্যে আকৃষ্ট হইয়া মঠ দেখিতে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত পরিচিত হইতে থাকিলেন। যে সমস্ত শক্তিমান পুরুষ লোক পরিচালনা করেন, সরকার তাঁহাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধেও সরকারের সে বিধি-নিষেধ কখনও লঙ্ঘন করা হয় নাই। পূর্ব্বে যে সরকার শ্রীশ্রীঠাকুরকে বহুলোক পরিচালনা করিবার জন্য সংশয়-সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া নজরে নজরে রাখিতেন, পরে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া ক্ষান্ত হইলেন। পরন্তু উক্ত মঠকে যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন তাহা কয়েকটী কারণে বেশ বুঝিতে পারা যায়। ১৯১৯ সালে শিক্ষা সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য স্যাডলার কমিশন-এর বৈঠক বসিলে উক্ত কমিশন বর্ত্তমান শিক্ষার ভিতর ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের মতামত জানিতে চাহেন। উহা যথাসময়ে জানান হয়। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার মহামান্য হাইকোর্টে

চন্দ্রনাথের মোহান্তের গদীর দাবী সম্বন্ধে ১৯১১ সালের ৩৯৮ নং রেগুলার আপীলের মকদ্দমা যখন দায়ের হয় তখন মোহান্তের শিক্ষার ভার কোথায় দেওয়া যায় তদ্বিষয়ে তদন্ত করিয়া রিপোর্টের জন্য মহামান্য হাইকোর্ট শ্রীহট্ট জেলার তদানীন্তন জেলা জজ আর, আর, গার্লীক আই. সি. এস. এর উপরে আদেশ জারি করেন। উক্ত জজ সাহেব হরিদ্বারের ঋষিকুল গুরুকুলের শিক্ষায়তন ও কোকিলামুখের ঋষিবিদ্যালয়—এই উভয়স্থলেই প্রবেশ লাভ করিয়া মোহান্তের শিক্ষা লাভ করিবার বয়স অতিক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া রিপোর্ট দাখিল করেন। এতদ্দ্বারা সারস্বত মঠের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং ভিত্তি যে কতটা সংযম ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা সহজেই অনুমেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অবসর গ্রহণ—শ্রীশ্রীঠাকুর মঠের কর্তৃত্বভার বরদা নামে একজন যুবক ব্রহ্মচারীর উপর ন্যস্ত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন শুনিয়া সবাই অল্পবিস্তর দুঃখিত হইল। কেহ বুঝিল না যে কেন শ্রীশ্রীঠাকুর এত তাড়াতাড়ি এ পন্থা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এ-সব আত্মিক জগতের ব্যাপারে যে রহস্যের লীলা সঙ্গোপিত আছে তাহা কেহ অনুধাবন করিতে পারিল না, করিতে চেষ্টাও করিল না। যাঁহার ইঙ্গিতে তিনি কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন—আবার তাঁহারই ইঙ্গিতে শিষ্য-সেবকদিগের উপর উহা ন্যস্ত করিয়া—বাহ্যিক কর্ম্মের বোঝা যত কিছু তাহাদের উপর চাপাইয়া তাহাদের মঙ্গল চিন্তা লইয়া ১৩২৯ সালের

৪ঠা বৈশাখ পাঁচ জন সেবক সঙ্গে ৺পুরীধামে গোয়েঙ্কা ধর্ম্মশালায় উঠিলেন। ১০ দিন শ্রীশ্রীঠাকুর এই ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিয়াছিলেন। মানগোবিন্দ নামে একজন পাণ্ডা মন্দির হইতে প্রসাদ আনিয়া দিত। অতঃপর কমলকামিনী মন্দির নামে একটা বাড়ীতে উঠিয়া যান। সেখান হইতে মন্দিরের সিংহদুয়ার তিন মাইল পথ। বালক ব্রহ্মচারী হরিদাস শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগাদি রন্ধন করিয়া এই তিন মাইল পথ অতিবাহন করিয়া প্রতি দিন হাটে বাজার করিতে যাইত। এই ভাবে প্রায় দুই মাস কাল শ্রীশ্রীঠাকুর এই বাড়ীতে ছিলেন। এদিকে মঠসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য বরদা ব্রহ্মচারী চালাইতে থাকিলেন। বরদার কর্ম্মশক্তি প্রচুর; তাঁহার পিতাও সন্ন্যাসী ছিলেন। বরদা আকুমার ব্রহ্মচারী, প্রবেশিকা পাশের পর হইতে স্বপাকে আহার করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের খরচে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতে এম. এ. পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। যুবকের উপর সহসা মঠের "আর্য্যদর্পণ" মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় কার্য্যভার, বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের পরিচালনা ভার দেওয়ায় কলিকাতার সংবাদপত্র "বঙ্গবাসী" সম্পাদকীয় মন্তব্যে টিপ্পনী করিয়া লিখিলেন, "অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুর এম.এ. উপাধিধারী ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের দ্বারা ব্রহ্মচারী তৈয়ারী করিবেন!" বাস্তবিকই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী কেহ মঠের কেন্দ্রে না থাকিলে কিছুরই স্ফুরণ হইতে পারে না—ইহা সত্য। কিন্তু অধ্যাত্মরাজ্যে যাঁহারা বিচরণ করেন তাঁহাদের কার্য্যকলাপ বোধগম্য হওয়া সময় ও পর্য্যবেক্ষণ-সাপেক্ষ। পুস্তকাদি লিখিয়া ও মঠ গড়িয়া একটী বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র তৈয়ারী করিবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্ববিধাতৃবিধানেই সেই তৈয়ারী ক্ষেত্রে যে বীজবপন করিয়াছেন তাহা যাহাতে ভালভাবে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে সেই চেষ্টাই হইতেছে গুরুগিরি। পাখীর ডিমে তাপ সহযোগে ভিতরের বীজ স্বরূপ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হয়। মৎস্য ডিম প্রসব করিয়া তৎপরে সেই

বীজের উপর তাকাইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টির তাপে ডিম ফুটিয়া উঠে। কচ্ছপ যেখানে-সেখানে ডিম পাড়িয়া আহারান্বেষণে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া বেড়ায়, কিন্তু তাহার মনটা থাকে ঐ ডিমের দিকে। সে যথা তথা বিচরণশীল হইলেও গভীর ভাবে ডিমের ধ্যান করে। এই ধ্যানের তাপে ডিম ফুটিয়া উঠে। ইহা একটী গল্প-কথা নহে। সহজ অবস্থাপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণও প্রথমে শিষ্যভক্তের সহিত মিলিয়া অবশেষে কোথায় তাহাদের গলদ তাহা জানিয়া লইয়া তাহাদের সহিত ভালবাসার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া একস্থানে স্থির হইয়া বসেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার শিষ্যের বিরাট বহরের সহিত যেখানে যেমন সেখানে তেমন থাকিয়া তাহাদের সহিত মিশিয়া অবশেষে পুরীতে গিয়াছিলেন তাহাদের মঙ্গল চিন্তা লইয়া। সুতরাং শ্রীশ্রীঠাকুর একজন সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়-প্রত্যাগত যুবক কুমার ব্রহ্মচারীর একনিষ্ঠতা, তাহার ভক্তি ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া মঠের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বভার তাহার উপর অর্পণ করিয়া পুরীতে আসিলেন। মঠ সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য গিরি-কুটীর নামে একটী বাড়ী ভাড়া করা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য ৺অশ্বিনীকুমার দাশগুপ্ত সাব-জজ মাঝে মাঝে দীর্ঘ ছুটী লইয়া সপরিবারে পুরীতে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বাসস্থান গিরিকুটীরে থাকিতেন। পুরীতে বাড়ীভাড়া অত্যধিক হওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য গোবর্দ্ধন মঠের অধীনে নীলাচল কুটীর নামক একটি পাকা বাড়ী ৬০০০·০০ টাকা মূল্যে খরিদ করা হয়। গিরিকুটীর অশ্বিনীবাবু ভাড়া লইয়াছিলেন সুতরাং কে না কে বাস করে কে তাহার খবর রাখিত? তবে সমুদ্রতীরে যখন শ্রীশ্রীঠাকুর ভ্রমণ করিতেন এবং সেবক বালক ব্রহ্মচারী হরিদাস যখন তাঁহার পাদুকা লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিত—তখন সেই বেলাভূমিতে ভ্রমণকারীগণের দৃষ্টি স্বতঃই

শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে আকৃষ্ট হইত। তারপর যখন নীলাচল কুটীর খরিদ করা হইল এবং শ্রীশ্রীঠাকুর গোবৰ্দ্ধন মঠের প্রজা হইলেন, তখন প্রথমেই এই মঠের দৃষ্টি তাঁহার উপর আকৃষ্ট হইল; যখন অনেক চিঠিপত্র, মণিঅর্ডার ও টেলিগ্রাম আসিতে লাগিল তখন পোষ্টাফিসের কর্ম্মচারী-বৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। অতঃপর যখন প্রতি সপ্তাহে ষ্টেশন হইতে পার্শেল ডেলিভারী লইতে হইত তখন রেলের কর্ম্মচারীবৃন্দের দৃষ্টি পড়িল; ক্রমশঃ পাড়া-প্রতিবাসীদের সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। অবশেষে অনেকেই শুনিল যে এই বাড়ীতে "যোগীগুরু"-গ্রন্থপ্রণেতা স্বামী নিগমানন্দ বাস করিতেছেন। তিনি সন্ন্যাসী অথচ নেংটি পরিধান করেন না, বেশের বেশ পারিপাট্য আছে দেখিয়া মনটায় একটু ধাক্কা খাইয়া লোক আর তাহার সহিত মিশিল না। উভয় দিকই রক্ষা হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর যে উদ্দেশ্য লইয়া পুরীতে আসিয়াছিলেন সে উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হইল। যে সব শিষ্যভক্ত পুরীতে আসিতে আরম্ভ করিল ও চিঠিপত্র লিখিয়া তাঁহার সময় নষ্ট করিতে লাগিল, তাহা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই আর্যদর্পণের মারফতে শিষ্যভক্তকে চিঠিপত্র লিখিতে এবং পুরী গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত দেখা করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে প্রথমত সাময়িক ভাবে শিষ্যভক্তের মনে একটু কষ্ট হইল বটে কিন্তু যাঁহারা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন তাঁহারাই শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। গুরুর সহিত স্থূল সম্বন্ধ অপেক্ষা সূক্ষ্ম সম্বন্ধই যে বেশী কার্য্যকরী তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া অবশেষে অক্ষম হইয়া তাহাদেরই মঙ্গল কামনায় এই নির্জ্জন বাস তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন। নীলাচল কুটীরে উপরে দু'টী কুঠরী আছে তন্মধ্যে একটিতে শ্রীশ্রীঠাকুর থাকিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রকোষ্ঠ হইতে যাহা সর্ব্বপ্রথমেই দৃষ্টির বিষয় ছিল তাহা দিগন্তপ্রসারী ফেনিল নীল অনন্ত বারিধি। বক্ষ তার উচ্ছ্বাসে চঞ্চল—আকাশের শেষ, সমুদ্রের শেষ যাহা কিছু, তাহা উভয়ের স্পর্শদোষের

মসী-মলিন ক্ষীণ রেখা মাত্র। এই প্রকোষ্ঠে শয্যার উপর বসিয়া সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া তিনি আমাকে ও মতিদাকে বলিয়াছিলেন, "যখনই ঐ দিকে তাকাই—দু'এক মিনিটেই সমাধি এসে যায়।" এর কিছুক্ষণ পরে বলিলেন "আর তোদের মঙ্গলচিন্তা—এখানকার এইই আমার কাজ।" কথাগুলি এখনও আমার কানে বাজিতেছে। এই ঘরের ভিতর কাহাকেও বিশেষ যাইতে দেওয়া হইত না। ৺হরিদাস বা ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী এই পালঙ্কের নিম্নে শয়ন করিত। পুরীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের দৈনন্দিন জীবন যেরূপ ভাবে অতিবাহিত হইত তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

নিতান্ত কর্ম্মক্লান্ত দেহ যখন বিশ্রাম চায় তখন যেমন অলসতার কোলে মানুষ তাহার দেহকে ছাড়িয়া দেয় শ্রীশ্রীঠাকুরের ঠিক তদ্রূপ অবস্থা হইয়াছিল বলিয়া মনে হইত। তাঁহার নিদ্রার বহরটা যেরূপ ছিল এরূপ আমরা অন্য কোন সাধুসন্তের সম্বন্ধে অবগত নই। ২৪ ঘণ্টা দিবারাত্রির ভিতর সুদীর্ঘ ১৬ ঘণ্টাই যাঁহার নিদ্রা তিনি আবার কিরূপ মহাপুরুষ? এরূপ আর একটি সাধুরও সন্ধান পাওয়া যায় না যিনি ২৪ ঘণ্টার ভিতরে ১৬ ঘণ্টাই নিদ্রার ভিতর নিজকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এমন কি ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় নিদ্রার আহ্বান ও জাগরণ, কখনও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

নিদ্রা তমোগুণসম্ভূত—নিদ্রা অর্থে অজ্ঞানে প্রবেশ করা বুঝায়। ঐ নিদ্রায় সুখ কি? সাধু যিনি হইবেন তিনি রাত্রির চতুর্থ প্রহরে উঠিয়া ধ্যানস্থ বা সমাধিস্থ হইবেন; অন্ততঃ তাহা না হইলেও অতি প্রত্যূষে ত অবশ্যই উঠিবেন। কাশীতে অবস্থানকালে একমাত্র স্বামী ভোলানন্দ গিরি ব্যতীত অন্য যে কোন সাধুই শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে প্রাতে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ৮টার সময় যখন শুনিতে পাইতেন যে তিনি শয্যা হইতে উঠেন নাই তখন ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া হাই তুলিতে তুলিতে সে স্থান ত্যাগ করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন নিদ্রিত থাকিতেন তখন

পৌষ মাস না হইলে অন্যান্য কালে প্রায় সমস্ত রাত্রিই তাঁহাকে হাওয়া করিতে হইত। পৌষ মাসেও কখন কখনও হাওয়া করিবার প্রয়োজন হইত। ব্রহ্মচারীদের যখনই হস্ত শিথিল হইয়া পাখা বন্ধ হইবার উপক্রম, তখনই শ্রীশ্রীঠাকুর যত রাত্রিই হউক না কেন "উ!" করিয়া উঠিয়া সাড়া দিতেন। হাত হইতে পাখা বদলাইবার সময়—রাত্রি ১টা হউক কিম্বা ৩টা হউক তখনই ঐ "উ!" শব্দ শুনা গিয়াছে। যদি কেহ সেই প্রকোষ্ঠের ভিতর নিঃশব্দপদসঞ্চারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে কিম্বা খুব নিম্নস্বরে কথা বলিয়াছে তখনই শ্রীশ্রীঠাকুর "উ!" করিয়া উঠিয়াছেন। উচ্চ শব্দে বা চীৎকারে তাঁহার এ নিদ্রার ব্যাঘাত হইত না বলিয়াছেন। আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিদ্রার স্বরূপ যেরূপ বুঝিয়াছি, ইহা ঠিক আমাদের নিদ্রার ন্যায় অগাধ অজ্ঞানে প্রবেশ করা নহে। শ্রীশ্রীঠাকুরের এইরূপ নিদ্রার ভিতর কখনও স্বাস্থ্যের জন্য কোন সময় যে অজ্ঞানে প্রবেশ করেন নাই এরূপ বলিতে পারি না—হয়ত ১৬ ঘণ্টার ভিতর ১ ঘণ্টার জন্য আমাদের নিদ্রার অনুরূপ নিদ্রা গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই নিদ্রার অবস্থাটা শিষ্যদের মঙ্গল-ধ্যান ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। একজন শক্তিশালী পুরুষ চিন্তা দ্বারা অপরের মঙ্গল সাধন করিতে পারেন। গুরুর আত্মবিস্তৃতিই যে সে মঙ্গলের নিদান! শিষ্যসমষ্টির হৃদয়ের ভিতর নিজেকে সম্প্রসারিত করিয়া বা তাহাদের হৃদয়ে নিজের আসন করিয়া লইয়া তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিয়া লওয়া মাত্র। শিষ্য গুরুর দিকে ঝুঁকিতে থাকিলে তাহার অন্য দিকের আসক্তি ক্রমেই কমিয়া আসিতে থাকে। গুরুর প্রবল আকর্ষণেই শিষ্যের মঙ্গল। কারণ যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু নির্ম্মল সকলই যে তিনি। তাঁহার দিকে যে যতই আকৃষ্ট হইতে থাকিবে তাহার ততই মনোবিকাশ এবং জ্ঞানের উন্মেষ হইয়া মোহনিদ্রার অবসান হইতে থাকিবে। তখনই সে গুরুকে সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে অতি সুন্দর দেখিবে। অপরে তাহার

ভাবের হেতু খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না। একজন পুরুষ কেন যে আর একজন পুরুষকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়—ইহা অপরে দেখিয়া অবজ্ঞা করে বটে, কিন্তু তাহাদের সে অবজ্ঞার হাসি যে অজ্ঞানপ্রসূত তাহা তাহারা খোঁজ রাখে না।

ভগবানের সহিত মিলিত হইলেই প্রকৃতপক্ষে আত্মবিস্তৃতি হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজমুখে বলিয়াছেন "আমি যখন দেখি তখন তাঁর সহিত মিলিত হইয়া দেখি—তাঁর সহিত একীভূত হইয়া দেখি—তাঁর কানে আমার কান—তাঁর চোখে আমার চোখ!" সুতরাং শ্রীশ্রীঠাকুরের নিদ্রাটী শিষ্যভক্তের মঙ্গল ধ্যান ভিন্ন আর কিছুই নহে। জাগ্রতাবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর দৈনন্দিন আবশ্যকীয় চিঠিপত্র লিখিতেন। কখনও কখনও বা মাসিক পত্র ও দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করিতেন। নীলাচল কুটীরে আসিয়া প্রথমাবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর "নিগম-সূত্র" বলিয়া একখানি গভীর গবেষণাপূর্ণ পুস্তক লিখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে কি কি বিষয় লেখা হইবে তাহা একখানি খাতায় নোট করিয়াছিলেন, ইহা আমরা দ্বিতীয় ভাগের প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়াছি।

যোগনিদ্রায় শিষ্যের মঙ্গলচিন্তা—দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টার ভিতর ১৬ ঘণ্টাই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিদ্রা। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, শিষ্যভক্তের মঙ্গলচিন্তাই সেই নিদ্রার স্বরূপ। এ নিদ্রা অজ্ঞানে প্রবেশ নহে—ইহা যোগনিদ্রা। তত্ত্বদর্শীদের উপর মানবজগতের অজ্ঞান নাশের ভার ন্যস্ত হয়। অজ্ঞানের স্তরভেদ আছে। বিভিন্ন স্তরের অজ্ঞান নাশের ভার তত্ত্বদর্শীদের উপর ন্যস্ত হয়; যিনি যত ক্ষমতাশালী তাঁহার উপর তত বড় স্তরের ভার পড়ে; বড় স্তর বলিতে অধিকতর অজ্ঞান অন্ধকার বুঝায়। কাহারও কাহারও শক্তি অনুসারে একাধিক দেশের অজ্ঞান স্তরের ভার বহন করিতে হয়। যাঁহার উপর যত বেশী অজ্ঞানের ভার ন্যস্ত হয়, তাঁহার শিষ্যবহরের মধ্যে আত্মবিস্তৃতি করায় বাহ্য কর্ম্মের

প্রসার করিতে তিনি বাধ্য হন। বেশী পরিমাণ অজ্ঞানের ভার বহন করিতে গিয়া নিজের পতনেরও * যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে; তাঁহারা কর্ম্মের ভিতর এমনভাবে ঝাঁপাইয়া পড়েন যে কর্ম্মই ভগবান হইয়া পড়ে; ফলে তাঁহারা ভগবান হইতে দূরে সরিয়া পড়েন। ইহাও একপ্রকার পতন। শিষ্যদিগকে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ভিতর আনিয়া ফেলিতে না পারিলে তাহাদের অজ্ঞান নাশ ও মনোবিকাশ করা যায় না। এই কর্ম্মের প্রসার করিতে গিয়া তত্ত্বদর্শীরও পতনের ভয় আছে। কারণ অধ্যাত্ম-কারণবশতঃ নানা অবস্থার ভিতর নিজেকে ফেলিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে হয়। এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া অনেক সময় পুনরায় মুক্ত হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। সাধনা করিয়া প্রারব্ধভোগ হ্রাস ও অজ্ঞান নাশ করা বড় সহজ কথা নহে; সবারই সাধনানুকূল শরীর নহে। অনেকেরই বিশ্বাস নাই, শিক্ষা নাই, ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা নাই, আহার্য্য নাই ইত্যাদি কারণে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বা অন্য কোন প্রকার কর্ম্ম—যদ্দ্বারা বহুলোকের উপকার হয়, সেই কর্ম্মের গণ্ডির ভিতর ফেলিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া তিনি তাহাদের মালিন্য নাশ করিয়া দেন।

আসাম ও বঙ্গের ভিতর শ্রীশ্রীঠাকুরের কর্ম্মের বোঝা এরূপভাবে এত দ্রুত প্রসার হইল যে শিষ্য ভক্ত প্রভৃতি আশ্রিত জনের উপর বাহ্যিক কর্ম্মের ভার দিয়া তিনি তাহাদের ভিতর শক্তিসঞ্চার করিবার জন্য পুরীতে আসিয়া অবস্থান করিলেন। কারণ তাঁহার মনটাই যদি কর্ম্মে ঝালাপালা হইয়া যায় তবে যাহাদের ভার তাঁহার উপর, তাহাদের চিন্তা করিবেন কখন?

---

* শঙ্করাচার্য্যের পতনের সম্ভাবনা হইয়াছিল, যখন তান্ত্রিক উভয়ভারতীকে পরাস্ত করিবার জন্য কামকলাতত্ত্ব শিক্ষা করিতে তাঁহাকে অমরুক রাজার দেহে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। মীননাথেরও ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল।

সহজভাব বা দিব্যজীবন—শ্রীশ্রীঠাকুরের দুর্ব্বোধ্য স্বরূপের হেতু কি এখন তাহাই বলিব। গুরুস্থানীয় জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ তাঁহার বিকিরণভাব সঙ্কোচ করিয়া যখন সাধারণ মানুষের ন্যায় অবস্থান করেন অর্থাৎ তাঁহার অলৌকিক ভাব ও শক্তিসমুদয় প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন, তখন তাঁহার সেই দিব্যজীবনকে 'সহজ' আখ্যা দেওয়া হয়। সহজ অর্থে সহজিয়া নহে। আত্মগোপনকারী সাধারণবেশী মানুষ। বিভিন্ন সাধনার দ্বারা সিদ্ধ হইয়া তিনি যেমন দিব্যজীবন লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার অনুগত জনও তাঁহারই ন্যায় দিব্যজীবন লাভ করুক। তজ্জন্য তিনি কাহাকেও কোন এক বিশেষ আদর্শে আবদ্ধ করিতে চাহেন নাই। তাঁহার মতে যিনি বহুরূপী হইয়া জগতে বিরাজ করিতেছেন তিনি বিশেষ বিশেষ ভাবেই ফুটিয়া উঠিবেন। প্রতি মানুষের ভিতর দিয়া তাঁহার স্বতন্ত্রভাব প্রকট হইবে। প্রত্যেকেরই একটী সহজ ভাব অর্থাৎ নিজস্ব ভাব বর্ত্তমান আছে। কাহাকেও কোন একটী বিশেষ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিলে তাহার ব্যক্তিত্বে বাধা প্রদান করা হয়। কারণ সর্ব্বপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতাহীনভাব, সর্ব্বপ্রকার সামাজিক সঙ্কীর্ণতা, গোঁড়ামি ও সংস্কারবর্জ্জন ব্যতীত মানব তাহার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করিতে পারে না। চৈনিক রমণীর লৌহজুতা ব্যবহারে তাহার পদদ্বয় যেমন সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সংস্কার সামাজিক সঙ্কীর্ণতা ও আদর্শবাদে আবদ্ধ হওয়ায় মানব স্বতন্ত্রভাবে স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে না। সুতরাং সহজ মানুষের কাছে আদর্শবাদ ব্যক্তিত্বক্ষুণ্নকারক। সহজ মানুষ সহজ তাঁহার নিজের কাছে। অপরে সমাজের কোন স্তরেই তাঁহাকে খাপ খাওয়াইতে পারে না বা কোন আদর্শের পাশেই তাঁহাকে দাঁড় করাইতে পারে না। সহজ মানুষ না ত্যাগী, না ভোগী

বলিয়া প্রতীয়মান হন। ভালমন্দ, শুভাশুভ, পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্মে আসক্তি-বিরক্তি, কোন অবস্থার ভিতরে তাঁহাকে ফেলা যায় না বলিয়া লোকের মনে দুঃখ হয় এবং দুনিয়ায় বাহিরে এক অদ্ভুতপ্রকৃতিবিশিষ্ট স্বচ্ছন্দ বিচরণকারী বলিয়া তাঁহাকে নিজেদের গণ্ডি হইতে তাহারা বাহির করিয়া দেয়।

এই শ্রেণীর মানবের বহু বৎসর যাবৎ অনুসরণকারী যাহারা তাঁহাকে বুঝিবে বা বুঝিয়াছে বলিয়া অহঙ্কার করে, তাহারা তাঁহার স্বরূপ কখনই বুঝিতে পারে না বরং অবশেষে তাঁহার বহিরাবরণ দেখিয়া একটি ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া যায়। সহজ মানুষ তাঁহার শিষ্যের কোন কুটিলগতি দেখিতে পান না। তাহারা ঠিকপথে যাইতেছে বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস। কারণ সবার ভিতরে সেই অনাদিসম্ভূত বীজ আপনিই ফুটিয়া উঠিবে।

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের ভিতরে যাঁহারা "সহজ" অবস্থা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম কাঠিয়াবাবার জীবনে আমরা কি দেখি? কাঠিয়াবাবা সাধুবেশধারী হইলেও তাঁহাকে কেহ আত্মতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া বুঝিত না। সাধুবেশের মধ্যে শুধু একটী কাঠের কৌপীন ভিন্ন অন্য কোন পরিচয় বড় বেশী ছিল না। তাঁহার ব্যবহার এতই সাধারণ ভাবের ছিল যে তাঁহার ভিতর যে তত্ত্বজ্ঞান নিহিত ছিল তাহা একমাত্র তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত বা কৃপাসিদ্ধ সন্তদাস বাবাজী ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে পারে নাই। সন্তদাস বাবাজী কাঠিয়াবাবার জীবনীতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

'শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের (শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবাজী) কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া আমি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলাম। তথায় যাইবার পূর্ব্বে আমি ভাবিয়াছিলাম যে হয়ত গিয়া দেখিব যে তিনি অধিকাংশ সময় সমাধিস্থই থাকেন, অথবা এইরূপ অন্য কোন

অলৌকিকভাবে থাকিয়া কাল যাপন করেন, কিন্তু তথায় গিয়া দেখিলাম যে তিনি অতিশয় সাধারণ অপেক্ষাও সাধারণ লোকের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছেন। নিত্য নিজে প্রাতে বাজার করিতে যান এবং খুব দর-কষাকষি করিয়া শাক তরকারী প্রভৃতি জিনিষপত্র বাছিয়া বাছিয়া খরিদ করেন। নিজে কাঁধে করিয়া সেই সমুদয় বাজার হইতে লইয়া আসেন। অপর কোন চেলার দ্বারা জিনিষপত্র খরিদ করাইলে খুব কড়াকড়ি করিয়া তাহার হিসাব লন। সেবাকুঞ্জের নিকট রাস্তার পাশে সকালে বিকালে বসেন। যাত্রীসকল এই রাস্তায় গমনাগমন করে; কেহ সিকি পয়সা, কেহ আধ পয়সা, কেহ বা একটী পয়সা তাঁহাকে ভিক্ষা দেয়। একটী পয়সা কোন যাত্রী দিলে বড় প্রসন্ন ভাব দেখান। ব্রজবাসী কেহ কেহ আসিয়া তাঁহার নিকট বসিয়া গাঁজা খায় এবং যাত্রীদের রাস্তায় যাইতে দেখিলে কখনও কখনও বলিয়া উঠে, "আরে ইয়ে দুধহারী বাবা হ্যায়, এ দুধ পিকে রতা হ্যায়, উন্‌কো কুছ্ দেও।" ব্রজবাসীগণ যাত্রী-দিগকে কখনও ঐরূপ আহ্বান করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া হাসিতে থাকেন। এইরূপে দুই বেলা কিছু পয়সা সংগ্রহ করিয়া আশ্রমে লইয়া আসেন। এবং সেই পয়সা অতি যত্নে নিজের কাছে রাখেন। অপর কাহাকেও তাহা স্পর্শ করিতেও দেন না। যেন চুরি করিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা। সন্ধ্যার পর আশ্রমে বসিয়া যখন আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলেন তখন ভগবৎপ্রসঙ্গ একবারও করেন না। জিনিষ-পত্রের মহার্ঘতা ইত্যাদির কথা, জল কোন্ স্থানের ভাল, কোন্ স্থানে মন্দ ইত্যাদির কথা, কে ধনী কোন্ কালে তাঁহাকে টাকা দিয়াছে ইত্যাদির কথা, জয়পুরের রাজা আসিবে এবং আসিয়া অবশ্য তাঁহাকে নিত্য পাঁচ মূর্ত্তির খোরাক বন্দোবস্ত করিয়া দিবে এবং ঐ রাজা কর্ত্তৃক মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবার সময় তাঁহাকে অবশ্য অনেক অর্থ দিবে ইত্যাদির কথা লইয়া ব্রজবাসীদের সঙ্গে বসিয়া গল্পগুজব করিতেন। কখনও বা সামান্য কারণে

অথবা অকারণে রাগ করিয়া কোন শিষ্যকে চিম্‌টা দ্বারাই আঘাত করিলেন। এবং নানাবিধ অশ্লীল কথা *** বলিয়া বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে গালি দিতে থাকিতেন।

'যে কেহ পয়সা দেয় তাহার প্রশংসা করিতে লাগিতেন। অমুক ব্যক্তি কিছু দেয় না, সে কোন কর্ম্মের লোক নহে—এই বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন। এবং সাধারণতঃ অভয়বাবুর প্রতি খুব স্নেহ এবং আমার প্রতি কিছু কঠোর ও ভিন্নভাব দেখাইতে লাগিলেন।

'তাঁহার একটী ছোট ঘোড়া ছিল। এক দিবস সেই ঘোড়াটী যথাসময়ে আশ্রমে ফিরিল না। তাহার জন্য শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বৈশাখ মাসের দ্বিপ্রহর রৌদ্রের সময় মাঠে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার সন্ধান পাইলেন না। আশ্রমে আসিয়া বলিলেন, "আমার ঘোড়া চলিয়া গিয়াছে। বদ্‌মায়েসরা কেহ লইয়া গিয়া থাকিবে। এখন কি করিব ?" তখন তাঁহার পূর্ব্ববর্ণিত চেলা গোঁসাইয়া আশ্রমে উপস্থিত ছিল। সে তাহার উভয় নাসিকার নিশ্বাস বেগের সহিত পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "বাবাজী মহারাজ, কুছ্ চিন্তা মৎ কর ; তোমারা ঘোড়া আ যায়গা।" তিনি বলিলেন "আ যায়গা ?" সে বলিল, "হাঁ মহারাজ, ঠিক আ যায়গা।" তিনি যেন তাহাতে আশ্বস্ত হইলেন।

'একদা তথায় জনৈকা কামুকা স্ত্রীলোক তাঁহার পুরুষত্ব পরীক্ষা করিতে আসিলে তিনি নির্ব্বিকার হইয়া গরিবদাসকে বলিলেন,"তু থোড়া হট যা।" তিনি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইলেন। স্ত্রীলোটী অবশেষে সরিয়া পড়িল। চোর চুরি করিতে না পারিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া দুঃখ কষ্ট জানাইলে তিনি সহানুভূতি জানাইতেন।

'জয়পুরের মহারাজা বৃন্দাবনে আসিয়া রাজসভায় তাঁহাকে পরম সমাদরে রাজসম্মানে সম্মানিত করিলেন। কিন্তু সভাভঙ্গের পর তিনি ফটকের সম্মুখে বসিয়া দারবানের সঙ্গে গাঁজার ধূমপান করিতে থাকিলেন।'

* * *

শ্রীশ্রীঠাকুর "সহজ" অবস্থা লাভ করিলেও তাঁহাকে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার ভিতর পরমাত্মতত্ত্ব ও ভাবতত্ত্ব এই দ্বিবিধ তত্ত্ব মূর্ত্ত হইয়াছিল। তাঁহার সহজাবস্থা নিষ্কাম কর্ম্মযোগের প্রসারবৃদ্ধির হেতু না হইয়া একেবারে আত্মগোপনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া শান্তির পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল।

কাঠিয়াবাবা যতদিন স্বেচ্ছায় তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত না করিয়াছিলেন ততদিন সন্তদাস বাবাজীর ন্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যভক্তগণও বিশেষতঃ তাঁহার পার্শ্বচর সন্ন্যাসীগণ তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে না বুঝিয়া বিশেষ বিচলিত হইতে থাকিলেন। কারণ তাঁহারা তাঁহার মধ্যে কোন বিভূতির বিকাশ দেখিতে পাইতেন না। তাঁহারা পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভিতর যে সমস্ত শক্তির স্ফুরণের বিষয় শুনিয়াছেন এবং কিছু কিছু প্রত্যক্ষও করিয়াছেন বর্ত্তমানে তাহা মোটেই দেখিতেছেন না, এবং তিনি কোন সাধুর আচরিত নীতিও অনুসরণ করিতেছেন না। সাধু যিনি তিনি অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিবেন কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা ৯টায় শয্যাত্যাগ করেন, গৃহস্থের ন্যায় বেশাদি ধারণ করেন, আহারাদিরও বিশেষ কিছু বিচার নাই, স্ত্রীপুরুষের সহিত অবাধে ও নিঃশঙ্কে মেলামেশা করেন, ভগবৎপ্রসঙ্গ ত মোটেই করেন না বরং যাঁহারা তাঁহার নিকট উপদেশ-প্রার্থী হইয়া আসিতেছেন, নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাঁহাদের এক এক জনকে এক এক প্রকার উপদেশ প্রদান করিতেছেন। মতের কোন মিল নাই। কাহাকেও বলিলেন "চিত্তবৃত্তি নিরোধ না করিলে মনঃসংযম

অসম্ভব, সুতরাং দেহকে সুস্থ রাখিয়া লয়যোগানুসারে সাধন করিলে অতি সত্বর তুমি ফল পাইবে।" আবার কাহাকেও বলিলেন—"যোগে টোগে বাপু ভগবান পাওয়া যায় না, অন্ততঃ আমি ত জানি না। ভক্তিতেই মুক্তি,—ভক্তিযোগে মন্ত্র জপ কর,—তাঁর কাছে কান্নাকাটি কর।" আবার কাহাকেও বলিলেন—"শক্তি বিনা মুক্তি হাস্তায় কল্পতে। শক্তির আরাধনা করিলেই ত তিনি পথ ছাড়িয়া দিবেন।" আবার কাহাকেও বলিলেন—"জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বেদান্তোক্ত সাধন-চতুষ্টয়ের পথ অবলম্বন করিতে হইবে।" কোন সময়ে আবার মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতিকে প্রত্যেকের ধর্ম্মমত ঠিক রাখিয়া তাহাদিগকে সাধন করিতে কতকগুলি প্রক্রিয়া গোপনে শিখাইতে থাকিলেন। তাহারা আবার তৎপ্রদত্ত সাধনার দ্বারা আশাতীত ফল পাইতে থাকিল। আবার কাহাকেও বলিলেন, "কিছুই করিতে হইবে না—আমাকে বিশ্বাস করিয়া আমার উপর নির্ভর কর।" নীতিবিবর্জ্জিত মানুষ বলিয়াই ইঁহাকে ধারণা হইল,—নিশ্চয় দুনিয়াদারীই ইঁহার ব্যবসায়। কিন্তু যোগৈশ্বর্য্য হয়ত পূর্ব্বে লাভ করিয়াছিলেন, এখন আর নাই। সুতরাং পরিণামে অষ্টরম্ভা চুষিতে হইবে, অতএব সময় থাকিতে চম্পট দেওয়াই ভাল—মনে এইরূপ ধারণা হওয়ায় কিছুদিন পরে সত্যসত্যই বোধানন্দ, সারদানন্দ, হরিদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আরও ২।৪ জন শ্রীশ্রীঠাকুরকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। ইঁহাদের ভিতর কেহ কেহ আবার ভারতের নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া—নানাপ্রকার সাধুর সঙ্গে মিশিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী তাঁহার "শ্রুতিস্মৃতি"তে লিখিয়াছেন যে সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে যখন তিনি চলিয়া যান তখন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"যদি তোমার মনের মত কোন ব্রহ্মবিদ্ সন্ন্যাসী সদ্গুরু পাও তবে তাঁর কাছ থেকে সন্ন্যাস নিতে পার। আর যদি আমার চেয়ে ভাল ও তোমার মনোমত সন্ন্যাসী সদ্গুরু না

পাও এবং আমার কাছে সন্ন্যাস নেওয়ার ইচ্ছায় ফিরে আস, তা হ'লে উপযুক্ত বিবেচনা করলে সময় বুঝে আমি সন্ন্যাস দিতে পারি।"

অতঃপর দেড় বৎসর ঐ অভিপ্রায়ে ভ্রমণ করিয়া জনৈক মহাপুরুষের আশ্রয় লইতে গেলে উক্ত মহাপুরুষ স্পষ্ট ভাবে বলিলেন—"তোম্ সদ্গুরু পায়া ; যাও—উন্‌কো সেবাপূজা কর, উসিসেই সব হো যায়গা, আউর কুছ্ করনে হোগা নেহি।"

অতঃপর দেড় বৎসর পরে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন যে সমস্ত ভারত ভ্রমণ করিয়া এরূপটি আর দ্বিতীয় দেখেন নাই এবং তাঁহার কথার ন্যায় দ্বিতীয়টীর কথা শুনেন নাই। অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ যিনি যখনই ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন স্বামী প্রজ্ঞানন্দের কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া আবার আশ্রয় ভিক্ষা চাহিলেন। পুত্র প্রবাসে গেলে পিতা যেরূপ আশাপথ চাহিয়া থাকেন—শ্রীশ্রীঠাকুরও তদ্রূপ তাহাদের আশাপথ চাহিয়া থাকিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর জানিতেন কোথায় ইহাদের গলদ। শক্তিলাভের প্রয়াসী গণপতি যখন শঙ্করাচার্য্যকে ছাড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহার ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেলে যখন পুনরায় শঙ্করের পদাশ্রয়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল তখন শঙ্করের যেরূপ উৎসাহ ও আনন্দ দেখা গিয়াছিল শ্রীশ্রীঠাকুরেরও ঠিক তদ্রূপ অবস্থা হইয়াছিল। শেষ জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুর শিষ্যসেবকদের জন্য মাঝে মাঝে বড় মনঃকষ্ট পাইয়াছেন, কারণ প্রকৃতপক্ষে কেহই জ্ঞান চাহে না, চাহে শুধু প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য শক্তির কিছু কসরৎ দেখাইতে। শক্তিমানের স্বারূপ্য লাভে কেহই প্রয়াসী নহে। শক্তিমান হইলে শক্তি যে দাসীর ন্যায় সেবা করিবে এ চিন্তা তাহারা করিতে পারে না। যে যখনই ফিরিয়া আসিয়াছে, শ্রীশ্রীঠাকুর সানন্দে তাহাকে পুনরায় আশ্রয় দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন পুরীতে ছিলেন তখন ভগবদ্বিষয়ে একেবারে নীরব—একেবারে স্তব্ধ, ভিতরে তখন তাঁহার "ব্রাহ্মীস্থিতি", কিন্তু বাহিরে

একজন অতি সাধারণ মানুষ। অধ্যাত্ম বা অতীন্দ্রিয় জগৎ এবং বাহ্য স্থূল জগতের ভিতর দেহটা মাত্র সেতুস্বরূপ। উভয় জগতে তাঁহার নিকট সর্ব্বসময় আস্তরণপট উন্মুক্ত। সম্পূর্ণ সহজ ও সরল—"সংযমের" দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয় আর কিছু নাই—কারণ তাঁহার নিকট ভিতর-বাহির নাই—সব এক। ভিতর বাহির এক বলিয়াই তিনি সহজ। তিনি তত্ত্বরূপী হইলেও কেহ কখনই তাঁহার নিকট নিজেদের ত্রুটীবিচ্যুতির জন্য লজ্জিত হইবার কারণ থাকিলেও লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসেন নাই। তিনি কখনও কাহারও গুপ্ত কথা ব্যক্ত করেন নাই। কারণ জীবন্মুক্ত সহজ মানুষের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন বালকভাবাপন্ন।

দিগম্বরো বাপি সাম্বরো বা ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্‌বাপি চ বালকবদ্বা পিশাচবদ্‌বাপি চরত্যবন্যাম্‌॥

—বিবেকচূড়ামণি, ৫৪০

শ্রীশ্রীঠাকুরের বালকস্বভাব—জীবন্মুক্তের এই সমস্ত লক্ষণগুলির ভিতর শ্রীশ্রীঠাকুরের বালকস্বভাব পরিস্ফুট। তাঁহাকে নিঃসংশয়ে একটি রাজপরিবারভুক্ত বৃহদাকার সভ্য বালক বলা যাইতে পারে। ভক্তদের ইচ্ছানুযায়ী বর্ত্তমান যুগোপযোগী বেশ ধারণ ও শিশুবৎ যদৃচ্ছা আহার-বিহার করিলেও তাঁহার ভিতর বর্ত্তমান যুগোচিত পাটোয়ারী বুদ্ধির লেশ পর্য্যন্ত কেহ কোনদিন দেখিতে পায় নাই। নিতান্ত বালক যেরূপ একান্ত সরল, সহজ বিশ্বাসী ও হিংসাদ্বেষাদিশূন্য, তিনিও ঠিক তদ্রূপ ছিলেন। মানুষ যে কোনপ্রকার দোষদুষ্ট হইতে পারে ইহা আধুনিক লোকসমাজের সংস্পর্শে আসিলেও তাঁহার ধারণার বহির্ভূত ছিল। মানুষ ত দূরের কথা, অত্যন্ত হিংস্র জন্তুর হৃদয়ও প্রেমের আধার বলিয়া তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস, ইহার পরিচয়ও আমরা অনেক ক্ষেত্রে পাইয়াছি। জাগতিক যে কোন প্রকার জৈব স্বভাব এবং যে কোন প্রকার ধর্ম্ম যে প্রেমবিরোধী

হইতে পারে ইহা তাঁহার ধারণার বহির্ভূত ছিল। এই বালক-ভাবের জন্য সামাজিকভাবে তাঁহাকে অনেক কথাই শুনিতে হইয়াছে।

ভক্ত অনুগ্রহভিখারী—বালকভাবাপন্ন জীবন্মুক্তের এই "সহজ" জীবনই দিব্যজীবন। এই দিব্য জীবনে সবসময় জীবভাবেই শিবের ব্যবহার তাঁহাতে দৃষ্ট হইয়াছে। কখনও জীবের মত ব্যবহার এবং কখনও শিবের মত ব্যবহার—এরূপ নহে। এক দেহের ভিতর দিয়া দুই পৃথক মনোবৃত্তি ক্রিয়া করিতেছে বলিয়া যাহা মনে হয় তদ্রূপ নহে। এক শিবই সব সময় ক্রিয়াশীল এইরূপ দৈবীভাবে ক্রিয়াপর; এই দৈবীভাব এত সহজ যে শ্রীশ্রীঠাকুর একজন এবং শিব আর একজন—উভয়ের কর্ম্ম পৃথক পৃথক এরূপ ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা পার্থক্যবোধ আসিতে পারে না। আরও সহজ করিয়া সহজমানুষের কথা বলি। মনে করুন কোন সাধক কোন দেব বা দেবীর বীজমন্ত্র জপ দ্বারা উৎকট সাধনা করিতেছে; এইক্ষণে মন্ত্রপ্রতিপাদ্য দেব বা দেবীর দেখা দেওয়া উক্ত দেব বা দেবীর সম্পূর্ণ কৃপার উপর নির্ভর করে। কখনও বা দেখা দেন—কখনও বা দেন না। ইহা ভক্তের সহিত দেবতার কৃপার সম্বন্ধ—ভক্ত সব বিষয়ে তাঁহাদের কৃপার উপর নির্ভরশীল। কখনও কখনও ঐ দেবতা আবার তাঁহার শুদ্ধাত্মা ভক্তের পবিত্র দেহ সাময়িকভাবে অধিকার করিয়া কোন বিশেষ কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ সময়ে ঐ ব্যক্তি সেই কর্ম্মের বিষয় জ্ঞাত থাকে না। সাময়িকভাবে তাঁহার জীবচৈতন্য লোপ পায়। যখন উগ্রভৈরব খড়্গাঘাতে শঙ্করাচার্য্যের মস্তক দেহচ্যুত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন নৃসিংহদেব পদ্মপাদাচার্য্যের দেহে আবিষ্ট হইয়া ঐ খড়্গদ্বারা উগ্রভৈরবকে বধ করেন কিন্তু পদ্মপাদাচার্য্য এ সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলেন। পদ্মপাদ সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে নৃসিংহদেবের উপাসকও ঐ মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন।

ভক্তের আবেশ অবস্থা—কোন কোন সাধকের পবিত্রদেহে মাঝে মাঝে দেবতার আবেশ হয়—যে আবেশ-অবস্থার কথা তাহাদের স্মরণ

থাকে না। এ অবস্থা দুই ভাবে হয়—এক সাময়িক ভাবে দেবতারা দেহে আবিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করেন অথবা কখনও দেবদর্শনে ভাবাধিক্য হয়। আবেশ অবস্থা—অবশ অবস্থা, ভাবাধিক্য বশতঃ আনন্দ প্রাচুর্য্য অবস্থা। এরূপ অবস্থাপন্ন ভক্তমাত্রেই উচ্চশ্রেণীর ; এজন্য কোন কোন সময় দেবতার ঘন ঘন ঐ পবিত্রদেহে আবেশ হইলে সেই সেই ব্যক্তিকে ঐ ঐ দেবতার অবতার বলিতে আরম্ভ করে—যথা বিষ্ণুর অবতার, নৃসিংহের অবতার, শক্তির অবতার ইত্যাদি। সুতরাং এই সব জীবন্মুক্ত ভক্তগণের বিকিরণ ভাব সঙ্কোচ ও সঞ্চয়ের দিকে লইয়া সহজ অবস্থা লাভ করা তাহাদের আয়ত্তের ভিতর নহে—দেবতার কৃপাসাপেক্ষ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবন লাভের হেতু এই যে সাধনার দ্বারা জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ করিয়া সহজাবস্থা প্রাপ্তি একমাত্র যোগীদেরই আয়ত্তাধীন। যোগীগণ কাহারও উপর নির্ভরশীল নহেন—কাহারও অনুগ্রহভিখারী নহেন। তাঁহারা প্রচুর আত্মশক্তিবলে মহাশক্তিকে আয়ত্ত করিয়া স্বেচ্ছায় তাহাকে চালনা করেন। কোন দেবতা তাঁহাদের আত্মবিস্মৃতি আনিতে পারে না, কোন অবস্থায় তাঁহাদের আত্মবিস্মরণ হয় না। এই সব যোগীদের কৃপা দেবতাদেরও বাঞ্ছনীয়। এই জন্য গীতাকার যোগীদের অবস্থাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়াছেন—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৬।৪৬

তপস্বী, জ্ঞানী, কর্ম্মী, এর মধ্যে যোগীর অবস্থা উচ্চ বলিয়াই গুরুরূপী কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যোগী হইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু কিরূপ যোগী সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ?

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৬।৪৭

যোগসাধনায় সিদ্ধমনোরথ হইবার পরে ভাবতত্ত্বের সাধনায় যোগীশ্বর শ্রীশ্রীনিগমানন্দের যে প্রেমের ঠাকুরের অবস্থা লাভ কি প্রকারে হইয়াছে তাহা ইতিপূর্ব্বে পাঠক অবগত আছেন।

দেবতাদের ভক্তগণ কাঁহাকেও কিছু কৃপা করিতে হইলে তাহাদের উপাস্য ইষ্টদেবতাকে বলিতে হয়। কিন্তু যোগীশ্বরগণ জীবন্ত বিদ্যুতা-ধারবৎ—তাঁহারা নিজেরাই উহা করিতে পারেন—কাহারও কৃপার উপর নির্ভর করিতে হয় না।

সহজাবস্থা প্রাপ্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের গুরুভাব এত সহজ হইয়া গিয়াছিল যে লোকে তাঁহার গুরুত্বের প্রভাবে ভীত হইয়া সরিয়া না গিয়া তাঁহাকে সাধারণ লোক বলিয়া মনে হওয়ায় তাঁহার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। সাধারণতঃ দেখা যায় যে মানুষ অন্যের সহিত মিশিতে গেলে তাহাদের সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা হয় যাহাতে তাহাদের দুর্ব্বলতা অন্য কেহ ধরিতে না পারে। সহজমানুষের সঞ্চিত প্রভূত শক্তি তাঁহার গুরুভাব এরূপভাবে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখেন যে যেকেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসুক না কেন তাঁহার ভিতর এক অপূর্ব্ব আকর্ষণ অনুভব করিয়া—উভয়ের ভিতর ব্যবধান ঘুচাইয়া ফেলিয়া ভাবের আদান-প্রদান করিতে থাকেন। কিন্তু যাঁহারা অধ্যাত্ম-বিভূতি সম্বরণ না করিয়া তৎসমন্বিত হইয়া অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের কাছে একমাত্র সৎলোকই যাইতে সাহসী হয় এবং পাপী তাপী দূর হইতে সরিয়া যায়। কিন্তু সহজমানুষরূপী শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে সে বালাই ছিল না। তাঁহার ভিতর জীবসেবার শুভ ইচ্ছা ও ভাব এত প্রবল ছিল যে তাঁহার এক স্থানে বসিয়া থাকিবার উপায় ছিল না। ফেরিওয়ালার ন্যায় তিনি দেশের অলিগলি ঘুরিয়া তাহাদের সহিত নানা ছলে নানা ভাবে মিশিয়া রং ধরাইতে বা তাহাদের অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেন। কেবলমাত্র শিষ্যভক্তের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহার দিব্য জীবনের সংস্পর্শে—প্রীতির সম্বন্ধের সূত্র-

সংযোগে শিষ্যভক্তের ভিতর যে অনাদিসম্ভূত বীজ আছে তাহা অঙ্কুরিত করা যাহাতে সুখসাধ্য হয় তদ্রূপ চেষ্টা করিতেন।

কিন্তু দিব্যজীবনের অধ্যাত্ম-বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি ভাব যদি তিনি প্রকাশ না করেন তবে আশ্রিতজনগণ কি প্রকারে তাঁহার প্রতি আস্থাবান হইতে পারেন এবং পাত্রাপাত্র না বুঝিতে পারিলে কি প্রকারে তাঁহার উপর নির্ভরশীল হইতে পারেন? ইহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই বলিয়াছেন—"সহজমানুষকে ধরিয়া থাকিবার স্পর্দ্ধা কে করিতে পারে যদি না তিনি তাহাদিগকে ধরিয়া থাকেন। আশ্রিতজন যতই বহির্ম্মুখীন হন—সহজমানুষ আশ্রিতজনকে ততোধিক আকর্ষণে ধরিয়া থাকেন।" সহজাবস্থা বহুল পরিমাণে নির্গুণাবস্থা হইলেও পার্থিব বস্তুর বাসনালেশশূন্য হইয়া যেখানে ভক্তি-বিশ্বাস দেখিয়াছেন, সেখানেই মাত্র আত্মপ্রকাশ করিয়া তিনি ধরা দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ধরা দিয়াছেন খুব অল্প লোককে। সহস্র সহস্র শিষ্যভক্ত তাঁহার। কিন্তু এই ভক্তশিষ্যের বহরের গড় যে বহুল পরিমাণে অজ্ঞানের গড়, তাই এই অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য পুরীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনটী একটী সুদীর্ঘ ধ্যানস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ইহাই হইল অল্পবিস্তর শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবনের স্বরূপ—যে অবস্থার মাধুর্য্য এ যুগে এই দেবমানবটীতেই একমাত্র প্রকট হইয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মতবাদ—শ্রীশ্রীঠাকুর কোন বিশেষ মতবাদী নহেন। সব মতেই তাঁহার মত। শক্তিবাদ, ব্রহ্মবাদ, পরমাত্মবাদ ও ভক্তিবাদ বা অন্যভাবে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতভাব, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি যে ভাবেই উক্ত চারিটী তত্ত্ব বুঝান যাউক না কেন, উহার প্রত্যেক মতবাদেই ঠাকুর বিশ্বাসী। কারণ প্রত্যেক মতবাদের ভিতর দিয়া গমন করিয়া তিনি সত্যে পৌছিয়াছেন এবং প্রত্যেক মতবাদের পথের বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব লোকগুরুগণ অপেক্ষা শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার জীবদ্দশায় নানা ভাবের অধিক সংখ্যক লোকের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যাঁহাদের পরিচালন-ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহাকে শুধু আচার্য্য গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিতেন তাহা নহে, পরন্তু শিষ্যভক্তগণের ভিতর তিনি গুরুবাদ এত দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন যে তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি "ঠাকুর" ভাবে প্রত্যক্ষভাবে পূজিত হইয়াছেন ও এখনও হইতেছেন। আসাম, উড়িষ্যা ও বাংলাদেশের ভক্তগৃহে এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত-প্রবাসী বাঙ্গালীর গৃহে সহস্র সহস্র নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তিকে ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য সহযোগে আরত্তি করিয়া ভগবদ্ভাবের উদ্বোধন করিয়া ভগবদারাধনা করিয়া থাকেন।

সারস্বত মঠ সনাতন ধর্ম্মের পথপ্রদর্শক মাত্র—শ্রীশ্রীঠাকুরের যদি স্বতন্ত্র কোন মত না থাকে তবে একটি স্বতন্ত্র মঠ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বা কি ছিল—এই প্রশ্ন লোকের মনে স্বতঃই উদয় হইতে পারে। স্বতন্ত্র মঠ নূতন কোন ভাবের কেন্দ্র বা উৎসস্বরূপ বলিয়া মনে হয় এবং বিচ্ছিন্ন ভারতে আবার নূতন মঠের ভিতর দিয়া সাম্প্রদায়িকতা আনা কেন? একটু প্রণিধান করিলে এ প্রশ্নের সমাধান আমরা সহজেই

করিতে পারি। হিন্দুধর্ম্ম অপূর্ণ ধর্ম্ম নহে যে শ্রীশ্রীঠাকুর কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব বা অননুভূতপূর্ব্ব নূতন সত্য লাভ করিয়া কোন বিশেষ মতের সৃজন করিয়াছেন এবং সেই মতের পোষকতা, সমর্থন বা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মতামত যাহাকিছু তৎসমস্তই বিভিন্ন মতবাদের গন্তব্যপথ সম্বন্ধে। তিনি বিভিন্ন মতের স্বরূপ দেখিয়াছেন এবং যে যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই সেই পথের বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা ঐ সব সত্যলাভ করিতে বা তাঁহার প্রেম-ভক্তি জ্ঞান যাচাই করিয়া পথের সন্ধান জানিতে চাহিয়াছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের মঠ সেই সেই মতের পথপ্রদর্শক ও ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বরূপ তাঁহাদের ভিতর ফুটাইয়া তুলিয়া ধরিয়া দেওয়ার সেতুস্বরূপ। সেই সহজপন্থার প্রচারই তাঁহার মঠের যাহা কিছু উদ্দেশ্য। সে পন্থা হইল ভক্তিপথে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ অর্থাৎ "শঙ্করের মত, গৌরাঙ্গের পথ"। এ সম্বন্ধে পরিশিষ্টে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে।

সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জন—তন্ত্র, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি সাধনার ধরাবাঁধা পথ আছে। রাগমার্গীয় ভক্তের ভগবদন্বেষণের তেমন কোন নির্দ্দিষ্ট পথ নাই যে এই পথে গেলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে—ঐ পথে গেলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। তান্ত্রিক, যোগী ও জ্ঞানীদের ধরাবাঁধা পথ জানাইয়া দিলেও—ভক্তিপথের পথিক এক এক জনের পক্ষে এক একটী পথের সন্ধান দিয়াছেন; তাহাদিগের ব্যক্তিগত প্রকৃতি অবগত হইয়া —প্রকৃতিভেদে ভক্তিপথের পথিককে বিভিন্ন পথ দেখাইয়া দিলেও আমরা বাহ্যিক ব্যাপার দেখিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহা এই যে তৎপ্রদত্ত সমস্ত সাধনপদ্ধতিই সর্ব্বপ্রকার সংস্কার বর্জ্জন করিতে বলিতেছে ও সর্ব্ব-প্রকার সাধনার মূল কেন্দ্র নিজ দেহাভ্যন্তরে নিত্য শাশ্বত বস্তুকে নির্দ্দেশ করিতেছে। কারণ বাহির হইতে কোন শক্তিই আসিবে না। সাধনার দ্বারা ভিতরের শক্তিকে জাগ্রত করিতে হইবে। আনন্দের উৎস সমস্তই

ভিতরে, ভগবানের সাড়া যাহা কিছু সমস্তই হৃদয়ের ভিতর, তবে সাম্প্রদায়িক ভাব রাখিতে ইচ্ছুক হইলেও সেই ভাবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চিন্মাত্রের সহিত যোগের কোনই অন্তরায় হয় না ; মুসলমান খৃষ্টানগণেরও স্বীয় স্বীয় ভাব অক্ষুন্ন রাখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদত্ত সাধনায় তাহাদের ভাব অপ্রত্যাশিত রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে মূল কথা এই যে সাধনা সম্পূর্ণ বহিঃসম্বন্ধশূন্য ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াবর্জ্জিত হইলে ভিতরের শক্তি অতি দ্রুত জাগ্রত হয়। শাস্ত্রাদিতে যে সাধ্যভক্তির ক্রম নির্ণীত হইয়াছে উহা নিম্ন অধিকারীর পক্ষে। বিশ্বাসী রাগমার্গী ভক্ত একখানা তীক্ষ্ণধার ছুরি লইয়া যদি বলে—"প্রেমের ঠাকুর! দেখা দাও—দেখা দাও ; যদি দেখা না দাও তবে এখনই জীবন বিসর্জ্জন দিব।" কারণ বিরহ তাহার পক্ষে মৃত্যুযন্ত্রণাবৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যখন সত্যসত্যই ভক্ত আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে ছুরি আঘাতোদ্যত হইয়াছে, অমনি ভগবান আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহার হাত ধরিয়াছেন। এইরূপে প্রেমের কলহের চরম পরিণতিতে ভগবান ধরা দিয়াছেন। এইরূপ বহুজন বহুভাবে তথাকথিত সাধনা ব্যতীত ভালবাসিয়াই তাঁহাকে পাইয়াছে। সুতরাং উপরোক্ত কাহিনী শ্রবণ করিয়া বা পাঠ করিয়া যদি কেহ একখানি ছুরি লইয়া "ভগবান দেখা দাও—ভগবান দেখা দাও" বলে, আর পশ্চাদ্দিকে তাকাইয়া দেখে যে ভগবান সত্যই হাত ধরিতেছেন কিনা—তাহা হইলে ঐ মিথ্যাভিনয় কিছুতেই ফলপ্রসূ হইবে না। সুতরাং ভক্তের কিছু ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। সমস্তই ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন সাধনা। একটী প্রশ্ন এখানে উত্থিত হইতে পারে যে সব সাধনাই যদি মূল কেন্দ্র নিজের দেহাভ্যন্তরে নিত্য শাশ্বত বস্তুকে লক্ষ্য করিতে বলে, তবে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রধানতঃ যোগী বলিতে হইবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিরুপাধি—তাঁহাকে শুধু যোগীশ্বর বলিলে ভুল হইবে। কারণ আধার ভেদে এক এক জনের ভিতর তাঁহার চিত্র এক

এক ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সুতরাং তাঁহাকে কোন বিশেষ শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে না। কারণ তান্ত্রিক যখন তৎপ্রণীত "তান্ত্রিকগুরু" পাঠ করিয়াছে বা তন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়াছে, তখন তাঁহাকে অসামান্য তান্ত্রিক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। যে লোক তৎপ্রণীত "জ্ঞানীগুরু" পাঠ করিয়াছে ও তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়াছে, সে তাঁহাকে অদ্বিতীয় জ্ঞানী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। যে "যোগীগুরু" পাঠ করিয়াছে, সে তাঁহাকে যোগী বলিয়া বুঝিয়াছে। আবার যে তাঁহার "প্রেমিক-গুরু"র অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব পাঠ করিয়াছে, সে তাঁহাকে প্রেমিক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু যিনি তাঁহার তত্ত্বচতুষ্টয় সম্বন্ধীয় সব গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার উপাধি কিছু খুঁজিয়া পান নাই বরং তিনি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন।

জীবন্মুক্তোপাসনা—পূর্ব্ব হইতে যে সমস্ত সাধনপদ্ধতি বলিয়া আসিতেছি শ্রীশ্রীঠাকুর তৎসমস্ত সাধনাপেক্ষা "জীবন্মুক্তের উপাসনা" আশু ফলপ্রদ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। সে জীবন্মুক্তের উপাসনা কিরূপ তাহার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন :—

"সাধু সন্ন্যাসী বা ভক্ত প্রমুখাৎ অবগত হওয়া যায় বা তাঁহাদের জীবনকথায় পাঠ করা যায় যে রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, ব্যাস ও সনকাদি ঋষিগণের এখনও তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তবে কি নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ কাহারও হয় নাই? তবে কি ব্রহ্মনির্ব্বাণ একটী কথার কথা? যোগী ভিন্ন এ তত্ত্বটি কাহারও নিকট ধরা পড়ে না। জগতের প্রত্যেকটী প্রাণীর ক্রিয়া আকাশে চিত্রিত (recorded) হয়; ব্যাস বশিষ্ঠ গৌরাঙ্গ প্রভৃতি কোন স্বতন্ত্র লোকে বিদ্যমান নাই। "প্রসাদ বলে—যা ছিলি ভাই, তাই হবি রে নিদান কালে।" অর্থাৎ তাঁহারা পরমপদে লীন হইয়া গিয়াছেন অথবা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রপঞ্চধামের কোথায়ও

কোনরূপ ভৌতিক দেহ লইয়া অবস্থান করিতেছেন না। বিন্দু যেমন সিন্ধুতে মিশিয়া যায় তদ্রূপ তাঁহারা তাঁহাতে মিশিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের চিন্তার ধারা, সাধনা, ত্যাগ, সংযম, শিক্ষা ও আদর্শ সমস্তই আকাশে চিত্রিত (recorded) রহিয়াছে। তাঁহাদের ক্রিয়াগুলির চিত্র গুপ্ত ও সূক্ষ্মভাবে আকাশপটে চিত্রিত রহিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি তাঁহাদের চিন্তা করে, তবে ঐ চিন্তা উগ্র ও একাগ্র হইলে ঐ সমস্ত গুপ্ত চিত্র তাহার নিকট প্রাণবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে।

"ঋষিগণ অপেক্ষা অবতারের লীলাচিত্র বহুকাল প্রকট থাকে। তাঁহারা কিন্তু চিচ্ছত্তায় মিলিয়া যান। অবতার-উপাসকগণের নিকট এই সমস্ত লীলাদিও ভাসিয়া উঠে। তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে কোন লোক বা ধাম সৃজন করিয়া তথায় অবস্থান করেন না।

"এই যে তুমি ও আমি এই ঘরে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছি, ইহাও বহুকাল স্থিতিশীল হইবে। যদি কেহ এই কথাবার্ত্তার অনুধাবন করে তবে উহাও তাহার নিকট প্রকট হইবে।

"মুক্তি অর্থে কি বুঝায়? একজন স্বচ্ছন্দ বিচরণকারী লোক জেলে গেল, কিছুদিন তথায় আবদ্ধ রহিল, পুনরায় জেল হইতে ফিরিয়া আসিল, আবার স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে থাকিল। যাহা ছিল আবার 'নিদান-কালে' তাহাই হইল। রহিল কেবল গুপ্ত চিত্রগুলি। অবতার-উপাসকে এইসব চিত্রগুলি ভাসিয়া উঠে।"

সুতরাং দেখা যায় যে গতানুগতিক ভাবে প্রচলিত পন্থায় সাধনা করা অপেক্ষা নিরুপাধি মহাপুরুষের প্রদর্শিত অভিনব পন্থায় উপাসনা অধিকতর কার্য্যকরী হয়। কারণ শিষ্যের দৈন্য কোথায় তাহা তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়া তদ্রূপ সাধনা দিয়া কিরূপভাবে তাহার হৃদয়ে শান্তি আনাইয়া থাকেন তাহা আমরা কতিপয় বিরহবিধুরকে তৎপ্রদত্ত সাধন-পদ্ধতি হইতে বুঝিতে পারি।

ভাবতত্ত্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের দান—শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার নিজের চিন্তার দ্বারা ভাবতত্ত্বকে এরূপভাবে পরিপুষ্ট করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে তাঁহার চিন্তাপূত অভিনব সাধন-পদ্ধতি এরূপ বিস্ময়করভাবে ফলপ্রসূ হইয়াছে যে তাহা যখন আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে তখন বিস্ময়ের অবধি থাকে নাই। এই সাধনায় যে গতানুগতিক জীবনধারার ব্যতিক্রম না করিয়া কিছু নূতনত্বের, সংযমের বা অস্বাভাবিকতার ভিতর দিয়া গমন না করিয়া অতি সরল এবং অতি সহজ ভাবে ইষ্টসিদ্ধি হয় তাহা সর্ব্বপ্রথম পরীক্ষিত হইয়াছে কুমিল্লা জেলায় নাসিরপুর গ্রামে। এই জগতে আসিয়া যাহাদের সহিত এই মায়ার সংসার পাতান হইয়াছে তাহাদের বিয়োগে বিরহ-বিধুরগণ এতটা আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতেছে যে কোন প্রকার সাধনাই তাহাদের নিকট ফলপ্রসূ হইতেছে না দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাদিগকে অভিনব সাধনা প্রদান করিতে লাগিলেন। ভাবতত্ত্বের এ সাধনা এ জগতে অভিনব ; এ পর্য্যন্ত কোন গুরু বা মহাপুরুষ এ পন্থায় যে ভগবদ্ভাবের উদ্বোধন করা যায় ইহা কল্পনা করিতে পারেন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর কতিপয় স্বামী-বিরহ-কাতরা বিধবাকে নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ ও "মন্ত্রার্থ" স্বরূপ নিজ নিজ প্রিয়জনের দেহ ভাবনা করিতে উপদেশ প্রদান করিতে থাকিলেন। স্বামীচিন্তায় ব্যাকুলা আবেগময়ী বিধবা মন্ত্রজপের সহিত অশ্রুতে ভাসিতে থাকিলেন। বিধবার হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেহীর দেহ রচনা করিল। স্বয়ং ভগবান তাহাদের স্বামীর রূপ পরিগ্রহ করিয়া তৃষিত তাপিত বিধবার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাহাদের পূর্ব্ব স্বামীর ন্যায় পূর্ব্বাচরণপরায়ণ হইয়া ক্রীড়া-কৌতুক করিতে থাকিলেন। স্বামীর প্রেমস্পর্শলোলুপা বিধবা জানিত না যে এ স্বামী সেই জগৎস্বামী। মনে করিল মৃত্যুর পরপার হইতে মন্ত্রে আহূত হইয়া তাহার মৃত স্বামী দেখা দিতেছেন। পতিপ্রীতি, পত্যাসক্তি, নিরবচ্ছিন্ন পতিচিন্তাই যে এই মূর্ত্তি গড়িয়াছে

—প্রেমই যে সর্ব্বত্র সাধকের মনোময়ী মূর্ত্তি গড়ে, এ বিচার সে জানে না।

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত জেলার ময়নামতীর নিকটবর্ত্তী নাসিরপুর-নিবাসী * * * ভ্রাতৃজায়া সাধনার ফলে নিশাযোগে স্বামীরূপে প্রেমস্বরূপকে পাইয়া আত্মহারা হইয়া যাইতে থাকিলেন। স্বামীর ধ্যান, জপ, পূজা, ভাবনা সবই ছিল তাঁহার নিজের ভাবে। দিন দিন বিধবার রূপ লাবণ্য তারুণ্য ও কমনীয়তায় গৃহ উজ্জ্বল ও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ হইয়া উঠিল। এইরূপে একদিন স্ত্রীভাবে স্বামীস্পর্শলোলুপা রাগমার্গের সাধিকা বিধবার সম্মুখে প্রেমে গড়া তনু "স্বামী" সহসা রূপান্তর প্রাপ্ত হইলেন। স্বামী শ্রীশ্রীঠাকুরের রূপ ধারণ করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। কামজ দাম্পত্যভাব দূরে পলায়ন করিল, অবগুণ্ঠন টানিয়া লইয়া সাধিকা মুখ লুকাইলেন। তাঁহার ধারণা ভাঙ্গিয়া গেল, নতজানু হইয়া তিনি তাঁহার পদতলে প্রণত হইলেন। বিধবার আজ প্রকৃত প্রেমের উদয় হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত বগুড়ার ৺হরপ্রসাদ রায় স্ত্রীবিয়োগের পর এই ভাবের সাধনার দ্বারা প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হইয়াছিলেন। এ স্থানে তাঁহার ভাবসাধনার স্বরূপ বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি না।

প্রেমতত্ত্বরহস্যবিদ্—শ্রীশ্রীঠাকুরের বহুস্থানে এইরূপ সাধনা প্রদানে যাহা শতকল্পেও হওয়া সুকঠিন তাহা যে অতি সত্বর ফলপ্রসূ হইয়াছে তাহার উদাহরণস্বরূপ সবগুলি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ এসব কথা ত আর ঢাক পিটাইয়া প্রচারের বিষয় নহে। ইহা যে হিন্দু-ঘরের ভক্তিমতী কুলকামিনীগণের প্রাণের বিরহজ্বালা মিটাইবার প্রেম-সাধনার গুপ্তকথা। প্রেমের সাধনা যে কি তাহা ভাবতত্ত্ববিদ্ ভিন্ন কে জানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর আদর্শবাদে অবিশ্বাসী—অধ্যাত্মজগতে এই অভিনব পন্থা যে শ্রীশ্রীঠাকুর কর্তৃক সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহা আমরা উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারি। শ্রীশ্রীঠাকুর যদি সব মতেই বিশ্বাসী হন তবে

তাঁহার কি নির্দ্দিষ্ট কোন আদর্শ নাই? শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ কিছু নাই এবং তিনি কাহারও সম্মুখে কোন আদর্শ স্থাপন করিয়া তাহাকে তদনুরূপভাবে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করেন নাই কারণ তিনি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন যে শুধু আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত হইলে কেহ কখনও লক্ষ্যে পৌছিতে পারে না এবং তিনি নিজে ব্যক্তিগত কোন আদর্শবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তথাকথিত আদর্শবাদ ব্যক্তিগত পছন্দ (liking) এবং অপছন্দে (disliking) পর্য্যবসিত। আদর্শবাদ সামাজিক জীবনে সুখ-সুবিধার হেতু হইতে পারে বটে, কিন্তু অধ্যাত্মজীবন উহাতে প্রভাবান্বিত হয় না। বৈচিত্র্যময় জগৎ; এখানে অনন্ত জীব অনন্ত ভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে গড়িয়া উঠিবে। এ জগতে কোন দুইজন এক প্রকারের হইতে পারে না; যদি তাহা সম্ভব হইত তবে ঐ দুইজন এক হইয়া যাইত। শ্রীশ্রীঠাকুর বিশিষ্ট কোন আদর্শ দেখাইতে আসেন নাই। তিনি বারংবার বলিয়াছেন যে তিনি নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে, যখন নিজেকে অপূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছে তখন তদ্ভাব পূর্ণ করিবার জন্য বিভিন্ন সাধনা করিয়াছেন। এ সমস্তই তাঁহার নিজের তৃপ্তির জন্য। বৈচিত্র্যময় জগতে তিনি একটী স্বতন্ত্র ভাব লইয়া ফুটিয়া উঠিয়া এমন একস্থানে পৌছিয়াছেন যাহা সাধারণের বোধগম্য নয়। যে যুগে বোদ্ধার অভাব, সে যুগে অনেক বস্তুই অপরিজ্ঞাত থাকিয়া যায়। যাহা হউক, তিনি যে জগতে কোন আদর্শ স্থাপন করিতে আসেন নাই, ইহা আমার নিজের অভিমত নহে। তিনি একজন সর্ব্ববিধ ভাববিদ্ গুরু। তিনি মহাশূন্যাবস্থা হইতে গুরু হইয়া নিম্ন অবস্থায় নামিয়া আসিয়াছেন এই স্থূল জগতে মানুষকে সাধনার একটি অবস্থা দেখাইতে যে এরূপ অবস্থাও মানুষে সম্ভব। যদি কাহারও দেখিবার চোখ থাকে—তবে সে দেখুক। যদি কেহ তাঁহার ভিতর কোন আদর্শের সঙ্কেত পাইয়া থাকে তবে সে মাত্র সত্য লাভের চেষ্টা।

সাধুর প্রতিষ্ঠা তত্ত্বে—স্থূলে নহে—যদি তিনি আদর্শবাদী না হন, তবে তাঁহার মঠ, পুস্তক, আশ্রম, স্মৃতিমন্দির, হাসপাতাল, বিদ্যালয় প্রভৃতি সমস্তই কি তাঁহার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস সূচিত হইতেছে না? সাধুর প্রতিষ্ঠাপ্রয়াস কেন? ইহা শুধু শিষ্যভক্তের ইচ্ছায় তাঁহার পবিত্র নামের ছাপ দিয়া লোককে তাঁহার কর্ম্মের গণ্ডির ভিতরে আনা, যদি তাহাতেও তাহারা কিছু ভাব গ্রহণ করিতে পারে। ভোগমুখী মানব কিছুতেই যে নিবৃত্তিমুখী হইতে চাহে না—তাই এই সমস্ত মঠাশ্রম খুলিয়া নানা ভাবে আকর্ষণ করিয়া ইহার ভিতরে লইয়া আসিয়াছেন যদি তাহাতেও মানব তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র ভাবের অধিকারী হইতে পারে।

পুস্তকাদি স্বীয় প্রতিষ্ঠার জন্য নহে। পুনঃপুনঃ বৈদেশিক আক্রমণে ভারতে প্রকৃত শাস্ত্রাদি যখন নষ্ট হইয়া গেল, সাময়িক ভাবে ভারতের বৈশিষ্ট্য যখন লুপ্ত হইতে থাকিল, তখন পুনরায় এই সকল তত্ত্বের কিছু কিছু থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির (Theosophical Society) পুস্তকের ভিতর দিয়া প্রকাশ হইতে থাকিল, কিন্তু উহাতে ভুবর্লোকের জ্ঞান পর্য্যন্ত প্রকাশ হইল; উক্ত সোসাইটীর তদধিক তত্ত্ব ধরিবার শক্তি না থাকায় ঐ পর্য্যন্ত তাহাদের চেষ্টার সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। সুতরাং যাঁহারা সেই সমস্ত হস্তলিখিত তত্ত্বশাস্ত্র ধ্বংস হইবার ভয়ে পাহাড়ের বুকে লুকাইয়া গুরুপরম্পরায় সতর্ক প্রহরীর কোষাগার রক্ষা করার ন্যায় রক্ষা করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা তাহা সাধারণে প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নিমিত্ত মাত্র। প্রতিষ্ঠা প্রয়াসের জন্য নহে।

এই পার্থিব জগতে প্রতিষ্ঠার যে কিছুই নাই। মোহমুগ্ধ জনগণ এখানে জাগতিক প্রতিষ্ঠা চায় আর জ্ঞানী চায় আত্মপ্রতিষ্ঠা; স্থূল জগতে শিকড় গাড়িয়া তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা হয় না একথা শ্রীশ্রীঠাকুর পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন। আত্মপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণের স্থূলজগতে প্রতিষ্ঠার

কোন প্রয়াস থাকে না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন যে তাঁহার দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁহার নাম চিরতরে ডুবিয়া যায়। তিনি চান না যে কেহ আর তাঁহাকে মনে করে। মানবের স্মৃতিপট হইতে তাঁহার স্মৃতি যেন চিরতরে মুছিয়া যায়। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন—"যদি তোমাদের মধ্যে এমন কেহ থাকে যে আমাকে সাধু বলিয়া প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিয়াছে, তবে সাধুচরিত্রভাবে যদি তাহার স্মৃতিতে জাগরূক থাকিয়া যাই তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই। যদি আমার নাম—আমার চরিত্র একজনেরও ব্যক্তিগত জীবন ভগবদন্বেষণে প্রভাবান্বিত করে, তবে আমার জীবন—আমার সাধনা—আমার কর্ম্ম—আমার চরিত্র সেই ব্যক্তিগত স্মৃতিতে জাগরূক থাকাতে আমার কোন আপত্তি নাই।" শ্রীশ্রীঠাকুরের এই প্রাণস্পর্শী কথাগুলি এখনও আমার কর্ণে জীবন্তবৎ ধ্বনিত হইতেছে। সুতরাং মঠ বা পুস্তক কিছুই তাঁহার প্রতিষ্ঠার জন্য নহে। জগতে যাঁহারা নিতান্ত মধ্যম শ্রেণীর লোক অথবা যাঁহারা জগতে নিতান্ত মধ্যম স্তরে বাস করেন, প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের চিন্তার বিষয় হইতে পারে বটে কিন্তু ইহা তত্ত্বদর্শী বা সর্ব্বতত্ত্ববিদ্ মহাপুরুষের লক্ষ্য হইতে পারে না। শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বতত্ত্ববিদ্ ও নিরুপাধি হইলেও তাঁহার শিষ্যভক্তগণ মধ্যে জ্ঞানপন্থী ও ভক্তিপন্থী ভিন্ন অন্য কোন পন্থী যে কদাচিৎ দেখা যায় ইহার কারণ এইভাবে নির্দ্দেশ করা যায়।

শিষ্যবিভাগ—(১) জ্ঞানপন্থী—যে সমস্ত গৃহীর ভিতর প্রবলভাবে আধুনিকতা বর্ত্তমান, তাঁহারা রুচিকর গৃহস্থজীবনে সন্ন্যাসীর জ্ঞান লাভ করিতে চান। তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের "জ্ঞানীগুরু" ও "যোগীগুরু"তে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া শুধু বিচারের দ্বারা জ্ঞানলাভে উন্মুখ। গৃহস্থ জীবনে সন্ন্যাসীর জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক যাঁহারা, তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া বিচারের দ্বারা তাঁহার উচ্চ জ্ঞানময় অবস্থা বুঝিয়াই এতাদৃশ অবস্থার

অনুশীলনে খুব সহজ সাধনা প্রাপ্ত হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ও নিজেদের উন্নতিও লক্ষ্য করিতেছেন। এতাদৃশ ব্যক্তিগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট কিছু প্রত্যাশা করেন না—শুধু তাঁহার জ্ঞানময় অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া ভাবতন্ময়তা আনেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যেরূপ কঠোরতার ভিতর দিয়া গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা তদ্রূপ কঠোরতার ভিতর দিয়া যাইতে চান না।

(২) **ভক্তিপন্থী**—অপর পন্থী যাঁহারা, তাঁহারা কোন মানুষের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না বরং কোন উচ্চস্তরের মানুষের প্রদর্শিত পন্থায় কোন দেবদেবীর সাধনা করিতে ভালবাসেন। কারণ শাস্ত্রাদিতে প্রদর্শিত পন্থায় দেবদেবীর উপাসনায় মনের সংস্কারানুযায়ী তাঁহারা যে কোন গৃহস্থ গুরুর প্রদর্শিত পন্থায় যখন গমন করিতে পারেন, তখন একজন অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে আর কথা কি? সুতরাং ইঁহারা তন্ত্রসম্মত ভক্তিযোগে সাধনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা সাহসে ভরসা করিয়া ভেলা ভাসমান করেন না। তাঁহারা তান্ত্রিক সাধনায় বিশেষ আকৃষ্ট কারণ তাঁহারা মনে করেন যে বেদান্ত ও যোগ যে স্থানে লইয়া যায়, তন্ত্রও সেই স্থানে লইয়া যায় একটী রহস্যময় জগতের ভিতর দিয়া। সুতরাং এ পথটী অতি সুন্দর ও আস্বাদ্য। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর তৎপ্রদত্ত তান্ত্রিক সাধনার প্রকারভেদের মধ্য দিয়া লইয়া তন্ত্রের সম্বন্ধে সে ভ্রান্তধারণা ঘুচাইয়া দিয়াছেন। ভক্তিপন্থীর বিশেষত্ব তর্কযুক্তিনিরপেক্ষ বিশ্বাস ও আত্মবিস্মৃতি। ভগবানই পরমগুরু, সুতরাং কোন মানুষকেই সেই আসন দেওয়া তাঁহারা সর্ব্ববিধ যুক্তিতর্ক-বহির্ভূত ও গুরুতর অন্যায় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রাথমিক ভাবে ইহা যুক্তিযুক্ত মনে হইলেও প্রকৃত প্রেমের কণামাত্রও যাঁহার হৃদয়ে উদয় হইয়াছে—তিনি প্রকৃতই মানুষের ভিতর প্রেমস্বরূপের সন্ধান পাইয়া ভগবদ্বুদ্ধিতে তাঁহাকে তদ্রূপ শ্রদ্ধা করিতে দ্বিধা করেন নাই।

বাং ১৩২২ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতায় জনৈক শিষ্যের বাড়ীতে আগমন করেন। তথা হইতে কার্য্যোপলক্ষে নবদ্বীপে গমন করেন। তথায় সেবক চণ্ডী ব্রহ্মচারীর নিকট জনৈক গোপীভাবলুব্ধ সাধকের কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে দেখিতে যান। সাধক নবদ্বীপে "ললিতা সখী" নামে পরিচিতা। শ্রীশ্রীঠাকুর ললিতা সখীর কুঞ্জে আসিয়া উপবেশন করিলে একটী সুবেশা সুকেশা নারী ব্রীড়াবনতমুখী হইয়া দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। কখনও বা শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে সলজ্জভাবে মৃদু হাসিয়া অপাঙ্গে দৃষ্টি করিয়া পুনরায় মাটীর দিকে তাকাইয়া পায়ের নখ দিয়া মাটী খুঁড়িতে লাগিল—কখনও বা এক হাত দিয়া অন্য হাতের চুড়িগুলি নাড়িতে লাগিল। কখনও বা নখ খুঁটিতে লাগিল—কখনও বা নিজের বসনাগ্র ধরিয়া নাড়িতে লাগিল। তারপর নতমুখে কখনও বা একটু চাহিয়া বলিল, "আজ কতদিন আপনার কথা শুনেছি—শুনে অবধি মনটা বড় উতলা হয়েছে—কখনও বা আপনার চিন্তায় বিভোর হয়ে গেছি। যদি পুরুষ হ'তাম, ছুটে গিয়ে দেখে আসতাম। কি জানি, আজ কেন এত দয়া হল ?" ব'লে চোখ মুছিতে লাগিল।

উপরোক্ত ললিতা সখী একজন পুরুষলোক, গোপীভাব-মাধুর্য্যে লুব্ধ হইয়া স্ত্রী আচরণপরায়ণা। তাঁহার প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর গোপীভাব-সাধনার যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এইস্থানে প্রকাশ করা বিশেষ প্রয়োজন। তিনি বলিয়াছেন যে বৈষ্ণবদের গোপীভাব-সাধনায় যাহারা প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করে তাহারা ভ্রান্তপথে পরিচালিত হয়। "ললিতা সখী" ঠিক পথই অবলম্বন করিয়াছে। বৈষ্ণবের গোপীভাব-সাধনার পন্থাটী এইরূপ।

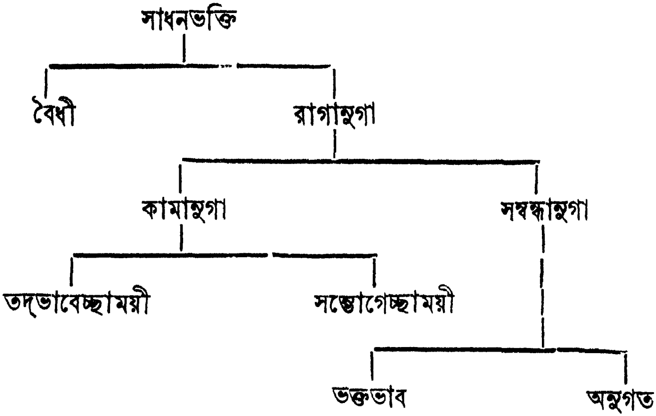
বৈষ্ণবের মতে সিদ্ধ দুই প্রকার। সাধনসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ। শ্রীরাধিকার আটজন সখীই মাত্র নিত্যসিদ্ধা। দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রীতি

প্রভৃতি আটটি বৃত্তি হইল আটটি সখী। ইহারাই নিত্যসিদ্ধা। আর প্রেম বলিতে যাহা বুঝায় তাহা একমাত্র শ্রীরাধা। শ্রীরাধার আটটি সখীর আবার প্রত্যেকের আটজন করিয়া সখী। সুতরাং এই ৮×৮=৬৪ জন সাধনসিদ্ধা। "বহু কান্তা হইলে হয় রসের উল্লাস।" সেই "বহু কান্তা" বলিতে এই ৬৪ জন+৮ জন এবং শ্রীরাধা (প্রেম) সর্ব্ব-সমেত এই তেয়াত্তর জন। এই তেয়াত্তর জন লইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-লোকে নিত্য লীলা।

এই ক্ষণে যাহারা বৈষ্ণবমতে সাধনা-তৎপর, তাহাদের সর্ব্বাগ্রে উক্ত দাসীর সিদ্ধদেহ ধ্যেয় ও চিন্তনীয়। নিত্যসিদ্ধ আটজন গোপীর সাধন-সিদ্ধ চৌষট্টি জন দাসীর মধ্যে যে কোন দাসীকেই চিন্তা ও ধ্যানই বৈষ্ণবের সাধনা। এইসব বৈষ্ণব সাধনার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বা রাধার বা নিত্যসিদ্ধা সখীর কোন সম্বন্ধ নাই। বৈষ্ণব সাধক পরে সেই চৌষট্টি জন দাসীর মধ্যে যে কোন এক জনের ভজনা করিয়া তাহার স্বরূপ অবগত হইয়া তাহাতেই লীন হইবে। তারপর যখন সাধনসিদ্ধ দেহ লাভ হইবে তখন তাহারা নিত্যসিদ্ধা আটজন সখীর মধ্যে যে কোন একজনের ধ্যান-ধারণায় কালাতিপাত করিবে। সুতরাং সাধনসিদ্ধাদের তখনও শ্রীশ্রী-রাধাকৃষ্ণের ধ্যান-ধারণা করিবার অধিকার হয় না। এই সাধনসিদ্ধাগণ তখন নিত্যসিদ্ধার ধ্যান-ধারণা করিয়া তাঁহাদের মানস-সেবাযত্ন করিয়া কালাতিপাত করিবে। অতঃপর বহুকাল পরে তাহারা ভাবভেদে নিত্যসিদ্ধা আট জনের অন্যতমায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। তখনই তাহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার পরিকর হইবে ও তাঁহাদের সহিত আনন্দ-বিলাসে যোগদানের অধিকার জন্মিবে।

কিন্তু আধুনিক বৈষ্ণব সাধকগণ ধাপে ধাপে না গিয়া প্রথমেই রাধা-কৃষ্ণের ধ্যান-ধারণা করিতে চেষ্টা করেন সুতরাং ফলের বেলায় কিছুই হয় না পরন্তু একুল ওকুল দু'কূল হারান।

সাধকদিগের ক্রম বা ধাপটা এইরূপ



সুতরাং যাহারা অনুগত ভাবের সাধনা করিবে তাহাদের গোপীর আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। আর যাহারা ভক্তভাবে সাধনা করিবে তাহারা শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতির সিদ্ধদেহ চিন্তা করিবে। অতঃপর শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতিতে লীন হইয়া পরে তাহারাও নিত্যসিদ্ধে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। নারীদের হৃদয় কোমল ও প্রেমে ভরপুর বলিয়া নিত্য-লীলার পরিকরে গোপী নাম দিয়া স্ত্রীচিহ্ন আরোপ করা হয় মাত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুরের লোকাকর্ষণী শক্তি—শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহারিক জীবন বিলাসী বড়লোকের ন্যায় হইলেও রাজা, জমিদার প্রভৃতি খেতাব-ধারীগণ, পণ্ডিত, উকিল, মোক্তার, হাকিম, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পুলিশ, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, কুলী, মজুর প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণী এবং সর্ব্ব সম্প্রদায়ের অধ্যাত্মতত্ত্বপিপাসু ব্যক্তিগণ মুহূর্ত্তের জন্য হইলেও তাঁহার পাদস্পর্শ করিতে, তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে, তাঁহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া তাঁহার সন্তুষ্টি সাধন করিতে উৎসুক, তাঁহাকে একবার মাত্র দর্শন করিতে ব্যস্ত ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার শারীরিক সুখ-সুবিধার জন্য ধনীগণ হাজার হাজার টাকা অকাতরে দান করিয়াছেন। আর শ্রীশ্রীঠাকুর লোকহিতকর কার্য্যে তৎসমস্তই ব্যয় করিয়া নিজে শূন্য তহবিল লইয়া সম্পূর্ণ আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনাতিপাত করিয়াছেন। এক এক সময় ৫ হাজার ৭ হাজার টাকা তাঁহার অতি দরিদ্র শিষ্যের হাতে অনায়াসে সরল বিশ্বাসে কার্য্যোপলক্ষে সঁপিয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্তে বসিয়া রহিয়াছেন—এটি কি সেই ত্যাগীর ঐশ্বর্য্য নহে? লোকহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়া এক এক সময় আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য যে কয়েক হাজার টাকার অকস্মাৎ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে অথচ তখন হাতে ১৫৲।২০৲ টাকা মাত্র রহিয়াছে। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে সেই দিনের ভিতরেই নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে—এমন কি দশ বৎসরের ভিতর যাহার সহিত সাক্ষাৎ নাই এমন শিষ্য বা ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ঐ পরিমাণ টাকার চেক্ দান করিতে আসিয়াছে—এটা কি তাঁহার ঐশ্বর্য্য নহে?

তাঁহার অলোকসামান্য দেহকান্তি দর্শনে যে সমস্ত নারী তাহাদের রূপ-যৌবন যাচিয়া পত্র দ্বারা ও মৌখিক তাঁহাকে জ্বালাতন করিয়াছে—

এই সহজ সরল লোকটী তাহাদের সেই অযাচিত দান প্রত্যাখ্যান করিয়া ঐ দান ভগবন্‌মুখী করিয়া দিয়া উপদেশাদির দ্বারা প্রকৃত পথের সন্ধান দিয়া উন্নত করিয়া দিয়াছেন—ইহা কি তাঁহার ঐশ্বর্য্য নহে ?

যাঁহার দর্শনমাত্র যুবকগণ পতিপ্রাণা ভার্য্যার সুকোমল অঙ্গ স্পর্শ ত্যাগ করিয়া এই সহজ সরল লোকটীর ভিতর অনন্ত সৌন্দর্য্যের সঙ্কেত পাইয়া এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া অনুক্ষণ তাঁহাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিয়াছে—ইহা কি তাঁহার ঐশ্বর্য্য নহে ?

অশীতিবর্ষবয়স্কা মাতৃস্বসা গোলাপসুন্দরী দেবী (যিনি পূর্ব্বাশ্রমে এই সহজ মানুষটীকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন) পুরীর নীলাচল কুটীরে তাঁহাকে "ঠাকুর" বলিয়া সম্বোধন করায় কেহ যদি ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছে "আপনি কেন নাম ধরিয়া ডাকিতে পারেন না ?" উত্তরে গোলাপসুন্দরী দেবী বলিতেন—"যতবারই নাম ধরিয়া ডাকিতে যাই—জিহ্বা যেন আড়ষ্ট হয়ে যায়—সামনা-সামনি নলিনী বলিতে 'ঠাকুর' এসে যায়।"—ইহা কি তাঁহার ঐশ্বর্য্য নহে ?

যে সমস্ত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি রূপব্যবসায়িনী সঙ্গে বাদ্যসম্ভার সহ গঙ্গাবক্ষে প্রেমের অভিনয় করিতেন—তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের দেবদুর্লভ চরিত্র লাভ হইয়াছে—ইহা কি তাঁহার ঐশ্বর্য্য নহে ?

যে সমস্ত ধনীব্যক্তি এই সহজ মানুষটীকে বুঝিতে না পারিয়া যেরূপ ধারাবাহিক ভাবে বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সুদীর্ঘকাল পরে অনুতপ্ত হইয়া যোড়করে তাঁহার আবাসে দাঁড়াইয়া স্বীয় কৃতকর্ম্মের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন ও যে সমস্ত শিষ্য তাঁহাকে বুঝিতে না পারিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন—তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয়টী না দেখিয়া পুনরায় তাঁহার চরণাশ্রয়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং যিনি যখনই ফিরিয়া আসিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন—"শ্রীশ্রীঠাকুরের

অলৌকিক কিছু দেখি নাই বটে কিন্তু লৌকিক যাহা দেখিয়াছি, তাহা এপর্য্যন্ত কোন লোকের দেখি নাই”—ইহা কি তাঁহার ঐশ্বর্য্য নহে ?

১৩৩৩ সালে হরিদ্বার কুম্ভে সশিষ্যে স্নানে যাইবার সময় সামান্য একখানি গামছা কাঁধে সাধারণ সাদা ধুতি পরিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়ের ভিতর মিশিয়া গেলেও হস্তীপৃষ্ঠে মোহান্তগণ তাঁহার সমীপস্থ হইবামাত্র হস্তীর গতি মন্থর করিয়া এই সহজ মানুষটীকে করযোড়ে প্রণাম করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি।—ইহা কি তাঁহার ঐশ্বর্য্য নহে ?

ট্রেনে ভ্রমণকালে শ্বেতাঙ্গ মহিলা ও বালক-বালিকাগণ অযাচিতভাবে এই অপরিচিত সহজ মানুষটীকে বিস্কুট কলা পেঁপে আতা আম ও পুষ্প প্রভৃতি প্রদান করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিত; এমন কি এরূপও দেখা গিয়াছে যে শ্বেতাঙ্গ সারজেণ্ট জনতা অপসারণ করিবার সময় শিষ্যগণের বেষ্টনী ভেদ করিয়া এই সহজ সরল মানুষটিকে দেখিয়া নিজেদের ভিতর বলিয়াছে—“**He is indeed a gentleman**”. পরে “**Good morning**” বলিয়া নমস্কার করিয়া তাহারা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গিয়াছে। ইহা কি তাঁহার ঐশ্বর্য্য নহে ?

সুতরাং দেখা যায়, লোক আকর্ষণ করিতে তিনি বাহ্যিক কোন প্রকার শক্তির স্ফুরণ করেন নাই। লৌহ ও চুম্বকখণ্ড দেখিতে এক প্রকার কিন্তু যখন লৌহখণ্ডগুলি চুম্বকে আকৃষ্ট হইয়া তৎসংলগ্ন হইয়া যায় তখনই কোন্‌টা লৌহ এবং কোন্‌টা চুম্বক বুঝিতে পারা যায়। কোন প্রকার অতিমানুষিক শক্তি বা যোগৈশ্বর্য্য দর্শন ব্যতীত শুধু অধ্যাত্ম-পিপাসা মিটাইতে যাহারা তাঁহার নিকট আসিয়াছে—তাহারা তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছে—তাঁহার কথা দিবারাত্র চিন্তা করিয়া তাহাদের সুখানুভূতি হইয়াছে। সুতরাং এই সহজ মানুষটীর ভিতর যে একটা দিব্য—চিন্ময় মানুষ লুকায়িত ছিল না, তাহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ?

এই ত গেল তাঁহার সাধারণ মানুষ-ভাবের ঐশ্বর্য্য। এক কথায় আমরা তাঁহাকে এই ভাবে বুঝিয়াছি যে ঐশ্বর্য্য সংবরণেই শ্রীশ্রীঠাকুরের মহত্ত্ব। সে মহত্ত্বটুকু সহজ মানুষভাবে মানুষের প্রতি প্রেম। সাধারণ মানুষভাবে যদি কিছু ভাগবত আতিশয্য বা ঐশ্বর্য্য থাকে তবে সে তাঁহার জীবপ্রেমই একমাত্র ঐশ্বর্য্য।

এই ত গেল শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐশ্বর্য্যের কথা। তাঁহার চরিত্রের আর একটা বিশেষত্ব যাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি তাহা ন্যায়-অন্যায়ে সমবোধ। কোন দেশের উচ্চতম আদালতের জ্ঞাতসারে যদি কেহ কোন অন্যায় বা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম করে, উক্ত আদালতের উহা শাসনের চরম শক্তি থাকিলেও যতক্ষণ না কোন নিম্ন আদালত তাহা তাহার গোচরীভূত করে ততক্ষণ কোন ক্ষমতা পরিচালন করে না; তদ্রূপ শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে কোন অন্যায় কার্য্য ঘটিতে থাকিলেও শ্রীশ্রী-ঠাকুর তাহা শাসন না করায় আমরা অনেক সময় মনে মনে বড় দুঃখিত হইয়াছি কিন্তু যখন কেহ এই বিষয় বাহ্যিকভাবে তাঁহার গোচরে আনিয়াছে ও তদ্বিষয়ে তাঁহার বিচার চাহিয়াছে তিনি তাহার প্রতিবিধান করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে সহজ মানুষের চক্ষে কখনও কাহারও কুটিল গতি লক্ষ্যে পড়ে না। সুতরাং বাহ্যিক জগতে কোন্‌টা যে ভাল খাপ খাইবে না তাহা বিষয়বিষদুষ্ট সামাজিক লোক যখন ধরিয়া দিত, তখনই তাহাদের সন্তোষের জন্য প্রতিবিধান করিতেন। কি মঠে, কি পুরীতে এইভাবে এই সহজ মানুষটীর শিষ্যশাসন চলিত।

সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বত্রবিদ্যমানতা ও ভক্তবৎসলতা—কেহ বাহ্যিক ভাবে তাঁহাতে অন্যায় বোধ জাগাইয়া না দিলে তদ্বিষয়ে তাঁহার খেয়াল হইত না ইহা মনে করিয়া কেহ যেন তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতায় সর্ব্বত্রবিদ্যমানতায় ও ভক্তবৎসলতায় সন্দেহ না করেন। তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বত্রবিদ্যমানতা ও ভক্তবৎসলতা দর্শনে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। এখন সে সমস্ত কথা

ব্যক্ত করিবার সময় আসিয়াছে ; কিরূপ মহাপুরুষকে না বুঝিতে পারিয়া আমরা হেলায় হারাইয়াছি তাহারই কয়েকটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি।

ভক্তের ভগবান্ এ কথা শুধু আমরা পুঁথিতে পড়িয়া থাকি, অতীত মহাপুরুষের শিষ্যগণের ভক্তিগাথায় শুনিয়া থাকি। কিন্তু ভগবান্ যে কিসে সাড়া দেন, তাহার সন্ধান কত জন রাখিয়া থাকে ? বিনা সাধনায়, বিনা মন্ত্রে, বিনা যন্ত্রে, বিনা আবাহনে, বিনা আয়োজনে—শুধু ভক্তি-বিশ্বাসের আকর্ষণে দুঃখীজনে করুণা বিতরণে যখন বিশ্বপ্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন প্রেমপসরা শিরে লইয়া দ্বারে দ্বারে যাচিয়া প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর ধনীর গৃহে ধনীর বেশে যাইয়া তাহাদের দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া তাহাদের ভিতর ভগবদ্ভাবের উদ্বোধন করিয়াছেন। আবার দীন দুঃখীর জীর্ণ দীর্ণ পর্ণ-কুটীরে দীনের ন্যায় গিয়া তাহাদের পুত্রকন্যাগণের মূত্রগন্ধময় ছিন্নকন্থায় শয়ন করিয়া শাকান্ন খাইয়া আসিয়াছেন—শুধু তাহাদিগকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিবার জন্য। কারণ কোন্ গৃহস্থ বিভূতিবিভূষিত কৌপীনসম্বল পিঙ্গলজটাজালমণ্ডিত ব্রহ্মজ্যোতি-উদ্ভাসিত রাম্‌তা সন্ন্যাসীকে তাহার অন্দরমহলে স্থান দিতে সাহসী হইত? আর কোন্ নর-নারীই বা তাঁহার সম্মুখে বাহির হইয়া ধীর ও সুস্থচিত্তে তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানের শুষ্ক কথা সুখশ্রাব্য সঙ্গীতের ন্যায় শুনিত ? এ কথা যে কেহ শুনিতে চাহে না—এ যে দুনিয়াদারীর কোন কথা নহে। তাঁহার কঠোর সাধনা—তাঁহার জ্ঞান প্রেম, তাঁহার নিজের জন্য নহে। তাঁহার জীবনব্যাপী কঠোর সাধনার সুধাময় ফলের সমান অংশীদার সবাই—সে স্ত্রী হউক আর পুরুষই হউক।

ভগবান্‌কে পাওয়া যায় কিন্তু কি ভাবে পাওয়া যায়—কোন সাধনায় তাঁহাকে ধরা যায় কি-না তাহা জানি না। তবে জানি, বিশ্বাস করিয়া

ভালবাসিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়—যেমন ভাবে প্রেমিক তাহার প্রেমিকাকে বাহুবেষ্টনীর ভিতর পাইয়াছে—যেমন ভাবে ক্রন্দনপর ব্যাকুল শিশুর ক্ষুদ্র বাহুলতার বেষ্টনীর ভিতর দায়রায় বিচারপতি পিতা স্বীয় আসন হইতে নামিয়া আসিয়া ধরা দিয়া থাকেন—যেমন ভাবে পথিপার্শ্বস্থ ঘৃণিত ত্যক্ত রুগ্ন জনগণের কাতরধ্বনি রাজাধিরাজের গাড়ী থামাইয়া দেয়। ঠিক এমনিভাবে- ঠিক এমনি ব্যাকুলতায় ব্যথিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ত্রিপুরার উজানিসার গ্রামের এক দীন পরিবারকে ধরা দিয়াছিলেন। তথায় এক দীন পরিবার শোকাচ্ছন্ন হইয়া এক অতি জীর্ণ কুটীরের ভিতর শ্বশ্রূ ও পুত্রবধূ ভক্তানুগ্রহকাতর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তির নিম্নে বাহ্যজ্ঞানহীনা হইয়া ভূম্যবলুণ্ঠিতা হইয়া পড়িয়াছিল। আজ সব শূন্য—কালও অশ্বিনী বাঁচিয়া ছিল—এমনি সময় সে কত মা বলিয়া ডাকিয়াছে—পত্নী শৈলবালাকে কত কাছে ডাকিয়াছে—একমাত্র শিশুপুত্রকে কত আদর করিয়াছে—কিন্তু আজ সে কোথায়? জগতে অশ্বিনী ভিন্ন তাহাদের আত্মীয়-স্বজন যে আর কেহ নাই। বৃদ্ধার জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে মুখ তুলিয়া চাহিল—দেখিল সম্মুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের বড় ফটোখানি যেন করুণাহীন; সে ফটোখানি যেন একটা ব্যঙ্গের হাসি হাসিল—সে হাসি জানাইল, জন্মমৃত্যু-রহস্যটা যেন কিছু নয়—প্রহেলিকা মাত্র। বৃদ্ধা আর চাহিতে পারিল না—চক্ষু নত করিল—দেখিল সংজ্ঞাহীনা পুত্রবধূর রূপরাশির বান ডাকিয়া উছলিয়া পড়িতেছে—বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিল। ক্রোধকম্পিত কলেবরে গৃহসংলগ্ন শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তিখানা জোর করিয়া টানিয়া লইয়া সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "ছিঃ ঠাকুর! তোমাকে ঘরে এনেই না আমার অশ্বিনীর এই অবস্থা হইল। অশ্বিনীকে নাকি তুমি বড় ভালবাসিতে? আমার অশ্বিনী চ'লে গিয়েছে, আর তোমাকে ঘরে রাখিব? মা হোয়ে তাকে বিসর্জ্জন দিয়েছি, তোমাকেও

বিসর্জ্জন দিব।" অতঃপর বৃদ্ধা ফটোখানি লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

অন্ধকার রাত্রি। অস্পষ্ট আলো। চারিদিক নিস্তব্ধ। এই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একাকিনী বৃদ্ধা পুষ্করিণীর নিকট গিয়া ফটোখানি জলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে কে যেন মধুরস্বরে ডাকিল, "মা, মা, আমিও ত তোমার ছেলে—কিসের দুঃখ?" বৃদ্ধা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। আগন্তুক সম্মুখে আসিলে, নিথর, নিষ্কম্প, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও চলচ্ছক্তিহীন হইয়া দাঁড়াইয়া সে দেখিল—এ যে ঠাকুর—যাঁর প্রতিমূর্ত্তি বৃদ্ধা জলে ফেলিতে যাইতেছে। সেই কুঞ্চিত কেশরাশির সযত্নে পাকান জটাসপুক—সেই সৌম্য মুখমণ্ডল—সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টি—সেই স্থূলদেহ, আজানুলম্বিত বাহু—সদ্য ইস্ত্রি করা দুগ্ধধবল থানধুতি। বিস্ময়ের অবধি নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন "চল মা, গৃহে যাই; আমি তোমাকে মা ব'লে ডাকব, তাতেই তোমার বুক জুড়াবে। অশ্বিনী আমার কাছেই আছে।"

বৃদ্ধা ফিরিয়া চলিল। গৃহে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বৃদ্ধার কোলেই বসিয়া পড়িলেন। আর কোথায়ই বা বসিতে দিবে—কিছু যে নাই। গৃহে যা' ছিল—সবই মলমূত্রাদিতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—যা'কিছু ভাল ছিল অশ্বিনীর সাথে দেওয়া হইয়াছে। বৃদ্ধার কোলে বসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ডাকিলেন "শৈল! ওঠ্, ওঠ্, দেখ্, আমি এসেছি।" মৃত অশ্বিনীর স্ত্রী দেখিল—শ্রীশ্রীঠাকুর শাশুড়ীর কোলে বসিয়া। শৈল পূর্ব্বাপর সব ভুলিয়া গেল। একদিন দু'দিন এইভাবে গেল—শ্রীশ্রীঠাকুর ঘর হইতে নড়িলেন না। তাদেরও আর কাঁদা হইল না—কান্না আসিল না। তারপর তাহাদের ছোট ছেলেটীর গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "কোন ভয় নাই—সব সময়ই আমি দেখছি। এখন যাই,

বিপদ আপদ হ'লে আবার আস্‌ব।" শ্রীশ্রীঠাকুর বাহিরে গিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন।

অশ্বিনীদের অবস্থা দিন আনা দিন খাওয়া—দু'দিনের সংস্থান তাহাদের নাই। নিতান্ত নির্ভরশীল ভক্ত সে—তাই অপরিসীম দৈন্যের ভিতরও সে এই ছোট পরিবারের ভার কোনও মতে বহন করিতেছিল। সম্পদের ভিতর ছিল তার অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি। এখন সে মারা গিয়াছে—ঘরে একমুঠো চাউল নাই, অথচ মৃত্যুজনিত যমলজ্জায় মানুষের সম্মুখে যাইবার উপায় নাই। এক ছেলের মা—ছেলে খাইয়া পেট ভরে নাই—এখন আবার পাড়ায় বাহির হইয়াছে। ঘরের বৌ শৈলবালা ছেলেমানুষ, বয়স তাহার মাত্র ষোল বৎসর—কোলে শিশু, সে কোথায় যাইবে—আর কেই বা কি দিবে? কেন দিবে? কত দিন দিবে? দুঃখ পরকে জানাইয়া কি হইবে? যতদিন পুকুরে হিঞ্চে শাক ছিল—নাল ছিল, ততদিন লোকলোচনের অজ্ঞাতে তাহাই তুলিয়া লইয়া সিদ্ধ করিয়া খাইয়াছে—পুকুরে আর যে কিছু নাই। দিন যতই যাইতে লাগিল—শোক ততই পুরাতন হইতে থাকিল। জল খাইয়া উদর পূর্ত্তি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল; এইভাবে প্রায় ২০ দিন অতিবাহিত হইল—শরীর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। তারপর ক্ষুধার জ্বালা আর সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের আসনের সম্মুখে শৈলবালা মাটী কামড়াইয়া পড়িয়া রহিল। ঠিক এই দিবস রাত্রে দুর্ব্বৃত্তগণ পর্ণকুটিরের আশেপাশে ঘুরিতে লাগিল; শৈলবালা নিম্নস্বরে শাশুড়ীকে বলিল "মা, কি উপায় হবে—বাড়ীতে লোক এসেছে—এক্ষুণি হয়ত আমাকে জোর ক'রে নিয়ে যাবে। গুরুদেব, রক্ষা কর।" শাশুড়ী নিরুপায় হইল—শরীর অবসন্ন—কথা বলিবার আর সামর্থ্য নাই। শুনিতে পাইলেন, বেড়ার দড়ির বাঁধন কাটিয়া বেড়া টানিতেছে। গভীর নিশীথে সতীর সতীত্ব ম্লান করিবার জন্য—পাপের পঙ্কিল প্রবাহে আর

একটী ফুল্ল তরুণীর ভেলা ঘাটে ঘাটে ভাসাইবার জন্য দুর্ব্বৃত্তেরা কর্ম্মতৎপর—আর গৃহাভ্যন্তরে নিরুপায় হইয়া অসহায় দু'টা প্রাণী সতীত্ব গরবে গরবিনী সুদীর্ঘ বিংশ দিবস অনশনক্লিষ্টা হিন্দুরমণী যোড়করে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোর নিকট তাঁহার উদ্দেশ্যে—বেতস লতার ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে সাশ্রুলোচনে মিনতি করিতে লাগিল—"রক্ষা কর, রক্ষা কর, সতীত্ব রক্ষা কর—লজ্জা নিবারণ কর। হে ঠাকুর! হে দয়াময়! অভাজনের বিপদ বারণ কর—তোমার প্রতিশ্রুতি পালন কর—দেখা দাও, দেখা দাও।" কিন্তু কাহারা যেন ঘরে ঢুকিল। তখন হিন্দুকুল-ললনা ডাকার মত ডাকিল—"গুরুদেব! গুরুদেব!!"

সঙ্গে সঙ্গে দূর হইতে শুনিল "ভয় নাই—ভয় নাই।" সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর—তারপর মুহূর্ত্তের মধ্যে দ্বার ভাঙ্গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর গৃহে প্রবেশ করিলেন। দুর্ব্বৃত্তগণ হুড়াহুড়ি করিয়া সরিয়া পড়িল। শ্রীশ্রীঠাকুর অতঃপর গৃহের মাঝে বসিলেন। একটী ভাল আসন নাই যে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বসিতে দেয়। একটী দেশলাই নাই, একটু কেরোসিন নাই যে একটী আলো জ্বালিতে পারে। তাহাদের এই ব্যর্থ চেষ্টা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই বলিলেন—"থাক্‌না, আলোতে কাজ কি? শোন, তোমাদের কোন ভয় নাই। বিশ্বাসীজনের বিপদ আপদ সমস্তই ভগবান বুক পেতে নেন।" তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের পদতলে পড়িয়া কেবলই কাঁদিতে থাকিল। শ্রীশ্রীঠাকুর অভয় দিয়া বলিলেন "রাত্রে শোবার পরে যখনই দ্বার খুলবি, দেখবি তোদের ঠাকুর দাওয়ায় বসে তোদের পাহারা দিচ্চে। আবার ভয় পাস্‌নি যেন অন্যলোক মনে ক'রে।"

এইভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর ছ'টা মাস তাহাদের পাহারা দিয়েছেন। তারপর একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর শাশুড়ী এবং পুত্রবধূকে দু'খানি গেরুয়া কাপড় দিয়া বলিলেন—"এখন থেকে তোমরা গেরুয়াই পরবে। কেহ আর তোমাদের দিকে ঘেঁষবে না। দুর্ব্বৃত্তদের নজর এখন কমে

এসেছে—অধর্ম্ম কত দিন ?" বলিয়া বাড়ীর চারিদিকে একটী গণ্ডি দিলেন। অতঃপর সেই গণ্ডি দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—"রাত্রে তোমরা এ গণ্ডি পার হয়ো না—এর ভিতর থাকলে কাহারও সাধ্য নাই তোমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করে।"

এই ঘটনা আর বিস্তৃতভাবে লিখিতে ইচ্ছা করি না, হয়ত অন্য কেহ এবিষয় লিখিয়া সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব যথা তথা যেভাবে প্রকট হইয়া হিন্দুগৃহস্থের অন্দরমহলে ভক্তের মনোরঞ্জনে লীলাচাতুরীময় হইয়া পুরীতে বসিয়া নানাস্থানে খেলিয়াছেন তাহা তাঁহার পুরীর সেবকগণ ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারেন নাই যে তিনি কোথায় কি ভাবে কি খেলা খেলিতেছেন।

জগৎসীর শ্রীযুক্ত —র স্ত্রীর হিষ্টিরিয়া রোগ ছিল। হিষ্টিরিয়ায় বাহ্যজ্ঞান নষ্ট হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে একটী কালো ছোট মেয়ে তাঁহার দেহ হইতে বাহির হইয়া তাঁহার শিয়রে গিয়া বসে। প্রায়ই তাঁহার হিষ্টিরিয়া হইত এবং হিষ্টিরিয়ার সময় নিয়তই এই ছোট কালো মেয়েটীকে দেখিতেন এবং হিষ্টিরিয়া ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে সে কালো মেয়েটী যেন আবার তাহার দেহে প্রবেশ করিত আর তখনই সঙ্গে সঙ্গে হিষ্টিরিয়া ভঙ্গ হইত। একদা হিষ্টিরিয়া ভঙ্গ হইবার পর কালো মেয়েটিকে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। তখন কালো মেয়েটী * * স্ত্রীর সহিত কথা বলিতে লাগিল—"আমি কালী—তুইও যা' আমিও তা'—আমিও যা' তুইও তা।" তারপর বলিল—"আমরা উভয়ে এক"। অতঃপর পূর্ব্বের ন্যায় তাহার দেহে প্রবেশ না করিয়া ধীরে ধীরে শূন্যে মিলাইয়া গেল। আবার অন্যদিন হিষ্টিরিয়া হইল—কালো মেয়েটী দেহ হইতে বাহির হইল—শিয়রে বসিল—হিষ্টিরিয়া ভঙ্গ হইবার পরে তাহার সহিত কথা বলিতে লাগিল। এইভাবে তাহাকে অভ্যস্ত করিয়া লইতে থাকিল যাহাতে * * বাবুর স্ত্রী এই অস্বাভাবিক ব্যাপার দর্শনে ভীতা না হন।

একদা মেয়েটী ধীরে ধীরে বড় হইল এবং বড় হইয়া কখনও কালী কখনও শ্রীশ্রীঠাকুর হইল—পরে কালী হইয়া শূন্যে মিশিয়া গেল।

মৈমনসিংহ জেলায় * * * দেবের ভাগিনেয়ীর প্রাণের প্রগাঢ় আকুলতায়, ভক্তি ও বিশ্বাসের ফলে নিঝুম নিশীথে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রকট হইয়া তাহার সহিত নানা গল্প গুজবে রাত্রি কাটাইয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। ভোর হইয়া রৌদ্র উঠিলেও শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন—"আর একটু গল্প করা যাক্, উঠ্‌তে দেরী হলে যদি বকে, বলিস্ ঘুম ভাঙ্গে নি।"

এদিকে মৈমনসিংহ জেলার একটী নিভৃত গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাখেলা চলিতেছে আর পূর্ব্বাপর যেরূপ আধঘুম ও আধজাগরণে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিশাবসান হয়, সেইরূপ ভিন্ন তদ্বৈপরীত্য পুরীতে কখনও লক্ষিত হয় নাই।

ভুবনেশ্বরনিবাসী গোবিন্দ পাণ্ডা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত। বহু ধ্যানধারণা জপাদি করিয়াও যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐশ্বরিক ভাবের সাড়া পাইল না—তখন তাহার ভিতর একটা যন্ত্রণা উপস্থিত হইল—জীবনভার বহন করা তাহার পক্ষে দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়িতে লাগিল। বিরহকাতর জীবন অপেক্ষা উহা ত্যাগ করিয়া জ্বালা জুড়ান ভাল মনে করিয়া উদ্বন্ধনে দেহত্যাগ করিবে ঠিক করিল ও গভীর নিশীথে গলদেশে দড়ি সংলগ্ন করিয়া বৃক্ষশাখায় ঝুলিয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রকট হইয়া "আমি সর্ব্বদাই সঙ্গে আছি" বলিয়া দড়ি হইতে তাহাকে দুই হাতে নামাইয়া বৃক্ষতলে রাখিলেন। প্রাতে তাহাকে সবাই বৃক্ষনিম্নে অচেতন অবস্থায় দেখিতে পাইল। গোবিন্দদার গলে এখনও দড়ির দাগ আমরা দেখিয়া থাকি।

গারোহিলের তুরা জেলা হইতে অক্ষয়দা লিখিয়াছেন—

"বাংলা ১৩২৭ সনের ঘটনা—বৈশাখ মাস। আমি তখন বিহারের সীমান্তের নিকট, মেদিনীপুর জেলার অরণ্যাঞ্চলে ছিলাম। স্থানের

নাম চিঙ্কিগড়, B. N. Ryর গিডনি ষ্টেশন হইতে ৩/৩½ মাইল দূরে। একটী আহত ব্যাঘ্রকে মহিষের সাহায্যে বন হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া শিকার করিতে যাইয়া আমি ব্যাঘ্র কর্তৃক আক্রান্ত হই এবং তাহার সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করিয়া কোনক্রমে পলাইয়া আসি। আমার শরীরে কোন আচ্ছাদন ছিল না সুতরাং কোমরের উপরে আমার সমস্ত শরীর বাঘের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। চিকিৎসার জন্য আমি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল-এ নীত হই। আমার শরীরের রক্তক্ষয় এত বেশী হইয়াছিল যে ক্ষতস্থানগুলি পচিয়া উঠা সত্ত্বেও অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হইতেছিল না। প্রথম দশদিন দিনরাত প্রায় সমস্ত সময় আমি অজ্ঞান অবস্থায় কাটাইতাম। আমার শয্যার নিকট আরও একজন বাঙ্গালী রোগীর শয্যা ছিল এবং তিনি তখন প্রায় সুস্থ হইয়া হাসপাতাল ছাড়িয়া যাইবেন। দশম দিনে আমার ক্ষতস্থান-গুলির অস্ত্রোপচার হইবে স্থির হইল। সেদিন প্রাতঃকাল হইতে আমি অজ্ঞান ছিলাম এবং আমার মনে খুব ভয় হইতেছিল। আমি পাশের ভদ্রলোকটীকে তাহা প্রকাশ করায় তিনি বলিলেন—'দাদা ভয় কি ? যে নাম এ কয়দিন দিনরাত আপনি উচ্চারণ করিতেছিলেন সেই নাম করুন।' আমি উত্তরে বলিলাম 'দাদা আমি ত কিছুই জানি না—কি নাম আমি অজ্ঞাতসারে উচ্চারণ করিয়া আসিতেছিলাম বলিতে পারেন কি ?' তিনি বলিলেন—'কেন ? আপনি এখানে আসিবার পর হইতেই আপনার মুখ হইতে কেবল "জয়গুরু" "জয়গুরু" নাম বাহির হইতেছিল।'

অস্ত্রোপচার হইয়া গেল। শরীরের উপরার্দ্ধ—বিশেষভাবে হাত দুখানা ড্রেসিং অবস্থায় এক ভাবে বিছানায় পড়িয়া থাকিতাম। ঐ সময় ৩ মাস আমি রাত্রে ঘুমাইতে পারিতাম না। ঘুম মোটেই হইত না। ঠিক কয়দিন পরে আমার স্মরণ নাই—একদিন গভীর রাত্রে দেখি শ্রীশ্রীঠাকুর আমার বিছানার নিকট দাঁড়াইয়া আছেন—আমাকে

বলিলেন 'কিরে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে ?—না ?—কিন্তু কিসের যন্ত্রণা ! এই দেখ্ আমারও শরীরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা !" চাহিয়া দেখি আমার শরীরের যেখানে যেভাবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আছে শ্রীশ্রীঠাকুরেরও সেই সব স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর আমার যন্ত্রণা নিজ অঙ্গে ধারণ করিয়া আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর এই অধমাধম সন্তানের জীবন রক্ষা করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। এর কয়েকদিন পরে মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আমাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি আমাকে অস্ত্রোপচার করিয়াছিলেন। কেমন আছি জিজ্ঞাসা করিলে আমি উত্তর করিলাম বড় দুর্ব্বলতা অনুভব করি। তিনি বলিলেন—তোমার এতশীঘ্র এরূপ উন্নতি হইবে আমি কল্পনাই করিতে পারি নাই। ১½ মাস কাল বোধ হয় আমি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছিলাম, তারপর সেখান হইতে জোর করিয়া আমি চলিয়া আসি। আমার বিবাহের ঠিক এক বৎসর পরে এই ঘটনা ঘটে।"

এইরূপ বহু ঘটনা বহু স্থানে হইয়াছে তাহা লিখিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে—পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিতে, ভক্তগণের অনিচ্ছাকৃত বিজ্ঞাপন দিতে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞতার সার্টিফিকেট প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। এই ভাবের বহু ঘটনার সমাবেশ এই স্থানে করা যাইতে পারে যদ্দারা তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা ও ভক্তবৎসলতার ও ঐশ্বরিক ভাবের পরিচয় তাঁহার বিশেষ বিশেষ ভক্তগণ পাইয়াছেন ও প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন।

ভগবৎকৃপা প্রকাশের যে ধারা—মহাপুরুষের কৃপার ধারাটাও ঠিক তদ্রূপ। কাহার নিকট কি ভাবে যে ধরা দেন—তাহার একটী ধরা-বাঁধা নিয়ম কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা যাহা বুঝিতে পারিতেছি

তাহা এই যে, কৃপা বাহ্যিক আচার বিচার, অনুষ্ঠান, বংশের উচ্চতা নীচতা, কৌলিন্য বা মালিন্য, শিক্ষা বা অশিক্ষা, দৈহিক সৌন্দর্য্য, বয়স, ধনৈশ্বর্য্য বা দীনতা কিছুরই অপেক্ষা রাখে না ; শুধু প্রাণের আকুলতা ও বিশ্বাসের সূত্র ধরিয়াই উহা বর্ষিত হয়।

১৩

দুর্ভেদ্য আবরণের ভিতর এই সহজ সরল দেবমানবটী আত্মগোপনের চেষ্টা করিলেও তাঁহার স্বরূপটা মাঝে মাঝে প্রকাশ হইয়া পড়িত ইহা আমরা দেখিয়াছি। "ভক্ত ও ভগবান" যেরূপ অবিচ্ছেদ্য—"গুরু ও শিষ্য"ও তদ্রূপ অবিচ্ছেদ্য। তাহা যদি না হইত তবে শিষ্য-ভক্তের আকর্ষণে তাঁহার অসুস্থ শরীরে অত্যধিক ক্লেশ স্বীকার করিয়াও প্রতি বৎসরই দু'একবার বঙ্গ ও আসামাভিমুখে বাহির হইয়া নানা দিক্ ভ্রমণ করিতে হইবে কেন ? তাঁহার শরীর যতই অসুস্থ হইতে থাকিল, ভ্রমণও তত কমিয়া আসিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর ক্রমেই বুঝিতে পারিলেন ও শিষ্যভক্তদিগকে বলিতে থাকিলেন যে তাঁহার কর্ম্ম শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার অন্তরে তিনটী সঙ্কল্প যাহা আছে, তন্মধ্যে প্রথম সঙ্কল্প সশিষ্যে জন্মভূমি দর্শন। ১২ বৎসর

পরে যখন পুনরায় জন্মভূমি দর্শনের সময় আসিল ঠিক তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের সংকল্প ব্যক্ত হওয়ায় অশ্বিনীবাবু সাবজজ প্রভৃতি ভক্তগণ ঐ উপলক্ষ্যে তাঁহার জন্মভূমিতে একটা স্মৃতিমন্দির প্রস্তুত এবং মেহেরপুর হইতে ৮ মাইল কাঁচা রাস্তা মটর গাড়ী ও বাস যাইবার উপযুক্ত করিবার জন্য বহু অর্থব্যয়ে উহা সংস্কার করাইলেন। সমগ্র দেশ হইতে বহু শিষ্যভক্ত যাওয়ায় কুতবপুরের ন্যায় একটা অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য পল্লী অকস্মাৎ যেন জনপদে পরিণত হইয়া পড়িল।

১৩৩৩ সালের কার্ত্তিকমাসের সেই স্মরণীয় দিনের অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীঠাকুর ভৈরব নদতীরে পৌঁছিলেন। তদীয় গ্রামবাসিগণ নিম্নলিখিত অভিনন্দন সঙ্গীতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। সে সঙ্গীত গ্রামবাসী অনেকের ভিতর শ্রীশ্রীঠাকুরের পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া দিয়াছিল।

(১)

জয় নিগমানন্দ জগৎ-বন্দ্য এস এস তুমি হে !
কর চির পবিত্র পুণ্য তীর্থ তোমার জন্মভূমি হে।
তব জ্ঞান ও ভক্তি পুত্র কন্যা,
নাশুক ধরার কলুষ বন্যা,
আজি ধন্য হউক এ সারা ধরণী তব পদধূলি চুমি হে।

(২)

পল্লী জননী মোর,
চেয়ে দেখ্ ওই বিশ্ববিজয়ী পুত্র ফিরেছে তোর ;
দীন হীন তোর শূন্য ভবনে
বিনা আয়োজনে বিনা আবাহনে,
এতদিন পরে আজি পুনঃ তব মুছাতে নেত্রলোর।

ভরা ভৈরবকূলে,
জীবনের যত সুখের কামনা চিতা 'পরে দিয়ে তুলে,
যে পুত্র তোরে তেয়াগি জননী
গেছিল, সে আজ এসেছে আপনি
বিশ্বভুবন জয় করি মাগো তোরই চরণমূলে।

দীর্ঘ দ্বিযুগ ধরি
যে পুত্র লাগি তপ্ত অশ্রু নীরবে মোচন করি,
অহরহ শুধু চাহি আশাপথ
ছিলি মাগো তুই সেই মনোরথ
কর্ মা পূর্ণ, কর্ মা আজিকে সে তনয়ে বুকে ধরি।

দে মা ওঁব শিরে তুলি
আশীষ মাখান শিশিরসিক্ত শুভ্র শেফালীগুলি ;
স্নেহে সকরুণ অঞ্চল দিয়ে,
মুখখানি ওঁর নে মা মুছায়ে ;
দেখুক দেবতা এ দৃশ্য আজি স্বর্গদুয়ার খুলি।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভৈরবতীরে পৌছিলে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের খুল্লতাত অশীতিবর্ষবয়স্ক যুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায় (ভট্টাচার্য্য) মহাশয় সাশ্রুলোচনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দ্বিতীয়বার ১২ বৎসর পরে জন্মভূমিতে পদার্পণ করিলেও তাঁহাকে চিনিলেন—তাঁহার স্কন্ধে মস্তক রাখিলেন ; শ্রীশ্রীঠাকুরের চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু নির্গত হইল। সে করুণ দৃশ্যটা এখনও আমাদের সম্মুখে ভাসিতেছে। অসীম আনন্দপ্রবাহের ভিতর বহু শিষ্যভক্ত ও দর্শক প্রভৃতির দ্বারা

পরিবৃত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ৩।৪ দিন কুতবপুরে অবস্থান করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিলেন। যথারীতি উৎসবান্তে শ্রীশ্রীঠাকুর ঢাকা, ময়নামতী, চট্টগ্রাম ও আসাম মঠ হইয়া পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তারপর পৌষমাসে আসিলেন খড়কুসমা আশ্রমে ভক্তসম্মিলনী উপলক্ষে। এই বৎসরই হরিদ্বার কুম্ভে যোগদান উপলক্ষ্যে নানা প্রতিষ্ঠান হরিদ্বারে স্থান সংগ্রহ করিতেছিল।

দ্বিতীয় সঙ্কল্প : সশিষ্যে হরিদ্বার কুম্ভে যোগদান—শ্রীশ্রীঠাকুরের দ্বিতীয় সঙ্কল্প ছিল সশিষ্যে হরিদ্বার কুম্ভে যোগদান করেন। কিন্তু খড়কুসমার ভক্তসম্মিলনীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সশিষ্যে হরিদ্বার কুম্ভে যোগদানের প্রস্তাব কোন কোন শিষ্য কর্ত্তৃক উত্থাপিত হইলেও বহু অর্থ ব্যয় ভয়ে ঐ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত মতিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় অগ্রণী হইয়া হাওড়ার উকিল শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মিত্র মহাশয়কে হরিদ্বারে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন যে তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া যদি একটী মক্ষিকাও নড়ে তবে সে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। ফণীবাবু হরিদ্বার গিয়া দেখেন যে তথাকার স্থান প্রায় বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে—রোরি দ্বীপে সামান্য স্থান তখনও অবশিষ্ট আছে। তিনি কুম্ভ কমিটীর পক্ষ হইতে ২০০৲ টাকায় ঐ স্থানে কিছু জমি সংগ্রহ করেন। খড়কুসুমার ভক্তসম্মিলনীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সশিষ্যে কুম্ভে যোগদানের প্রস্তাব বাতিল হইলেও কুম্ভকমিটী সশিষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের কুম্ভে যোগদান করিবার তারিখ বিজ্ঞাপিত করিলেন এবং ৮০৫৯৲ আট হাজার উনষাট টাকা তদুদ্দেশ্যে চাঁদা আদায় হইল। তখন কুম্ভ-কমিটী নিম্নলিখিত আবাহন পত্রে তাঁহাকে কুম্ভে যোগদান করিবার জন্য প্রার্থনা জানায়।

ওঁ গুরুর্জয়তি

পরমারাধ্যতম

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীমৎ পরমহংস-স্বামি-নিগমানন্দ সরস্বতী গুরুবর-চরণসরোরুহেষু।

কৃপাকটাক্ষপাতেনাজ্ঞানধ্বান্তবিনাশিনে।
সচ্চিদানন্দরূপায় তুভ্যং শ্রীগুরবে নমঃ॥
অমলসলিলধৌতে নির্ম্মলে নাকনদ্যাঃ
সুজনগণসনাথে পাবনে তীর্থবর্য্যে।
সকলবিবুধবৃন্দং শ্রীহরিদ্বার নাম্নি
স্বজনগণসমেতং সঙ্গতং কুম্ভযোগে॥
তদিহ তব পদাব্জধ্যানহৃষ্টা বয়ং ত্বাং
শরণাগতজনৌঘেহনুগ্রহং দর্শয়ন্তং।
জননমরণভীতিং নাশয়ন্তং নরাণাং
গুরুবর শুভযোগাদাহ্বয়ামঃ পবিত্রাৎ॥
স্বাগচ্ছ পাবনে তীর্থে দেবাধ্যাত্মবিভূতিভিঃ।
আশাং ত্বং পূরয়াস্মাকং কিমন্যৎ প্রার্থয়ামহে॥

সারস্বত কুম্ভসমিতিঃ ২০৩ সংখ্যক পঞ্চাননতলা রোডস্থ ভবনাৎ। হাওড়ায়াম্ ১৮৪৮ শকাব্দীয় সৌর চৈত্রস্য পঞ্চমদিবসে।	ত্বচ্চরণাশ্রিতাঃ শ্রীফণিভূষণ মিত্র শ্রীমতিলাল চক্রবর্ত্তী শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশিশিরকুমার বসু

শ্রীশ্রীঠাকুর সানন্দে কুম্ভ-কমিটীর প্রার্থনায় সাড়া দিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে ২৫০ জন ভক্ত সহ শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদ্বার যাত্রা করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের হরিদ্বার যাওয়ার পূর্ব্বেই বহু শিষ্য-ভক্ত তথায় গমন করেন। হরিদ্বার

ষ্টেশনে তাঁহার বিপুল সম্বর্দ্ধনা হয়। ঐ প্রদেশবাসী ও যে সব ভক্ত ইতিপূর্ব্বে হরিদ্বারে গিয়াছিলেন—এইরূপ ৩।৪ হাজার লোক তাঁহার শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। গুজরাটী, তেলেগু এবং পশ্চিমা সাধুগণও সেই শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রীতিবর্দ্ধন করেন। এখানে প্রায় মাসাধিককাল আনন্দের সহিত অবস্থান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ইতিপূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তিনি আর শিষ্যভার গ্রহণ করিবেন না; শেষ বয়সে যদি তাহাদের কিছু না করা যায় তবে ভার লইয়া কি হইবে—কারণ তিনি জানিতেন যে তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। গুরুগিরি ব্যতীত কোন বাহ্যিক কর্ম্মে যদি আত্মনিয়োগ করিতে না হয় তবে অতি সত্বরই তাঁহার দেহ রাখিতে হইবে। বাহ্যিক কর্ম্মের আকর্ষণ না থাকায় মন সমাহিত হইয়া উর্দ্ধে গমন করিতেছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, তাঁহাকে পুনরায় শিষ্যভার গ্রহণ করিতে হইল—কারণ যাহাদের সহিত এ জীবনে দেনা-পাওনা আছে—তাহাদের মধ্যে অনেকে তখনও আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। তাঁহাকে নানাভাবে এই সমস্ত লোক অনুসন্ধান করিতেছে—কিন্তু প্রাকৃতিক নানা বিপর্য্যয়ে যোগাযোগ ঘটিয়া উঠিতেছে না। অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভগবদ্বিধানে পুনরায় শিষ্যভার গ্রহণ করিতে থাকিলেন। এইরূপ নূতন শিষ্যের ভার গ্রহণ করায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যপ্রদেশে বস্তার রাজ্যে যাইবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বস্তার ভ্রমণের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বস্তার ভ্রমণ—বঙ্গাব্দ ১৩৩৫ সালের ৫ই ভাদ্র গুরুধামে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব। তদুপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর পুরী হইতে হাওড়ায় আসিয়া ফণীদার বাড়ীতে দুইদিন অবস্থান করিলেন; তারপর ৯নং বালক দত্ত লেনে 'মতি-শিশিরের' বাসাবাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। ইতিপূর্ব্বে গঙ্গাগোপাল ব্রহ্মচারী ভ্রমণে বাহির হইয়া উদয়পুর রাজপ্রাসাদে মঠের পরিচালনায় দুর্গোৎসব সম্পন্ন করিবার যে প্রস্তাব আনিয়াছিল, বালক দত্ত লেনের সভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সভাপতিত্বে ঐ প্রস্তাবের অসারত্বের জন্য অনেক বাদানুবাদের পর উহা পরিত্যক্ত হইল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন দাক্ষিণাত্য ও বস্তার ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মতিদা, ফণীদা প্রভৃতি সহযাত্রী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু কুতবপুরে গিয়া তত্রত্য অধিবাসীর একান্ত ইচ্ছায় তাঁহার জন্মভূমির নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করা ও একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় এমন ব্যয়সাধ্য দায়িত্বে জড়াইয়া পড়িলেন যে রামেশ্বর যাওয়া আর যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না এবং বলিলেন যে আগামী বৎসর যাওয়া যাবে। সুতরাং বস্তার যাওয়াই স্থির হইল এবং শ্রীশ্রীঠাকুর পুরী রওনা হইয়া গেলেন। পূর্ব্বে মতিদা, ফণীদা এবং রসরাজ ক্ষেপাদা এই তিন জনের যাওয়াই একরূপ স্থির ছিল। কিন্তু মতিদা ও ক্ষেপাদার যাওয়া হইল না। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে মাত্র হরেনদা, প্রজ্ঞানন্দদা এবং ফণীদার যাওয়া ঠিক হইল। ১৬ই অক্টোবর মঙ্গলবার শ্রীশ্রীঠাকুর যথাসময়ে খড়গ্‌পুরে আসিয়া ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তমলুক হইতে ভীমাচরণদা, মাষ্টার দাদা, খড়কুসমা হইতে চিদানন্দদা, সতীশ ব্রহ্মচারী, যোগেন দাদা প্রভৃতি

অনেকেই আগে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফণীদাও ঐ তারিখে বি, এন, রেলের বম্বে মেলে বিকাল ৪টায় যাত্রা করিলেন। ট্রেন ৬টায় খড়গ্‌পুরে আসিয়া যখন দাঁড়াইল তখন মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। খড়গ্‌পুর ষ্টেশনে ভক্তগণকে অন্তরে বাহিরে ঘুট্‌ঘুটে সূচিভেদ্য অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখিয়া তাহাদের চিদাকাশের পূর্ণচন্দ্রকে কাড়িয়া লইয়া বম্বে মেল ছুটিতে সুরু করিল। গাড়ী ছাড়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফণীদা চিদানন্দদার আশা ছাড়িতে পারেন নাই। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে তাঁহার না যাওয়াটা খুবই সত্য তখন ফণীদার মনের আনন্দ যেন অনেকটা ম্লান হইয়া গেল। অবশ্য রসের অনন্ত উৎস ত সঙ্গেই ছিলেন। কিন্তু সে ভাবটা দীর্ঘকাল ত কাহারও স্থায়ী হয় না। গালুডি স্টেশনে গাড়ী থামিলে ফণীদা শ্রীশ্রীঠাকুরের গাড়ীর দিকে আসিতেই শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে খাইতে খাইতে এক মুঠো আঙ্গুর দিয়া বলিলেন—"এই নে, খা"। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বহস্তে এক মুঠো আঙ্গুর দেওয়ায় তিনি যেন আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। সে যে কি স্নেহের ডাক—কি প্রাণের মমতা মাখান আঙ্গুর, তা ফণীদা এ জীবনে ভুলিতে পারিবেন না বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৭ই অক্টোবর প্রাতে বিলাসপুর ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। সেবকেরা মালপত্র গাড়ী হইতে নামাইল। বস্তারের রাজার তরফ হইতে শাস্ত্রী মহাশয় চার পাঁচজন লোকসহ ষ্টেশনে ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য সব বন্দোবস্ত করিবার জন্য। রায়পুরে রাজার নিজের বিশ্রামাবাস ছিল। সেখানে সব ব্যবস্থাই ছিল। কিন্তু রায়পুর ৫০।৬০ মাইল দূর বলিয়া এখানে ডাকবাংলোতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশ্রামস্থান ঠিক হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে কোন বন্দোবস্ত না থাকায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ হইতে বেলা প্রায় দু'টা হইয়া গেল। তারপর ওখান হইতে মটরে যাত্রা করিতে হইবে,

কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের সাময়িক অন্তর্দ্ধানে শ্রীশ্রীঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"এ দেখি কিছুই বন্দোবস্ত নেই। আমি আর জগদলপুরে যাব না। এখান থেকেই পুরী ফিরে যাব।" এই বলিয়া টাইম টেব্‌ল দেখিতে থাকিলেন। বেলা ৫টায় একটী প্যাসেন্‌জার গাড়ী ছিল। তাতেই ফিরে যাওয়া ঠিক হইল। এমন সময় বস্তার রাজার সেক্রেটারী মিঃ যোশী আসিয়া পড়িলেন। তিনি যখন শুনিলেন যে কোন বন্দোবস্ত না থাকার দরুণ শ্রীশ্রীঠাকুর ফিরিয়া যাইতেছেন তখন তাঁহার দলবল লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পদতলে পড়িয়া তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করিতে থাকিলেন। মিঃ যোশী বলিলেন—ঠাকুর, আপনি যদি এখান থেকে ফিরে যান তবে এতগুলি প্রাণী হত্যা হবে। আমরা একেবারে মারা যাব।

মিঃ যোশীর কাকুতি মিনতি শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর খুব খানিকটা হাসিয়া উঠিলেন। অপরাহ্ণ ৪টায় মটর ছাড়িল। স্থির হইয়াছিল যে কাঁকোর ষ্টেটের বাংলোতে রাত্রি বাস করা হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুর ১৭ই অক্টোবর রাত্রি সাড়ে ন'টায় কাঁকোর রাজধানীতে আসিয়া পৌছিলেন।

১৮ই অক্টোবর প্রাতে কাঁকো হইতে ৫০।৬০ মাইল দূরে কোড়াগাঁও রওনা হইলেন। এখান হইতে বন ও গিরিশোভা "তমালতালী-বনরাজিনীলা" আরম্ভ হইল। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে লাল রাস্তা—নাগরদোলার মত একবার ডুবিয়া যাইতেছেন—আবার ভাসিয়া উঠিতেছেন। ঠিক যেন 'কমলে কামিনী' খেলার মত। তারপর একটা পাহাড়ে উঠিলেন—ঠিক স্ক্রু (screw) প্যাঁচের মত রাস্তা। আশে পাশে পাহাড়গুলি যারা এতক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল—সব যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে মাথা নত করিয়া প্রণত হইয়া রহিল। কি সুন্দর মনোহারী শোভা! এ শোভা শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য-সেবকরা কখনও দেখেন নাই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। দিক্‌চক্রবাল যেন স্থলতরঙ্গে পরিপূর্ণ। পাহাড় পার হইয়াই একটা প্রকাণ্ড মালভূমিতে আসিয়া

পড়িলেন। তারই শেষ প্রান্তে কেশকাল—বস্তার ষ্টেটের পুলিশ ষ্টেশন। সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের মটরের বহর আসিবামাত্র তত্রত্য পুলিশ কর্ম্মচারী ও সিপাহীগণ রাজগুরুকে সম্মান প্রদর্শন করিল। তারপর সেই বিচিত্র বনশোভার ভিতর দিয়া বেলা ১১টার সময় কোঁড়াগাও ষ্টেট বাংলোতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে রাজার অনেক লোক লস্কর বরকন্দাজ প্রভৃতি মোতায়েন ছিল। সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগরাগ সমাপনান্তে বেলা প্রায় ৩টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর রওনা হইতে যাইতেছেন এমন সময় সংবাদ আসিল যে ষ্টেটের শাসনকর্ত্তা (**Administrator**) মিঃ গ্রিগ্‌সন, আই, সি, এস, ও মেমসাহেব রাজগুরুর দর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ গ্রিগ্‌সন মেমসাহেবকে রায়পুরে তুলিয়া দিতে যাইতেছিলেন। যখন তিনি শুনিলেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর কোড়াগাঁও বাংলোতে অবস্থান করিতেছেন তখন তিনি মেমসাহেবের সহিত আর একটা বাংলোতে উঠিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সংবাদদাতাকে বলিলেন—সাহেব যদি দেখা করিতে চান তবে বেলা আড়াইটার সময় দেখা করিতে পারেন। আড়াইটা বাজিয়া গেল, সাহেব বাংলো হইতে বাহির হইলেন না। হয়ত অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে তাঁহার দ্বারা এ কার্য্য সম্ভবপর নয়। অতঃপর দেখা গেল সাহেব বাংলো হইতে বাহির হইয়া অন্তর্নিহিত আত্মাভিমানে কিছুদূর আসিয়া একটা বৃক্ষতলে কেদারার উপর বসিলেন। হয়ত বা মনে করিয়াছিলেন যে সম্মুখের রাস্তা দিয়া যাইবার সময় তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। অতঃপর কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে তিনি সেই কেদারা হইতে উঠিয়া আপন বাংলোতে গিয়া বারান্দায় পাদচারণ করিতেছেন। তাঁহার ভাবভঙ্গিতে বোধ হইল তিনি চান শ্রীশ্রীঠাকুর গিয়া তাঁহার বাংলোতে দেখা করিয়া আসুন। তাহা হইলে আত্মাভিমানের বৃশ্চিক দংশনের হাত হইতে সাহেব নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু ধীমান্

নরপুঙ্গব সাহেব শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বরূপ জানিতেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর বাংলো ছাড়িয়া মটরে উঠিবার সময় বলিলেন—"আমার তার সঙ্গে দেখা করবার কোন প্রয়োজন নেই। তবে তার দেখা করবার আবশ্যক থাকলে সে আস্‌তে পারতো। মটর চালাও।" মটর যখন বাংলো হইতে আসিয়া এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটরের বাংলোর সম্মুখে আসিল তখন সাহেবের কতকগুলি লোক শ্রীশ্রীঠাকুরের মটর বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট সাহেবের সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর গুরুগম্ভীর স্বরে বলিলেন—বেশ ত, তিনি এসে দেখা করতে পারেন। আমি এই মটরে তাঁর জন্যে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করছি।

মিঃ গ্রিগ্‌সন একজন আই, সি, এস,—সমগ্র ষ্টেটের দণ্ডমুণ্ডের একমাত্র কর্ত্তা। তাঁহার প্রতি এইরূপ আদেশ শুনিয়া লোকজন পরস্পরের মুখের দিকে ও শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের দিকে তাকাইতে থাকিল। তখন প্রজ্ঞানন্দজী ফণীদাকে বলিলেন—"ফণীদা, তুমি গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দুটো আলাপ ক'রে এস।"

অতঃপর ফণীদা তাহাই করিলেন। সাহেবের সঙ্গে ১০।১৫ মিনিট নানা কথা ব'লে করমর্দ্দন করতঃ বিদায় গ্রহণ করিলেন। কোড়াগাঁও বাংলো হইতে বস্তার ষ্টেটের রাজধানী প্রায় ৪০ মাইল। যতই বস্তারের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিলেন, অপূর্ব্ব বনশোভায় মুগ্ধ হওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আনন্দসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। প্রাণমাতান নানা গল্প করিতে করিতে রসরাজের রসের অনন্তভাণ্ডারের দ্বার যেন একেবারে উন্মুক্ত হইয়া গেল। এমনিভাবে কত রহস্যময় আত্মকাহিনী, কত রসাত্মিকা আখ্যায়িকা, কত প্রহসন করিতে করিতে চলিলেন। ড্রাইভার বলিল—এইসব জঙ্গল ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল—বড় বড় নরখাদক ব্যাঘ্রে পরিপূর্ণ। এমন কি দিনের বেলায়ও বড় বড় বাঘ রাস্তা অবরোধ করে। দুই তিনজন লোক একসঙ্গে যাতায়াত করে, তাদেরও সামনে এসে প্রায়ই উপস্থিত হয়।

অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের মটর একটী সুসজ্জিত তোরণ দ্বারে পৌছিল। গেটটী শ্রীশ্রীঠাকুরের অভ্যর্থনার জন্য নদীর পরপারে প্রস্তুত হইয়াছিল। গেটের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের মটর আসিবামাত্র রাজার সেক্রেটারী, প্রাসাদ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, ইঞ্জিনীয়র, কুলপুরোহিত ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীগণ যাঁহারা ফুলমালা হাতে অপেক্ষা করিতেছিলেন তাঁহারা একে একে সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণিপাত করিলেন। এবার শ্রীশ্রীঠাকুর মূর্ত্তিমতী বৈতরণীর তীরে উপস্থিত হইলেন। নদীটী রাত্রে ভীষণা ও প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। প্রশস্তও বেশ – অন্ততঃ ৩০০।৪০০ ফিট হবে। কোলের কাছে কল কল ক'রে ভীমবেগে প্রবাহিত ভরা নদী—'ক্ষুর ধার খর পরশা'। মাঝে মাঝে ওপারে গলান চাঁদীর উপর চাঁদের আলো পড়িয়াছে। নদীর এই লীলাতরঙ্গ যেন কোন অসীম অনন্তের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। নিকটে তরঙ্গ—দূরে রজতরেখা দেখিয়া যেমন সবারই প্রাণ জুড়াইয়া গেল—অপর দিকে তেমনি মটর আরোহণে সেই নদী পার হইতে হইবে শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। সে আতঙ্কের মাঝে একমাত্র ভরসা শ্রীশ্রীঠাকুর। নদীপারের সম্বল একখানি কাঠের প্লেন বোট।

ইতঃপূর্ব্বে আর একটা নদী পার হইবার সময় পারের আয়োজন দেখিয়া সেবকগণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে মটর হইতে নামিতে বলায় তিনি জোর গলায় বলিয়াছিলেন—"আমি নাম্‌তে টাম্‌তে পারব না বাপু"। তারপর এখন যখন ৬টা কাঠের ডোঙ্গায় নির্ম্মিত তরীখানির বুকের উপর আরোহীসমেত মটরখানি চড়িল, ক্ষুদ্রপ্রাণ সে তরীখানি বুকের চাপে জীবনান্ত হইবার উপক্রম হ'য়ে নদীগর্ভে শেষ আশ্রয় নেবার জন্য নীচে নামিতেছিল তখন সকলের একান্ত অনুরোধে শ্রীশ্রীঠাকুর অবশেষে মটর হইতে অবতরণ করিলেন। ফণীদা একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ধমক খাইয়াছেন বলিয়া এবার তিনি অন্তরে অত্যন্ত ভীত হইলেও কোন

গতিকে চোখ বুজিয়া গাড়ীতে বসিয়া রহিলেন। অনেক লোকজন আসিয়া উপস্থিত—রাজগুরুর নৌকা পার করিবার জন্য। বড় বড় অফিসারগণও আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা এ কার্য্যে যথেষ্ট মনোনিবেশ-পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। বোটখানিকে অনেক দূরে স্রোতের প্রতিকূলে টানিয়া লইয়া গিয়া তারপর ভাসাইয়া দিল। তখন রাত্রি প্রায় ঘণ্টাখানেক হইয়া গিয়াছে। মাঝি তিনজন ছিল—তার মধ্যে একজন নাকি বহু প্রাচীন ও খুব হুঁসিয়ার। সে আজন্মকাল এই নদীতে নানা বিভীষিকার মধ্যে কর্ণধারগিরি অতি সুখ্যাতির সহিত করিয়া আসিতেছে। এই দীর্ঘকালের ভিতর যদি একবার দৈবক্রমে মটরসমেত ৩।৪টী আরোহী জলমগ্ন হয় তবে তার পক্ষে সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। যাহা হউক, যেমনি নৌকা ছাড়া—অমনি সেই স্রোতের ভূয়োদর্শন ও নৈপুণ্যের অধিকারী মাঝির তারস্বরে চীৎকার। তাহার নৌকা ঠেলিবার বাঁশটা সুদীর্ঘ হইলেও নদীর গভীরতা তদপেক্ষা অধিক হওয়ায় বেচারীকে সেই খরস্রোতা নদীর উপর নিরাশ্রয় হইতে হইল। নদীর কিনারায় জলের গভীরতা দেখিয়া ভয়ে তীরের লোকজন সব ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িল। যাহা হউক কোন প্রকারে ওপারের গন্তব্য ঘাট হইতে নৌকাখানিকে বহু দূরে রজ্জুসহকারে টানিয়া লইয়া গেল।

এবার এপারে উঠিতে হইবে—বোট হইতে স্থল পর্য্যন্ত ৫।৬ হাত কাঠের তক্তা বিছান। তারপর একেবারে বুক উঁচু খাড়াই। রাস্তার উপর বাখারীর দরমা পাতা আচ্ছাদন। যদি কেহ কখনও হেলান নারিকেল গাছে চড়িয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি অনুমান করিতে পারিবেন যে কেমন ভাবে মটরখানিকে সেই তক্তার উপর দিয়া গাছে চড়িবার মত ডাঙ্গায় উঠিতে হইবে। আর সে তক্তার নীচে! লোলজিহ্বা বিস্তারকারী, সংহারের প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি খরস্রোতা নদী। তখন সেই খরস্রোতা নদীর কী রুদ্ররসময় চণ্ডচারু ভাব! প্রলয়ঙ্করী

নদীর রুদ্র রূপের সবিশেষ বর্ণনা করিতে না পারায় ফণীদার উপরে ভাবুক ভক্ত ও কবিকুল বিশেষতঃ ললিত ও গীতি কাব্যের কবিরা যেন খড়্গপাণি না হন ; ইহা তাঁহার দ্বারা সম্ভব না হওয়ায় তিনি তাঁহাদের নিকট ক্ষমা চাহিয়াছেন। নিশ্চিত মৃত্যুর দ্বারদেশে পৌঁছিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবমাধুর্য্যে ফণীদা এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাহা এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"অনেকে বিভূতি দেখবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হন। ছোটখাট বিভূতিগুলি ত একটা হঠযোগের কসরৎ মাত্র। এ দেখতে মানুষের এত উৎকণ্ঠা—এত আগ্রহ কেন জানি না। সকলের চেয়ে বড় বিভূতি যেটা, সেটাতে আমরা অন্ধ। একটা মানুষ যখন তার সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান প্রাণটা তুচ্ছ ক'রে সম্মুখে কালের করাল মূর্ত্তিটিকে হাসিমুখে বরণ করে তখন তার চেয়ে বড় বিভূতি, তার চেয়ে মনমোহন যৌগিক সম্পদ যে কি থাকতে পারে তা' জানি না। হৃদয়ে নিরুপমা সৌন্দর্য্যপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত থাকলে মানুষ এমন করে মৃত্যুর ভীম গর্জ্জন মধুর সঙ্গীতের মত শুনে—এইটাই চিন্তা ক'রে আনন্দে আপ্লুত হই। মনে হয় এর চেয়ে সুন্দর মৃত্যুঞ্জয় গরীয়ান জীবন আর কি হতে পারে? এই ত সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ—এই ত সিদ্ধ জীবনের চরম ঐশ্বর্য্য !"

যাহা হউক এখন পথের কথা আরম্ভ করা যা'ক। তক্তাগুলি ঢালু ভাবে পাতা হইয়াছে। কাহারও সঙ্গে কাহারও বন্ধন নাই। আশে পাশে সম্মুখে পশ্চাতে তক্তা সরিয়া যাইবার কোন প্রতিবন্ধক নাই। মটরখানি বস্তার রাজার নিজস্ব—আয়তন বেশ বৃহৎ—ওজনে ৪০।৫০ মণের কম নয়। তার পর চালক সমেত ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ৫টী মানব-জীবন। একটী তক্তা সরিয়া গেলেই অতল জলে মহীরাবণের দেশে গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে। কিন্তু সেই অবস্থায়ই মটর ষ্টার্ট দিল। যেমনি মটরখানি বোট ছাড়িয়া তক্তায় আসিয়া পড়িল অমনি

দুখানি তক্তা দুই দিকে সরিয়া গেল। আর মটরখানি আরোহী সমেত নীচের দিকে নামিতে সুরু করিল। খানিকটা নামিয়া গিয়া বোটের কাঠে আটকাইয়া গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর ও প্রজ্ঞানন্দজী পিছনের প্রথম সিটে ছিলেন। ফণীদা ও হরেণদা চালকের পার্শ্বে ডগ্ সিটে—গাড়ীর পশ্চাৎ দিকটীর কতকাংশ জলমগ্ন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থাটা এক প্রকার উর্দ্ধপদ—হেঁটমুণ্ড। যেমনি একটী বিকট শব্দের সঙ্গে গাড়ীখানি নীচের দিকে নামিতে সুরু করিল শ্রীশ্রীঠাকুর সস্মিতমুখে একবার বলিলেন— "এই রে মরেছে!" এই ব'লে নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। ভীতির কোন ভাব প্রকাশ করিলে শ্রীশ্রীঠাকুর কাপুরুষ মনে করিবেন—এই আশঙ্কায় ফণীদা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বাহিরে প্রকাশ না করিলেও তখন তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে। আসন্ন মৃত্যুভয়ে যখন তাঁহার অন্তর মুহুর্মুহু কাঁপিয়া উঠিতেছে, ঠিক তখনই মনে পড়িল তাঁহার অতীত জীবনের একটী ঘটনা। একদা পুরীতে সমুদ্রস্নানকালে তরঙ্গাভিঘাতে তিনি যখন বহু দূরে গিয়া পড়িয়াছিলেন—কূলে আসিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় জীবনের আশায় নিরাশ হইয়াছিলেন—তখন সেই জীবন-মৃত্যুর ভয়সঙ্কুল ব্যস্ততার সন্ধিক্ষণে যাঁহার স্মরণ মাত্র শূন্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বেলাভূমিতে টানিয়া উঠাইয়াছিলেন, সেই করুণাঘন সচল বিগ্রহ শ্রীশ্রীঠাকুর ত একই মটরে বসিয়া। ফণীদা তখন মনকে দৃঢ় করিলেন। এদিকে কুলি ও অন্যান্য লোকজন সব চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল ও সেই তক্তাগুলির উপর কেরামতি করিতে লাগিল। তখন এমন অবস্থা যে একটী তক্তা যদি পার্শ্বে আর একটু স্থানচ্যুত হয় তাহা হইলে ৫ জনের তৎক্ষণাৎ সলিল-সমাধি। কিন্তু তাহাতে তাহাদের কি? তাদের যত লক্ষ্য সেই তক্তাগুলির উপর। সেই তক্তাগুলিকে ধরিয়া যখন তাহারা টানাটানি করিতে থাকিল— সেক্রেটারী, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি তখন সেখানে নাই। তাঁহারা তীরে তরী

সংলগ্ন হওয়া মাত্র অগ্রদোত্য করিবার জন্য অতি দ্রুত রাজধানী মুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অকারণ কেন সেই বর্ব্বরগুলির হাতে প্রাণ হারাতে হবে—এই ভাবিয়া ফণীদা কোন গতিকে মটর হইতে নামিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দরজার কাছে আসিয়া বলিলেন—"ঠাকুর! এমনভাবে বসে থেকে লাভ কি? আসুন—নেমে আসুন"! এই আসন্ন বিপদের মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুরের আনন্দের ফোয়ারা যেন শতমুখে উৎসারিত হইতেছে। তিনি বলিলেন—"আমি ওপরে পা—নীচে মাথা রেখে বেশ আরামে আছি। বাপু, উঠ্‌তে টুথ্‌তে পারবো না"। ফণীদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। এই মুহূর্ত্তে গাড়ীখানি অতলজলের নীচে চলে যাবে। এ অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের এই রসালাপে ফণীদা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। তখন সকলে সবিশেষ মিনতি করিতে থাকিলে শ্রীশ্রীঠাকুর যেন অতি বিরক্তিভরে নামিয়া আসিয়া তীরে উঠিলেন ও বলিলেন—"কেন তোরা আমাকে তুল্লি—আমি বেশ মজা ক'রে শুয়েছিলাম"।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিয়া ফণীদা বিস্মিত হইলেন। যোগে আত্মদর্শন ক'রে—জ্ঞানে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান উপলব্ধি ক'রে ও আত্মার অমরত্ব প্রতিপাদন ক'রে, প্রেমভক্তিতে ভগবদিচ্ছায় নিজের ইচ্ছা লয় ক'রে, মহাশক্তি ও আত্মশক্তি অভেদ জানিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার পক্ষে এই রসালাপ সম্ভব হইয়াছে বলিয়া ফণীদা মনে করিলেন। তারপর তীরে উঠিয়া সেই আনন্দের উৎস চলিতে থাকিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—বিপদ্ টিপদ্ ব'লে আমার কাছে কিছু নেই। আমার সবই জানা। বড় অদৃষ্টবাদী আমি।

সেক্রেটারী যোশী মহাশয় আর একটী মটর আনাইলেন। বড় মটরটা ঐরূপ শরশয্যাশায়ী হইয়া থাকিল। শ্রীশ্রীঠাকুর, প্রজ্ঞানন্দজী ও ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী তিনজন সেই মটরে উঠিয়া রাজধানীতে রওনা

হইলেন। রাজপ্রাসাদ সেখান হইতে ১০ মিনিটের পথ। ফণীদা নদীতীরে অপেক্ষা করিতে থাকিলেন। এইভাবে করদ রাজ্যের রাজকর্ম্মচারীদের চরম অব্যবস্থার মধ্য দিয়া অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া ভক্তের প্রাণের টানে শ্রীশ্রীঠাকুর রাজধানীতে পৌছিলেন। রাজপ্রাসাদের সম্মুখে বহুদূর পর্য্যন্ত রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে পুলিশ, সিপাহী, পদাতিক, অশ্বারোহী সৈন্য, বরকন্দাজ, চৌকিদার প্রভৃতি সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের মটর তথায় পৌছান মাত্র সেই সব লোক মিছিল করিয়া ব্যাগপাইপ, বিলাতী ব্যাণ্ড, সানাই প্রভৃতি নানাপ্রকার বাদ্য সহযোগে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রসাদের তোরণ পর্য্যন্ত লইয়া আসিল। রাজরাণী এবং উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ জোড়হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারা নতশির হইয়া জোড়করে পথ প্রদর্শন করিয়া চলিলেন। নকীব ফুকার দিতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুর সেবকগণ সহ খাস অন্দরে আসীন হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সুসজ্জিত মখমলে কাসামযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইবার পর রাজা ও সখীগণের সহিত রাণী আসিয়া চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তাঁহাকে বরণ করিলেন। অতঃপর রাজার কুলগুরু, শিক্ষক, সেক্রেটারী প্রভৃতি সকলে তাঁহার চরণ বন্দনা ও অর্চ্চনা করিলেন।

বস্তারের রাজপ্রাসাদে শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রীশ্রীঠাকুর তরুণ রাজা ও তরুণী রাণীর ভাব ও ভক্তির পবিত্রতায় এতই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন—আনন্দে এতই আত্মহারা হইতেন যে ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির ঋষিত্বের জ্ঞানগরিমা ও যোগৈশ্বর্য্য দূরে সরাইয়া দিয়া একেবারে তাহাদের সমপর্য্যায় বালকস্বভাব হইয়া যাইতেন ও মন প্রাণ খুলিয়া খুব সহজ সরলভাবে কথা বলিতেন। সঙ্গে যে সব সেবক গিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব দেখিয়া তাঁহাদের মনে যেমন আনন্দের সঞ্চার হইত—ঈর্ষা ও আশঙ্কা হইত ততোধিক। মানুষ সব বস্তুরই অংশ হয়ত দিতে পারে কিন্তু ভালবাসার অংশীদার করিতে চায় না। ঐ এক জায়গায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঈর্ষা আনে। অন্যে যদি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বেশী ভালবাসে তবে তাঁহাদের প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহ ভালবাসা দয়া দাক্ষিণ্য কিছুটা ম্লান হইয়া যাইতে পারে—এই ভাবটা ফণীদার মনে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল। এই ভাব তাঁহার মনের উপর এতই গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছিল যে ইহা একদা স্বপ্নে রূপ পরিগ্রহ করিল। তাঁহার স্বপ্নের প্রসঙ্গটা এখানে বর্ণনা করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। উহা এইরূপ :—

"যেন একটা স্বর্ণমণিমাণিক্যখচিত বৃহৎ রথে শ্রীশ্রীঠাকুর মহিমময়—গরিমময় মূর্ত্তিতে মধ্যাসনে বসিয়া আছেন। আর রাজা-রাণী তাঁহার উভয় পার্শ্বে বসিয়া আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর রাজা-রাণীর গলায় আপন বাহুবল্লী বেষ্টন করিয়া ধরিয়া আছেন। রথ শনৈঃ শনৈঃ চলিতেছে। আর আমি ফণী মিত্র, অতিদূরে যেন একজন অচিন্ সাধারণ দর্শক মাত্র। কত চেষ্টা করছি—শ্রীশ্রীঠাকুরের নজরে পড়বার জন্য—মনে মনে কত সঙ্কল্প করছি—ঠাকুর! আমি যে তোমার দীর্ঘকালের পরিচিত ২০৩ নং

পঞ্চাননতলা রোডের ফণী। আমাকে চিন্‌তে পারছ না? দীনকে বুঝি ভুলে গেলে দিন পেয়ে—রাম মিতে। কিছুতেই কোন কাজ হ'লো না। শ্রীশ্রীঠাকুর আমার উপর উদাসীন। আমার ক্ষোভ এবং হিংসায় প্রাণের মধ্যে দানাবল জ্বলতে লাগলো—সে জ্বালার দহনে নিদ্রাভঙ্গ হোয়ে গেল। এ স্বপ্নের কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলেছিলাম। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর মুচকি হাসলেন মাত্র। আমাদের মনে ভয় হতে থাকল। শ্রীশ্রীঠাকুর স্পষ্টই একদিন ব'লে ফেল্লেন—দ্যাখ, এদুজনাকে দেখলে আমি বাস্তবিকই আনন্দে ডুবে যাই। এরা যেন শিব ও শক্তি—আর আমি সাক্ষী মাত্র।" কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন যে পূর্ব্বজন্মের বার ভূঁইয়ার "কেদার রায়" এই জন্মে "বস্তাররাজ" হইয়াছেন।

এদিকে দুর্গোৎসব আসিয়া পড়িল। এখানকার কৌলিক প্রথা এই যে পঞ্চমী হইতে একাদশী পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টার সময় রাজা ও রাণী রাজবেশ পরিধান করিয়া বিরাট শোভাযাত্রা সমভিব্যাহারে তোপ-ধ্বনির ও নকীব ফুকারের সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সিংহদ্বার পর্য্যন্ত যাইবেন। সিংহদ্বারের এক পার্শ্বে কুলদেবী দন্তিকেশ্বরীর মন্দির, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া রথারোহণ করিতে হইবে। আর সেই রথ অপত্যস্থানীয় প্রজাপুঞ্জের দ্বারা টানা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বর্শাধারী অশ্বারোহী, কিরীচ-বন্দুকধারী পদাতিক, আশাসোটাধারী বরকন্দাজ, তীরধনুকধারী মুরিয়া সাঁওতাল, ও নানাপ্রকার বাদ্যসম্ভারে বাদকদল প্রভৃতি যোগদান করিবে।

সম্মুখে জগন্নাথের মন্দির—চতুর্দ্দিক ইষ্টকের প্রাচীরে বেষ্টিত। ২।৩ একর পরিমিত ভূমি মন্দিরপীঠ। রথ সেটীকে পরিক্রমা করিয়া রাজা-রাণীকে গেটের সম্মুখে লইয়া আসে। সেখান হইতে তাঁহারা পুনরায় এইরূপ ভাবে শোভাযাত্রা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাজোচিত ধীর পাদক্ষেপে বাদ্যের তালে তালে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই বিরাট শোভাযাত্রার মধ্যে রাজারাণীকে দেখিতে এত আনন্দ পাইতেন যে প্রতিদিন যেমনি রাজারাণীর প্রাসাদ হইতে বহির্গমনসূচক বাজনা বাজিয়া উঠিত, শ্রীশ্রীঠাকুরও অমনি তাঁহার কক্ষ হইতে শশব্যস্তে আসিয়া ছাদে দাঁড়াইতেন। আর যতদূর দৃষ্টি যায় অনিমেষ নয়নে তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। বলিতেন—"আমার দেখতে বেশ লাগে—তোরা আমাকে রোজ এ দৃশ্য দেখাস্"। কোন কোন দিন রাজা-রাণী প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া রাজার খাসদরবারে সিংহাসনে উপবিষ্ট শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণতলে মেঝের উপর বসিয়া নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেন।

প্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে ৫টার সময় হইতে **Queen's own Regiment**, বয়স্কাউট, আর নাচগান ও খেম্টা ইত্যাদির দলে ভরিয়া যাইত। খেম্টার দল যা দু'একটা আসিয়াছিল—তাহারা নাচে গানে বিশেষ পারদর্শী হইলেও উড়িয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গীতের দলের বিকট সঙ্গীতের কোলাহলে পরাভব স্বীকার করিয়া কোণঠাসা হইয়া পড়িত। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত এই সব চলিত। রসময় শ্রীশ্রীঠাকুর এই সব দেখিয়া বড় আনন্দ প্রকাশ করিতেন ও মাঝে মাঝে টীকা-টিপ্পনী করিতেন—যাহাতে হাসিতে হাসিতে সেবকদের নাড়ী ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইত। শ্রীশ্রীঠাকুর এসবের আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন বলিলেন—"ছাখ কাল এসব শুনে আমার রাত্রে বেশ সুনিদ্রা হোয়েছিল।" গুণগ্রাহী জনার্দ্দন নীরস কাঠের ভিতর হইতে নিঙ্ড়াইয়া রস বাহির করিয়া লইলেও সেবকদের সেই একসুরে গান, এক ধরণের নাচ—সবই একঘেয়ে হওয়ায় বিরক্তি আসিয়াছিল। সকলের চেয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে একটা ভালুক আর তাহার সঙ্গে একটী রমণীবেশধারী মানুষ, এই দু'জনার নাচ। এটী সত্যিকারের একটি বন্য ভালুক নয়—সভ্য সমাজের মানুষ ভালুক। লোকটী এত অবিকল ভালুক সাজিয়াছিল ও ভালুকের

ভাবভঙ্গী দেখাইতে লাগিল যে শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন—'এ লোকটা পূর্ব্বজন্মে ভালুক ছিল—সেইসব সংস্কার নিয়ে জন্মেছে।' তাহার সঙ্গে রমণীমূর্ত্তিটা কে জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'ওটা কে জান না? উনি জাম্বুবতী'।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভালুকের নাচ দেখে আত্মহারা হ'য়ে প্রায় প্রত্যহ বলিতেন—'সেই ভালুকের নাচটা আমায় দেখাস্'। সেবকদের একদিন, দুইদিন এইসব দেখে আর ভাল লাগিত না, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর সে দগ্ধ দারুর মধ্যে যে কি জগন্নাথ দর্শন করিতেন তা তিনিই জানিতেন। এই সব অতি সাধারণ ব্যাপারে শ্রীশ্রীঠাকুর যে আনন্দ আহরণ করিতেন উহাতে তিনি যে প্রকৃত দ্রষ্টা তা ফণীদা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

* * *

ক্রমশঃ দশমী আসিয়া পড়িল। বিজয়া দশমীতে বিশেষ ধূমধাম। আজ দরবার দিন। রাত্রি ৮টায় দরবার আরম্ভ। দরবার গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ যেন একটি বিশাল জনসমুদ্র। অন্যান্য দিন যে-সব সৈন্যসামন্ত যোগদান করে—তদ্ব্যতীত বাহিরের বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছে। রাজার অধীনস্থ বড় বড় জমিদারগণ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ কিংখাবসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে রজত আসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহারা আসিয়াছেন দরবারে যোগদান করিবার জন্য। রাজ্যের প্রথা এই যে দশরার দিনে যদি কোন অধীনস্থ জমিদার দরবারে যোগদান না করেন, তবে তাঁহার জমিদারী রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। কাজেই সকলকেই বাধ্য হইয়াই আসিতে হইয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে সম্মানিত অতিথি দর্শক হিসাবে যোগদান করিবার জন্য কয়েকদিন হইতে রাজারাণী অনেক অনুরোধ ও মিনতি করিয়া

আসিতেছেন। অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন; তিনি রাজদরবারে যাইবেন বলিয়া রাজদম্পতি রাজগুরুর পোষাক পাঠাইয়া দিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পোষাক পরিবেন বলিয়া কচিছেলে ঔৎসুক্যাধিক্যে যেমন হাসিয়া হাসিয়া বলে সেইরূপভাবে বলিতেছেন—"ওরে, সব ভাল কাপড়চোপড় যা আছে বের ক'রে দে দেখি।"

অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুরকে রাজপ্রদত্ত সমস্ত পোষাক পরাইয়া দেওয়া হইল এবং সেবকগণের সহিত তিনি যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বাপরের মত এবারও রাজা-রাণীকে দেখিবার জন্য জনসমুদ্র উদগ্রীব ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া সেবকগণ মটরে আসীন। দর্শকগণ রাজা-রাণীকে দেখিতে আসিয়া হঠাৎ সবারই পলকহীন দৃষ্টি শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর নিবদ্ধ হইল। দরবারে যোগদানকারী জমিদারগণেরও তদবস্থা। তাঁহাদের মনের অবস্থা এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে তাঁহারা বহুদিন ধরিয়াই ত রাজা-রাণীকে দেখিয়া আসিতেছেন কিন্তু এবারে এক নূতন দৃশ্য—নয়নাভিরাম মনোহর দেবদুর্লভ মানবমূর্ত্তি—এ রূপ দর্শনলাভ ত সচরাচর ঘটে না। সমবেত জনতার দৃষ্টি রাজা-রাণীর দিকে আকৃষ্ট হইবার কথা। রাজা-রাণীই তাঁহাদের হৃদয়াসনে বহু দিন হইতে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু ইনি যে রাজা-রাণীরও হৃদয়ের দেবতা। রাজা-রাণীর ভক্তির আকর্ষণেই তাঁহাদের পক্ষে এই দর্শনলাভ সম্ভব হইয়াছে। যাঁহার দর্শনলাভ সাধুজনবাঞ্ছিত, তাহা কি সবার ভাগ্যেই সম্ভব? সুতরাং আশ্চর্য্য না হইবার কারণ কি? কত সাধু বহু চেষ্টা করিয়াও ত তাঁহার দর্শন পায় নাই।

এমত সময়ে সেক্রেটারী আসিয়া সংবাদ দিলেন "মহারাজ! দরবার-গৃহে প্রথমে আপনি আসীন না হ'লে রাজা-রাণী তথায় যাইতে পারিতেছেন না। রাজা স্বয়ং আমাকে নিবেদন করতে আদেশ দিয়েছেন। এখন যা হুকুম হয়।" "বেশ" ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর সেবকগণকে

সঙ্গে লইয়া রাজরাজেশ্বরের ন্যায় বিপুল সমারোহের সহিত দরবারগৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা-রাণী রথ হইতে নামিয়া দরবারগৃহে প্রবেশ করিলেন। জমিদারগণ একে একে যাঁর যাঁর নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। রাজা-রাণী আজ রণসাজে সজ্জিত। রাণীর এই প্রকার রণবেশ দেখিয়া হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় রমণীর শৌর্য-বীর্য্যের পূর্ব্বস্মৃতি ফণীদার মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠিল। তাঁহার মনে এইরূপ অনুশোচনা আসিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—হায় ভারতজননী! তোর সৌন্দর্য্যগরিমার কাছে স্বর্গও যে একসময় সরমে সঙ্কোচ অনুভব করিত। তোর গর্ভেই তো প্রবীর, জনা, উত্তরা, ভীষ্ম, অভিমন্যু, অর্জ্জুন প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডব স্থান পাইয়াছিল। বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ বীরকেশরীর পাশে লক্ষ্মীস্বরূপা কুসুমপেলবা ললিত-মধুরা মাধবীলতা! ভগবদ্ভক্তি, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি অন্তরের সৌন্দর্য্যে বিভূষিতা—সত্যে, ত্যাগে, বীর্য্যে, চিত্তৌদার্য্যে ভারতীয় নারী জগতের মুকুটমণি ছিল। সেই সব মহৎ গুণগরিমাকে হরণ করিয়া কে তোকে সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়াছে? এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে ফণীদার অন্তরে যেন দাবানল জ্বলিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার এ প্রৌঢ় দেহটা যেন বদলাইয়া আসিতে ইচ্ছা হইল। দরবারগৃহে উপস্থিত ভারতীয় অন্যান্য রাজন্যবর্গের সদাচারগুলি প্রাণহীন কঙ্কালে পরিণত হইলেও সেগুলি অনেক পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিল। ফণীদার প্রাণের ভিতর যেন দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল এবং মনে হইল যেন সারা ভারতবর্ষটাই তাঁহার নিজের গৃহ এবং সেই গৃহে আগুন লাগিয়াছে। সুতরাং দরবারগৃহের এই প্রকার জাঁকজমক দেখিয়াও তিনি তৃপ্তি এবং আনন্দ লাভ করিতে পারিলেন না। রাজা সমরসাজে সজ্জিত, কর্ণে মুক্তার কুণ্ডল, শিরে রাজমুকুট, গলদেশে মণিময় মালা, প্রশান্তবক্ষে মণিমুক্তার হার ঝলমল করিতেছে।

কটিদেশবেষ্টনীসংলগ্ন স্বর্ণকীলকবিশিষ্ট কিংখাপের মধ্যে শায়িত তরবারি। রাজা ও রাণী দরবারগৃহে প্রবেশ করিয়া কয়েকটি চিরাচরিত প্রথার আনুষ্ঠানিক মাঙ্গলিক ক্রিয়া সমাপনান্তে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর রাণীর মস্তকে বরাভয়কারী দক্ষিণ হস্ত-স্পর্শে আশীর্ব্বাদ করিলেন। দরবারগৃহের সমস্ত দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর নিপতিত হইল। একদিকে ত্যাগ, বৈরাগ্য, জ্ঞান, প্রেমের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীশ্রীঠাকুর—অপরদিকে জাগতিক ভোগৈশ্বর্য্যের পূর্ণ বিকাশ রাজা-রাণী। অভিনব এ দৃশ্য—অক্ষম লেখনীতে ইহার ভাষাদান অসম্ভব। জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য যেন ত্যাগ-বৈরাগ্যের চরণে নতজানু হইয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষায় উন্মুখ। অতঃপর রাজা-রাণী সিংহাসনে আসীন হইলে ১২ জন অবগুণ্ঠনবতী রমণী তাঁহাদিগকে বরণ করিল। তখন অধীনস্থ জমিদারগণের ভেট দান আরম্ভ হইল। অধিক রাত্রে দরবার ভঙ্গ হইল।

জনসমুদ্র দর্শনে শ্রীশ্রীঠাকুর—পরদিন শ্রীশ্রীঠাকুর রাজা-রাণীর আমন্ত্রণে তাঁহাদের রথারোহণের মিছিল দেখিতে মটরে বাহির হইয়াছিলেন। বিশাল প্রান্তর—সুপ্রশস্ত রাজপথ সরলপ্রাণ রাজভক্ত প্রজাবৃন্দে পরিপূর্ণ, তিলধারণের স্থান মাত্র নাই। চতুষ্পার্শ্বেই মানব-মস্তকের মহাসমুদ্র। শ্রীশ্রীঠাকুর এ দৃশ্য দর্শনে আনন্দে যেন আত্মহারা হইয়া বলিতেছেন, "ছাখ, এ দৃশ্য আমার বড় ভাল লাগছে—ওরে—চতুর্দ্দিকে মানব-মস্তকের মহোদধি।"

গাড়ীর উপরে শ্রীশ্রীঠাকুর যেন বিশ্বপ্রকাশক গোলাপী বালার্ক—অপূর্ব্ব জ্যোতিতে সমগ্র স্থান উদ্ভাসিত করিয়া বসিয়া আছেন। রাণী তাঁহাকে এই প্রকার দর্শনে বামহাতের স্পর্শে রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যেন সাক্ষীচৈতন্য—বিরাট জনসম্মেলন দেখিতেছেন আর আনন্দে আত্মহারা হইতেছেন। মন যেন আত্মসমাহিত হইতেছে।

আবার কখনও বাহ্যজ্ঞান আসিতেছে। তখন বলিতেছেন 'তোরা ছাখ্—এত মানুষ কেমন যাচ্ছে, কি চমৎকার—কি সুন্দর!'

সাধনাবলে যে অনন্তশক্তি তিনি করায়ত্ত করিয়াছেন, সেই শক্তি প্রতিটী জীবের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে কার্য্যক্ষম করিয়া প্রতিনিয়ত চালু করিতেছে - তিনিই সকলের মধ্যে আবার সকলেই তাঁহার মধ্যে—পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতি প্রতি অণুপরমাণুতে তিনি ব্যাপ্ত। এই জনসমুদ্রের প্রাণের সমস্ত আনন্দ কেন্দ্রীভূত হইয়া তাঁহাতে প্রতিফলিত হইতেছে; সুতরাং এই প্রভূত আনন্দের ইহাই ত কারণ। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাববিহ্বল অবস্থা দর্শন করিয়া ফণিদা শঙ্কিত হইতেছেন—এই মনে করিয়া যে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি আসিয়া কোন প্রকার অনর্থ না ঘটে। যাহা হউক কোনও ক্রমে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় প্রাসাদে ফিরাইয়া আনিলেন।

* * *

এই প্রকার উৎসবের ঝামেলার জন্য রাণীর শরীর খুবই অসুস্থ হইয়া পড়িল। তৎসত্ত্বেও রাণীর একান্ত ইচ্ছা যে তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভোগ দেন। ইতঃপূর্ব্বেও একদিন রাজা-রাণী উভয়েই রন্ধন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ দিয়াছিলেন। সুতরাং ঐদিন রাণী নিজেই রন্ধন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরেরও বাংলা-দেশে ফিরিবার সময় হইয়াছে জানিতে পারিয়া বস্তারের সিভিল সার্জ্জন ডাঃ মিচেল পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট অনুমতি লাভ করিলেন। তিনি তখন জগতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন।* তাঁহার ঔৎসুক্য যে তিনি একজন

* ডাঃ মিচেলের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের কথোপকথন শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-কথাসংগ্রহ ২য় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

খ্যাতনামা সাধুর নিকট এ সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইলে তাঁহার পক্ষে গ্রন্থ-প্রণয়নে অনেকটা সুবিধা হয়। তিনি নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার বহির্জ্জগতের তত্ত্ব সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হইবার যে ইচ্ছা ছিল তাহা ক্রমশঃ অন্তর্জ্জগতের তত্ত্বে আসিয়া উপনীত হইল। পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মিচেল সাহেব চলিয়া গেলে শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিশ্রম অপনোদনের জন্য রাজা-রাণী উভয়েই ব্যস্ততার সহিত তাঁহার ধূমপানের ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উভয়ের ব্যাপার দেখিয়া আনন্দে হাসিয়া উঠিলেন। এঁদের ব্যাপার দেখিয়া ফণিদা ভীতিবিহ্বলচিত্তে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিলেন, "এখানে এসে অবশেষে আমরা কাঙ্গালের ঠাকুরকে হারালাম?" শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর দিলেন, "নারে ব্যাটা না। যেখান থেকে আরম্ভ, সেখানেই আমার প্রাণ। আরম্ভ-স্থানই আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। ঐ যে দেখিস্ না বড় ব্যবসাদার প্রথমে খুব ছোট দোকানঘর থেকে যখন সে ব্যবসায়ে উন্নতি ক'রে বৃহৎ অট্টালিকায় প্রসারিত করে, তখনও কিন্তু ছোট্ট দোকানের দিকে তার লক্ষ্য পড়ে থাকে এবং তাকেই শ্রদ্ধা করে, পূজা করে, কারণ সেখান হতেই তার বড় হবার সূচনা হ'য়েছে। আমারও তাই। এদের এত আড়ম্বরপূর্ণ জীবন ও জাঁকজমক আমার ভাল লাগছে না। চল্, আবার সেই কালিন্দীকূলে। রাজা-রাণীর ভক্তি ও প্রাণের আবেগই আমাকে এখানে টেনে এনেছে।"

বস্তারে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থানকাল যতই সংক্ষেপ হইয়া আসিতে লাগিল, রাজা-রাণীর সেবার তীব্রতা ততই বাড়িতে লাগিল এবং ধর্ম্ম-তত্ত্বাদি আলোচনার জন্য তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। একদিন ধর্ম্ম-আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"সাধুদের বাহ্যতঃ যেটা ক্রোধ দেখ, ওটা স্বরূপতঃ তাহা কিন্তু নয়। সাধুদের ক্রোধে কোন অমঙ্গল হয় না। বরং চিরকালই তাহা মানবের প্রভূত কল্যাণ সাধন করে।

আবার জগতে তাঁহাদের যে ভাবটী স্থায়ী হয় তাহা প্রথমে বিষবৎ ব'লে মনে হ'লেও পরিণামে তাহাই অমৃতোপম হ'য়ে দাঁড়ায়। সাত্ত্বিক সুখ যেটা, সেটা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে লোকে ধরিতে পারে না। এই ধর—শকুন্তলার কথা। রাজা দুষ্মন্তের কি প্রেম, শকুন্তলার দুষ্মন্তের প্রতি কি প্রগাঢ় ভালবাসা! দুষ্মন্ত তাকে বিয়ে ক'রে উপদেশ দিয়ে গেলেন, 'তুমি কিছুদিন এখানে থেকে আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন কর। পরে আমি লোক পাঠিয়ে তোমাকে নিয়ে যাব।' যখন রাজমহিষী হ'তে চলেছেন তখন শকুন্তলার উচিত ছিল—রাজরাণীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রাখা। কিন্তু তিনি কেবলমাত্র আপন পতির চিন্তা ছাড়া অন্য সব কাজ ভুলে গেলেন। আপন কর্ত্তব্য হতে ভ্রষ্ট হ'লেন। দুর্ব্বাসা দেখলেন—সর্ব্বনাশ! শকুন্তলার ত সমূহ অমঙ্গল। সে এ অবস্থায় রাজমহিষী হ'লে রাজ্যের, রাজার ও তার নিজের সমূহ বিপদ। সুতরাং তিনি অতিথি-সৎকারের বিমুখতার অজুহাতে তাহাকে অভিসম্পাত দিলেন। সুতরাং শাপের অনিবার্য্য ফলে রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে একেবারেই বিস্মৃত হলেন। বাহ্যতঃ এটা অভিসম্পাতের ফলস্বরূপ অমঙ্গল ব'লে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে শকুন্তলাকে আগুনে পুড়িয়ে ময়লামুক্ত ক'রে নেওয়া, সামান্যা মানবী হ'তে তাঁকে দেবীতে পরিণত ক'রে নেওয়া, তাঁর ক্ষুদ্র আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা কাম গলিয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা প্রেমে পর্য্যবসিত করা। রাজা সম্পূর্ণরূপে তাকে ভুলে গেলেন। শকুন্তলার শত কাকুতি মিনতি কিছুই কার্য্যকরী হোলো না। শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাতা হ'লেন। তখন শকুন্তলা আশ্রমে ফিরে এসে আপন ক্ষুদ্র স্বার্থময় প্রাণ বিশ্বে বিলিয়ে দিতে শিখলে। তখনই তার কাম প্রেমরূপে ফুঠে উঠলো। তখনই রাজা দুষ্মন্ত আশ্রমে গিয়ে তাকে নিয়ে এসে রাজরাণী ক'রে নিলেন। এ পরীক্ষার আগুনে না পুড়লে শকুন্তলার, রাজার, রাজত্বের প্রজাপুঞ্জের কার মঙ্গল হো'ত বল দেখি? আমরা এমন দরদী যে তার এই দুঃখ

দেখে দুর্ব্বাসাকে কতই মনে মনে গালি বর্ষণ করি। রাজা অম্বরীষ ও হরিশ্চন্দ্রের দৃষ্টান্তও দেখ। তাদিগকে আজ অমর করলে কে? দুর্ব্বাসা ও বিশ্বামিত্রই ত! প্রেম বা ভালবাসা বড় চমৎকার। বড় নৈসর্গিক বস্তু। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ বাহ্যিকভাবে যাকে প্রেম বলি সেটা আসলে কিন্তু প্রেম নয়। কামেরই অংশ। প্রেমের বস্তুকে জগৎময় বিস্তৃত দেখে তাতে আপনাকে বিলিয়ে দিতে হবে। তোমরা যদি আমাকে ভালবাস তবে আমার যে প্রিয় বস্তু, তোমাদের ভালবাসা স্বতঃই তাতে ধাবিত হবে। তা যদি না হয়—তবে বুঝতে হবে তোমাদের ভালবাসা ক্ষুদ্র স্বার্থপরতাপূর্ণ। মা ছেলেকে ভালবাসে, ছেলের প্রিয় বন্ধু যদি বাড়ীতে আসে তবে মা তার জন্য কি ক'রে থাকে? মা ছেলের সেই বন্ধুকে তার নিজের ছেলের মতই ভালবাসে, আদর যত্ন করে।"

* * *

অন্যান্য দিনের ন্যায় অপরাহ্ণ ৫॥ টার সময় সেবকেরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া বেড়াইতে গেলেন। মটর আজ একটা নূতন পথ ধরিয়া চলিয়াছে। দুইদিকে শস্যশ্যামল ধানক্ষেত। মাঝে মাঝে বন-জঙ্গল। নীরব নিথর পল্লী—জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। মাঝে মাঝে দুই একটা কুকুরের দূরাগত রব শোনা যাইতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের আনন্দ-সাগর যেন আজ উথলিয়া উঠিতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মটরে আরোহণ করিবার আগেই রাজধানীর পিঞ্জরমধ্যে একটা ব্যাঘ্র দেখিয়াছিলেন, তাই বাঘের গল্পই আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"দেখ বাপু! আমি একবার এই রকম এক বাঘের পাল্লায় পড়েছিলাম। বদরিকাশ্রমের পথে রাস্তার অনতিদূরে একটা গাছতলায় ব'সে আছি—এমন সময় হঠাৎ শুষ্ক পাতা-মাড়ান মড়মড় শব্দ কানে এল। পিছন ফিরে চেয়ে দেখি কর্ত্তা আসছেন। সে প্রায় একশত হাত দূরে। আমার তোদের মত অত

গুরুভক্তি ছিল না। যাই হ'ক 'জয়গুরু' ব'লে কম্বলটা আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। আর সেই অল্প সময়ের মধ্যেই বাঘের চিন্তায় তদাকারকারিত হ'য়ে পড়লাম। কম্বলের ভিতর আমার যা অবস্থা হোয়েছিল তার চেয়ে আমার বাঘের হাতে মরণই ভাল ছিল। কিন্তু না—তিনি আমাকে গ্রহণ কল্লেন না। কুকুরের মত আমার মাথা শুঁকে শুঁকে অবশেষে চলে গেলেন। বোধ হয় কঙ্কালসার চেহারা থাকায় বাঘ মহারাজের ভোগে আমি লাগলাম না। এখনকার মত স্থূল শরীর হ'লে নিশ্চয়ই কিছুতেই ছাড়তো না। বাঘ চ'লে যাওয়ার পরেও ভয়ে আমি কম্বল তুল্‌লাম না। তারপর দুটো গাড়োয়ান এসে পড়াতে আমি লাফিয়ে উঠে পড়লাম। ঐ সব ঘটনা আমি তাদিগকে বল্লাম। তারাও ব'ল্লে—হাঁ একঠো বাঘ যাতা থা—হামলোক দেখা হ্যায়। * * *"

৩০শে অক্টোবর—রাত্রি ৮টার সময় ষ্টেটের শাসক মিঃ গ্রিগ্‌সন আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছিল। সুতরাং ঐ তারিখে চিত্রকূটের জলপ্রপাত দেখাও শেষ করিতে হইবে। রাজধানী হইতে ২৩ মাইল দূরে অতি দুর্গমস্থানে এই জলপ্রপাত। শ্রীশ্রীঠাকুর সদলবলে জলপ্রপাত দেখিয়া ফিরিলেন। মিঃ গ্রিগ্‌সনের শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে রাজাকে তিনি কোন্ পথে পরিচালিত করিতেছেন? রাজা দিনরাত্রির অধিকাংশ সময় ধ্যান, ধারণা, পূজা, আহ্নিকে অতিবাহিত করেন। অপরাহ্নে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন আহার করেন। ঠিক সময়মত চুল ছাঁটাই করেন না। নিয়মমত তৈলাদি ব্যবহার করেন না। এই সব কারণে মিঃ গ্রিগ্‌সনের মনে হইতেছিল যে হয়ত শ্রীশ্রীঠাকুর রাজারাণীকে বৈরাগ্যের পথে লইয়া যাইতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর গ্রিগ্‌সন সাহেবকে দৃঢ়ভাবে জানাইলেন যে রাজা বৈরাগ্যের দিকে ধাবিত হইলেও তিনিই রাজাকে সংসারে রাখিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সাহেবকে এই আশ্বাস

দিয়াছিলেন যে গৃহে রাখিয়াই যাহাতে রাজার আত্মার উন্নতি হয় তিনি সেইভাবেই তাহাকে শিক্ষা দিতেছেন ও পরিচালিত করিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আরও বলিলেন,—"সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে বনে গেলেই যে ভগবান লাভ হবে তার কোন মানে নেই। গৃহস্থ লইয়াই সমাজ এবং এই সমাজ লইয়া ভগবানের সংসারলীলা। আদর্শ গৃহী হ'য়ে ধর্ম্মসাধনা করলেও ভগবানকে পাওয়া যায় এবং আমি সেই পথের কথাই প্রচার কর্ত্তে চাই।" * * *

৩১শে অক্টোবর—শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতায় রওনা হইবেন ইহাতে রাজপ্রাসাদে যেন একটা বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিল। রাজা-রাণী উপদেশপ্রার্থী হইয়া পদতলে বসিয়া রহিলেন। নানা প্রসঙ্গে নানা প্রকার আলোচনা হইল। রাজা শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দন্তিকেশ্বরীর মন্দিরে ধন্না দিয়া রাজা আকাশবাণীতে শ্রবণ করিয়াছিলেন যে "তোর গুরু বাংলার স্বামী নিগমানন্দ।" মাতৃমন্ত্রেই শ্রীশ্রীঠাকুর রাজাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। রাজা তান্ত্রিকমতেই সাধনাদি করিতেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন "ঠাকুর, শক্তিতত্ত্ব বড় অথবা বৈষ্ণবতত্ত্ব বড়?" রাজা উচ্চ শিক্ষিত। শাস্ত্রজ্ঞানও প্রচুর। নিজেই সংস্কৃত ভাষায় স্তোত্রাদি রচনা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের স্তব-স্তুতি করিতেন। তাঁহার হয়ত মনে হইয়াছিল যে বেদে যখন মাতৃরূপী ভগবানের কোন সঙ্কেত নাই তখন এই শক্তি উপাসনা মাতৃতান্ত্রিক যুগের শেষ স্মৃতি বহন করিতেছে কি-না, এই সন্দেহে শক্তিতত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব-নিকৃষ্টত্ব সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"ইহা একটা স্তরবিশেষ মাত্র। ব্রহ্মের শক্তিময় অবস্থার কথাই শক্তিবাদ। এই শক্তি একবার আয়ত্তে এসে গেলে এবং সাধকের চেষ্টা থাকলে জানতে পারে যে—শক্তি বাহ্যতঃ বিবিধরূপিণী প্রতিভাত হ'লেও—শক্তিমাত্র এক। যিনি বহিরঙ্গা শক্তি—যাঁকে বলা হয় 'মা', তিনিই

অন্তরঙ্গা শক্তি—হ্লাদিনী—বা বিশ্বনায়িকা শ্রীরাধা। এইজন্য রামপ্রসাদ ব'লেছেন 'বুঝে নাও মন ঠারে ঠোরে', কারণ যাকে "মা" তত্ত্ব করা হয়েছে—তাকে ত আর বিশ্বনায়িকা বলা চলে না। তা হ'লে রুচিবিকার ঘটে। উহা মনে মনে বুঝতে হবে। বহিরঙ্গা শক্তি আয়ত্তে আনবার পর যদি উহাই শেষ মনে না করে—আরও উৎকর্ষ করার চেষ্টা থাকে, তবে যাঁর বহিরঙ্গা শক্তি—তিনিই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির বিকাশ করিয়ে থাকেন। বহিরঙ্গা শক্তির বিকাশ হ'লে সে সাধককে বলে শাক্ত আর তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির বিকাশ হ'লে ভাবভেদে জ্ঞানী বা ভক্ত ব'লে পরিচিত হয়। সাধনার চরম বিকাশেই বৈষ্ণবতা এসে যায়। হ্লাদিনী রূপের মধ্যে এলেই—তাকে বলে শ্রীরাধা। * অন্তরঙ্গা শক্তিতে শক্তির খেলা থাকে না—থাকে শুধু নিকষিত হেম—নির্গুণ ভাবভক্তি বা প্রেম।"

* শ্রীশ্রীনিগমানন্দ কথা-সংগ্রহ ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

মঠাশ্রমের ভবিষ্যৎ—বক্তার ভ্রমণের পর আসাম অথবা পূর্ব্ববঙ্গের যে কোনও স্থানে যাইতে হইলে কলিকাতা অথবা হাওড়ায় কোন ভক্তের বাড়ীতে সাময়িকভাবে অবস্থান না করিয়া বেলঘরিয়ায় সুধীরঞ্জন রায়ের বাসাবাড়ীতে অবস্থান করিতেন। এই বাড়ীতেই জিতেনদার ভগ্নীর বিবাহ শ্রীশ্রীঠাকুরের উপস্থিতিতে এবং নিজব্যয়ে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। উক্ত বাড়ী শিষ্যভক্তসমাগমে তাঁহার উপস্থিতিকালে সাময়িকভাবে তীর্থে পরিণত হইত। কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে বা মঠে যাইতে হইলে শ্রীশ্রীঠাকুর এখান হইতেই যাইতেন। কলিকাতার ন্যায় জনবহুল স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থান শেষ জীবনে অসুবিধাজনক হওয়ায় এই নির্জ্জন স্থানটিই যাতায়াতের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল। মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুর শারীরিক অসুস্থতাহেতু এই স্থানেই বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন। ভ্রমণকালীন একবার দাক্ষিণাত্যে বহু লোক বসন্তরোগের করাল কবলে পতিত হইতেছে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তথা হইতে এই স্থানে আসিয়া বিশ্রামকালীন অবস্থায় তিনি বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এরূপ দারুণ বসন্তরোগে শ্রীশ্রীঠাকুর আক্রান্ত হইয়াছিলেন যে সেবকেরা পর্য্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুর একটু সুস্থ হইলে সেবক প্রজ্ঞানন্দ স্বামী ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ভুবন ব্রহ্মচারী ও জিতেন ব্রহ্মচারী ঐ সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষার ভার গ্রহণ কবিয়াছিলেন। যাহা হউক শ্রীশ্রীঠাকুরের মাঝে মাঝে এইরূপ অসুস্থ অবস্থা শিষ্যভক্তদের বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়া পড়িল। শ্রীশ্রীঠাকুর অদেহী হইলে মঠাশ্রমের ভবিষ্যৎ কিরূপ অবস্থায় দাঁড়াইবে ইহা চিন্তা করিয়া কতিপয় শিষ্যভক্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কেহই সাহস করিয়া ঐ সব বিষয় শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বলিতে সাহসী হইলেন

না। একদা শ্রীশ্রীঠাকুর সান্ধ্যভ্রমণে শটরে বাহির হইয়াছেন। ফিরিতে অনেকটা রাত্রি হইয়া গেল। কয়েকটী শিষ্যভক্ত ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিয়া বাড়ী ফিরিতে মনঃস্থ করিলেন। আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠাশ্রমের অন্যতম ট্রাষ্টী শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস নন্দী মহাশয় বাড়ী ফিরিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতেছেন এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুর সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করিয়া বাসায় ফিরিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর গাড়ী হইতে নামিয়াই নারায়ণদাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন "এই যে নারাণ এসেছো—ভালই হ'য়েছে। এখান হ'তে প্রসাদ পেয়ে যাবে।" অতঃপর যাহাতে শীঘ্রই ভোগের ব্যবস্থা হয়, সেবকদিগকে তিনি তদ্রূপ নির্দ্দেশ দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করিবার জন্য সেবকগণ চেষ্টিত হইল। রাত্রি ৯টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর দুখানা রুটীর একটুখানি ছিঁড়িয়া লইয়া বাকীটা নারায়ণদাকে পাঠাইয়া দিলেন। মহাতৃপ্তির সহিত নারায়ণদা প্রসাদ গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কলিকাতায় ফিরিবার উদ্দেশ্যে শয়নঘরে গেলেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর ভোগান্তে ধূমপান করিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর গড়গড়ার নলটী হাতে লইয়া পালঙ্কে শয্যার উপর বসিয়া আছেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নির্ব্বাক্। গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর নারায়ণদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন তুমি কোথায় যাবে?"

নারায়ণদা।—কলিকাতায় যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর।—কি ক'রে যাবে?

নারায়ণদা।—এখান থেকে হেঁটে ষ্টেশনে পৌছে ট্রেণযোগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ট্রেণ কখন?

নারায়ণদা—রাত্রি ১১॥ টায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—"এখন ত ৯॥টা বেজেছে, ষ্টেশনে ব'সে মশার কামড় খাওয়ার চেয়ে এখানেই অপেক্ষা কর না!" এই ব'লে জনৈক সেবককে

সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইতে নির্দ্দেশ দিলেন। পালঙ্কের নীচে মেঝেয় কার্পেটের উপর নারায়ণদা বসিলেন। উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর নারায়ণদা জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর! দীক্ষা নেবার পর থেকে আমাকে যে মঠাশ্রমের পিছনে লাগিয়েছেন, ইহার ভবিষ্যৎ কি?"

শ্রীশ্রীঠাকুর গম্ভীর স্বরে বলিলেন "এ প্রশ্ন তোমার মনে জাগে কেন? কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে—এ কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? কাজ দিয়েছি কাজ ক'রে যাবে, ফলাফলে দৃষ্টি কেন?"

নারায়ণদা তাঁর স্বভাবসুলভ স্থির ও নম্রভাবে বলিলেন—"আমি সাধারণ মানুষ। আমার কৌতূহল হয়—উত্তর পাই ভাল—না পেলেও আমি আগেও ব'লেছি, এখনও বলছি—মৃত্যু পর্য্যন্ত আপনার মঠাশ্রমের কাজ ক'রে যাব।" নারায়ণদা এই কথা বলিয়াই নীরব হইলেন। পরে আবার বলিলেন—"ঠাকুর, আপনার সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী যাঁরা আছেন—এঁদের একজনকেও আমি উপযুক্ত দেখি না। আপনি অদেহী হবার পর এই মঠাশ্রমের কর্ণধার কে হবে?"

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত নিরুত্তর থাকিয়া বলিলেন—"ছাখো, আমার চারজন আছে, তারা এখন হিমালয়ে সাধনায় রত। যদি ভবিষ্যতে তোমাদের বিশেষ প্রয়োজন হয় এবং তোমরা বাস্তবিকই অভাব বোধ কর তাহ'লে এঁদের মধ্যে একজন এসে এর কর্ণধার হবে।"

* * *

নারায়ণদা—আপনার কাছে শুনেছি, ···জাতি নাকি একদিন আসবে? কোকিলামুখ মঠের গৈরিক পতাকায় আকৃষ্ট হ'য়ে তারা মঠের প্রাঙ্গণে ·····করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হ্যাঁ, আমি দেখেছি। মঠের ভবিষ্যৎ চিত্র একদিন হঠাৎ আমার সামনে প্রতিভাত হয়েছিল।·····তারাই একদিন মঠের ভার নেবে।

দুই বৎসর পূর্ব্বে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও শ্রীশ্রীঠাকুরকে পুনরায় কর্ম্মভার গ্রহণ করিতে হয় ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যে সমস্ত কারণ পুনরায় কর্ম্মভারগ্রহণের হেতু হইয়া দাঁড়ায় তন্মধ্যে (১) জন্মভূমিতে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, (২) শ্রীনিগমানন্দ সারস্বত মন্দির নামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, (৩) শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রকট অবস্থায় মঠের ভাবী অধিগণের যথাযথ কর্ত্তব্য করিতে সঙ্কোচবোধ এবং (৪) মঠাধ্যক্ষ নির্ব্বাণানন্দ স্বামীর কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অকস্মাৎ অবসর গ্রহণই সর্ব্বপ্রধান।

(১) এবং (২) নং কার্য্যে অন্যূন ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসীশিষ্যদের মধ্যে একটা নৈরাশ্যের ভাব দেখা দিল। কারণ সন্ন্যাসীগণ ব্রহ্মচর্য্যবিদ্যালয়গুলি অর্থাভাবে পরিচালনা করিতে অত্যন্ত বেগ পাইতেছিলেন, এমনকি উহার গঠনকার্য্য অর্থাভাবে এরূপভাবে ব্যাহত হইতেছিল যে মঠ যেরূপভাবে কর্ম্মের প্রসার করিয়া ফেলিয়াছে তদনুরূপ আয় আদৌ ছিল না। অর্থাভাবে ঐ বিদ্যালয়গুলি উঠাইয়া দিবার প্রস্তাবও হইয়াছিল, কিন্তু ঐ বিদ্যালয়গুলিই মঠের বিশেষত্ব বলিয়া ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। যখন তাঁহারা দেখিলেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর মঠের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্যক্ অবগত থাকিয়াও ঋষিবিদ্যালয়ে এক পয়সাও দিলেন না, তখন নিশ্চয়ই তিনি মঠের ভবিষ্যৎ ও ঋষিবিদ্যালয়ের উপকারিতায় বিশেষ সন্দিহান বলিয়া তাঁহাদের মনে হইল। নতুবা গৃহীদের সহিত উদ্যোক্তা হইয়া তাহাদের মতে পোষকতা করিতে এত অর্থদান করিলেন, আর এই অতি দরিদ্র মঠ, শাখা আশ্রমগুলি এবং ঋষিবিদ্যালয়গুলি যখন তাঁহার সহানুভূতি হারাইল তখন তাঁহারাই বা কি প্রকারে ইহাতে বিশ্বাসী হইবেন ও ইহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবেন?

ত্যাগী ও গৃহী বিপরীতধর্ম্মী—১৩৩৬ সালের ভক্তসম্মিলনীর বগুড়া অধিবেশনে এইরূপ একটী মত বেশ পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইল, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং ভক্তসম্মিলনীতে উপস্থিত থাকায় উহার প্রকাশ্য উদ্গীরণ বিশেষ কিছু হইল না। তিনি তাহাদের মনের গ্লানি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে একজন কৌপীনমাত্রৈকসম্বল সন্ন্যাসী পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া শূন্য হস্তে এই বিরাট প্রতিষ্ঠান খাড়া করিয়া সন্ন্যাসীদের হাতে তুলিয়া দিয়া দূর হইতে লক্ষ্য করিতেছেন যে সন্ন্যাসীগণ আত্মশক্তিবলে—সাধুতা—গুরুনিষ্ঠা—ভগবৎ-প্রেরণাবলে উহা জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে কি-না! তিনি টাকাকড়ি কিছু লইয়া আসেন নাই। সন্ন্যাসীগণ ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া উদরপূর্ত্তি করিয়া ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরশীল হইয়া সব নীরবে সহ্য করিবে। তাহাদের আকাশবৃত্তি মাত্র অবলম্বনীয়। তাহাদের এই ভাব দেখিয়া কেহ যোগ দেয় দিবে, না দেয় না দিবে। এই তাহাদের পন্থা। আর যাহারা ঐ ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত না হইবে—তাহাদের জন্যও একটি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। এমন অনেক গৃহী আছে যাহারা আধুনিক প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রাচীন সভ্যতার যোগ রাখিয়া তাহার ভিতর দিয়া গমন করিতে চাহে। তাহাদের জন্যই সারস্বত মন্দির। সবাই যে ত্যাগের আদর্শ লইয়া আশ্রমে বাস করিবে এরূপ কখনও হইতে পারে না। সুতরাং ত্যাগমুখীগণ আশ্রমের পন্থানুসরণ করিবে, আর ভোগ-মুখীগণ সারস্বত মন্দিরের ভিতর দিয়া গতানুগতিক পন্থায় সহজে কিছু অধ্যাত্মসম্পদের অধিকারী হইবে। অর্থ দুনিয়াদারীর ছাড়পত্র—ঐ অর্থে সন্ন্যাসীর কোন কাজ হইবে না।

উপরোক্ত উপদেশ দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ন্যাসীদিগকে বুঝাইলেন যে সন্ন্যাসী ও গৃহী সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মী। ত্যাগ ও সংযমের উপর ভিত্তি করিয়া সন্ন্যাসীগণ মঠ চালাইতে সক্ষম কি-না—তাহা তিনি দেখিতে

চান। তাহারা আশ্রম প্রভৃতিতে অর্থসাহায্য পাইবেন না। নিশ্চেষ্ট বসিয়া বিনা ক্লেশে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর আহার জুটিবে না। কিন্তু সন্ন্যাসীগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না; বরং তাঁহাদের মনোভাব শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে সাময়িক ভাবে চাপা থাকিল। অতঃপর প্রায় এক বৎসর এইরূপ ভাবে চলিল। একদা হাওড়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে মঠাধ্যক্ষ নির্ব্বাণানন্দ স্বামীর পত্র পাইলেন। মঠের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার সংবাদ সহ তাঁহার অতি ক্ষুদ্র পত্রখানি পাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর মর্ম্মাহত হইলেন। ১১টা হইতে ৩॥টা পর্য্যন্ত নির্ব্বাণানন্দের বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ও মঠের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বলিতে থাকিলেন, তন্মধ্যে প্রকাশ্য যৎকিঞ্চিৎ নিম্নে প্রকাশ করা হইল।

"* * * নির্ভরতা খুব বড় সাধনা—উহার অধিকারীও বিরল। আর দিন কয়েক অপেক্ষা করিলেই পারিত * * * বড় ভুল করিয়াছে। আমাকে বলিয়া, আমার অনুমতি লইয়া, আমাকে ভাবিয়া চিন্তিয়া মঠের ব্যবস্থা করিবার যদি সময় দিত তবে তাহার মঙ্গল হইত। আমিও সানন্দে তাহাকে অনুমতি দিতাম। * * * যদি আর কিছু দিন অপেক্ষা করিত তবে দেখিত কি শক্তিতে সে শক্তিমান হইয়া উঠে। মনে করেছিলাম শুধু তাহাকে নয়—যাহাকে যাহা দিবার সেই সব অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে আমি এতদিন যে অসীম শক্তি ধরিয়া রাখিয়াছি—তাহা সেই শেষদিন ভাগ বাটরা ক'রে দিয়ে—ভাণ্ডার শূন্য ক'রে দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে যাব।—সেই দিনের অপেক্ষা সইল না!"

* * *

অন্যান্য দিনের ন্যায় যেদিন নির্ব্বাণানন্দের পত্র পাইলেন—সেদিনও শ্রীশ্রীঠাকুরের **life note** লইবার দিন স্থির ছিল—কিন্তু উপরোক্ত কারণে দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার জীবনের বহু ঘটনা অপ্রকাশিত রহিয়া গেল। তিনি কলিকাতা হইতে অগ্রহায়ণ মাসে মঠাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মঠে গিয়া দেখিলেন যে মঠে গৈরিক পতাকা আর উড়ে না—বন্য লতাপাতা ও আগাছা সকল নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। তবে এখানে পূর্ব্বে যে একটা সাধুর আস্তানা ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। মঠে যে-সব ব্রহ্মচারী তখনও বাস করিতেছে তাহাদের মুখগুলি প্রীতিপ্রফুল্ল নয়। যাহারা তখনও আছে, তাহারা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। পূর্ব্বে মঠ মুদ্রাযন্ত্রের ঘর্ঘর শব্দে মুখর ছিল, এখন আর সে-সব শব্দের বালাই নাই। মুদ্রাযন্ত্র যোরহাটে স্থানান্তরিত। মঠের মুখপত্র আর্য্যদর্পণ ২।৩ মাস পরে প্রকাশিত হয়। বাহিরের কার্য্য সমাধা করিয়া যখন সময় হয় তখন ঐ পত্রিকা মুদ্রিত হয় ও ইহা গৌণ কার্য্য বলিয়াই গণ্য হয়। তাঁত চলে না, ঋষিবিদ্যালয়ে ক্লাস বসে না, কৃষিক্ষেত্রে কেহ কাজ করে না, মঠের বাৎসরিক হিসাবপত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—অনেক কাগজপত্র উইয়ে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। মঠের অবস্থা দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যথিত হইলেন। তিনি কিছুদিন মঠে থাকিয়া অন্তেবাসী ব্রহ্মচারীগণকে উপদেশ দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। তাহারাও পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক মঠের কাজে আত্মনিয়োগ করিল।

মহিলা সভা—অতঃপর পৌষের প্রথম সপ্তাহে শ্রীশ্রীঠাকুর ময়নামতী আশ্রমে যাত্রা করেন তথাকার ভক্তসম্মিলনীতে যোগদানের জন্য। ১৩৩৭ সালের এই অধিবেশনে ভক্তশিষ্যের ইচ্ছায় তাঁহাকে পুনরায় মঠের ভার গ্রহণ করিতে হয়। ভক্তসম্মিলনীর এই অধিবেশনেই মহিলা সভার সর্ব্বপ্রথম অধিবেশন হয়। এই মহিলা সভায় ২৫০ জন মহিলা ভক্ত যোগদান করেন। ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে এত অধিক সংখ্যক মহিলার যোগদান এবং ধর্ম্মজগতে তাঁহাদের অবস্থার আলোচনা শুধু ভারতের ইতিহাসে নহে, জগতের ইতিহাসেও বোধ হয় ইহাই সর্ব্বপ্রথম।

সম্মিলনী অন্তে শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি স্থান ঘুরিয়া শিবরাত্রির পর পুরীধামে ফিরিয়া আসিলেন।

* * *

১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাসে যোড়হাটে মঠের প্রেস লইয়া বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইল। মঠান্তেবাসীরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে সব কিছু জানাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রজ্ঞানন্দ স্বামীকে লইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসে মঠে আসিলেন এবং প্রজ্ঞানন্দজীর উপর সমস্যা সমাধানের ভার অর্পণ করিলেন।

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ কুমার ব্রহ্মচারী নহেন। সংসারের অভিজ্ঞতা তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমে যাহা সঞ্চিত ছিল তাহার পরিচালনায় তিনি কৌশলে অনেক কার্য্য উদ্ধার করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মঠে যাওয়ার পর হইতে কয়েক দিনের মধ্যেই অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়া গেল। সমস্ত যোড়হাটসহরবাসী বেশ বুঝিতে পারিল যে মঠের আভ্যন্তরীণ গোলমালটা ঘরোয়া দ্বন্দ্ব নহে।

* * *

অনন্তর কয়েকদিন পরে নির্ব্বাণানন্দ স্বামী শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জানুর উপর নিতান্ত শিশুর ন্যায় মস্তকটী রাখিয়া তাঁহারই মুখের দিকে নিমেষহীন নেত্রে ৫।৭ মিনিট তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার নিমেষহীন নেত্রের ভিতর দিয়া তাঁহার মন কি ভিক্ষা চাহিল কে জানে, গড়্‌গড়ার নলটি শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতেই রহিল। নির্ব্বাণানন্দ যখন এরূপভাবে তাঁহার দিকে তাকাইলেন —শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন যে তখন তাঁহার শ্বাস রোধ হইয়া আসিয়াছিল। তিনি মুখ ফিরাইলেন। তখন নির্ব্বাণানন্দ গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! তুমি কি সেই ঠাকুর যাঁকে আমি ১৪ বৎসর বয়সে এসে দেখেছিলাম?"

শ্রীশ্রীঠাকুর। নিশ্চয়। ঠিক সেই ঠাকুর—তবে বাহিরের কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে—ভিতরে সেই।

* * *

হ্যাঁ, ট্রাষ্টিরাই আমাকে অনুরোধ করেছে যে শিষ্যদের ভেতর গোলমাল সব আমিই মেটাব। আর তাদের প্রকৃত কাজ আরম্ভ হবে আমার দেহত্যাগের পর হ'তে। আমি বর্ত্তমান থাকতে তারা কোন সিদ্ধান্ত করতে শঙ্কা বোধ করে।

নির্ব্বাণানন্দ। "তোমাকে ছাড়া হোয়ে আমার সমস্ত শক্তি যেন অন্তর্হিত হয়ে গেছে—আমি কিছু চিন্তা কর্ত্তে পারি না—আমি লিখ্‌বার শক্তিও হারিয়েছি। এখন মনে হ'চ্ছে তোমার শক্তিতেই আমি শক্তিমান ছিলাম। আমি বেশ দেখছি, আমার হৃদয়ে তুমি তোমার স্থান জুড়ে বসে রয়েছ। আমার আর কর্ম্মীর জীবন ভাল লাগে না। তোমাকেও আর কর্ম্মীরূপে দেখতে চাই না। আশীর্ব্বাদ কর যেন প্রাণে প্রাণে তোমাকে অনুভব করিতে পারি ও শেষ পর্য্যন্ত তোমার চরণে মতি থাকে।" এই ব'লে ধীর পদক্ষেপে বিদায় হইলেন। মকদ্দমা সম্বন্ধে একটী কথাও বলিলেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর ভিতরে ভিতরে অনেক চেষ্টা করিলেন যে তাহার সহিত আর দুই-একটী কথা বলেন, কিন্তু তাহা পারিলেন কৈ? তিনি নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। নির্ব্বাণানন্দের শৈশব হইতে বর্ত্তমান চিত্রগুলি চলচ্চিত্রের মত মুহূর্ত্তে ভাসিয়া উঠিয়া তাঁহাকে ভাবস্তম্ভিত করিয়া ফেলিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ছিল যে নির্ব্বাণানন্দ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঈপ্সিত সাক্ষাতের মূল এই যে, তিনি যে ত্রুটি করিয়াছেন ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না,—করিবেনই বা কেন? কোন বিরাগী পুত্র কি তাহার পিতার নিকট ফিরিয়া আসিয়া ত্রুটী স্বীকার করিয়া থাকে? আর কোন্

পিতাই বা তাহার নিকট সেই বাহ্য বৈখরী উক্তি প্রত্যাশা করে? নির্ব্বাণানন্দ জানিতেন যে তাঁহার পিতার দুর্ব্বলতা কোথায়? তাই তিনি আসিয়া দেখা দিয়া চলিয়া গেলেন—তাঁহার স্মৃতি জাগাইয়া।

কয়েক দিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুর মঠ হইতে পুরী রওনা হইলেন। পুরী আসিয়া মঠের তৎকালীন অধ্যক্ষকে মকদ্দমা উঠাইয়া লইতে আদেশ দিলেন।

* * *

অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুর কর্ম্মক্লান্ত অবসর জীবনে নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতে থাকিলেন। পুনঃ পুনঃ ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইতে থাকিলেন। বিশেষতঃ যখন তমলুকে শ্রীযুক্ত ভীমাচরণ বসু উকিল মহাশয়ে বাটীতে তাঁহার দেহত্যাগ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল তখন শিষ্যভক্তের মনে একটা দারুণ দুঃখের ছায়া পতিত হইয়াছিল। তারপর বাতে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া আসিতে লাগিল—হার্ট ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া আসিতে লাগিল। শীঘ্রই যে তাঁহার স্থূলদেহ খসিয়া পড়িবে এইরূপ আশঙ্কায় ফণীবাবু প্রভৃতি অন্তরঙ্গ শিষ্য-ভক্তগণ ব্যাকুল হইয়া উঠিবার ফলে মধ্যপ্রদেশের বস্তারের মহারাজা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ভঞ্জদেও-এর একান্তাগ্রহাতিশয্যে শ্রীশ্রীঠাকুরকে একবার দার্জ্জিলিংএ একবার শিলঙএ পাঠান হইয়াছিল; তাঁহার সেবার যাহাতে ত্রুটি না হয় তজ্জন্য পুরীর আশ্রমের সেবকদিগকে তাঁহার সঙ্গে পাঠান হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের তিন মাস ব্যাপী অবচেতন অবস্থা—দার্জ্জিলিংএ কিছু দিন অবস্থানের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের আর একপ্রকার ভাব উপস্থিত হইল। তাঁহার ভিতরটা ক্রমেই প্রসারিত হইয়া চলিতেছিল বলিয়া সব মায়িক বৃত্তিগুলিও খসিয়া পড়িতেছিল। এই সময় হইতে তিনি প্রায়ই অবচেতন অবস্থায় থাকিতেন। তাঁহার মানসিক অবস্থা সব সময় যে এই অবস্থায় থাকিত তাহা তাঁহার সেবকগণ ও অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্তগণও লক্ষ্য

করেন নাই—তিনি নিজেও কিছু বলেন নাই। তাঁহার এই অবচেতন অবস্থার কথা হয়ত আমাকে ও মতিদাকেই সর্ব্বপ্রথম বলিয়াছিলেন। তাঁহার দেহটা ঠিক ঘড়ির কাঁটার ন্যায়, যখন যে কার্য্য করিতে হইত তাহাই করিয়া যাইত। ঐ অবস্থায় তিনি ব্যবহারিক ভাবে অনেক কথাই বলিতেন ও কাজ করিতেন বলিয়া কেহই তাঁহার এই নূতন অবস্থা ধরিতে পারে নাই। সে সব কাজ করিতেন তাহা যেন অভ্যাসবশে হইয়া যাইত। সেবকেরা তাঁহাকে স্নান করাইয়া আনিল—তিনি পা উঁচু করিয়া বলিলেন "চশমা"। যে না জানিত সে চশমা আনিল কিন্তু প্রকৃত সেবক পাদুকা লইয়া আসিত। হয়ত লোকের সহিত আলাপ করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার তদ্বিষয়ে কোন খেয়ালই নাই। দার্জ্জিলিংএ অবস্থানকালে তাঁহার এইরূপ ভাব একাদিক্রমে ৩ মাস কাল স্থায়ী ছিল বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে নোট দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গুণময় স্থূল খোলসের ভিতর থাকিলেও মনের মায়িক নিম্ন বৃত্তিগুলি যেন ক্রমশঃ খসিয়া পড়িতেছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বালকস্থলভ সরলতা—মায়িক বৃত্তির অভাব হইলেও কোমল বৃত্তির অভাব কোনদিনই তাঁহাতে লক্ষিত হয় নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরকে কোন কোন সুন্দর শিশুকে চুম্বন করিতে দেখিয়াছি। চিরসুন্দরের কিঞ্চিন্মাত্র আভাসও কাহারও ভিতর ফুটিয়া উঠিলে, নিরুপাধিকভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও শ্রীশ্রীঠাকুর উহা হইতে নামিয়া আসিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত সরল ছিলেন। সরলতা কোমলতার নামান্তর মাত্র। একদা শ্রীশ্রীঠাকুর ক্ষেপাদার বাড়ীতে গিয়া নির্জ্জন প্রকোষ্ঠের ভিতর একটী শিশুকে পাইয়া বলিলেন —"ওরে ঘোড়া ঘোড়া খেল্‌তে জানিস্।" সে বলিল—"জানি, তুমি চড়বে"। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"চড়্‌বো"। সে ঘোড়া হইল, শ্রীশ্রীঠাকুর অন্যের অলক্ষ্যে নিজের বিরাট শরীরের ভার নিজের উপর রাখিয়া তাহার

পিঠে উঠিলেন। পরে তিনি নামিয়া গেলে শিশুটি শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধরিয়া বলিল—"এবার তুমি ঘোড়া হও—আমি চড়বো।" শিশু ত ইহা বলিতেই পারে। তিনি ভাবিলেন—তাই তো! যে অধিকারে আমি তাহার পৃষ্ঠে চড়িয়াছি, সেও সেই অধিকারে আমার পৃষ্ঠে চড়িবার দাবী করিতে পারে। অগত্যা শ্রীশ্রীঠাকুর চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন যে কেহ কোথাও নাই। তিনি ঘোড়া হইলেন—শিশুটি লাফ দিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে চড়িল। এদিকে এ দৃশ্যটি ক্ষেপাদার স্ত্রীর নজরে আসায় তিনি ভয়ানক সোরগোল করিয়া শিশুটীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন ও আশু অমঙ্গলের আশঙ্কায় শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিলেন।

১৩৩৮ সালের ভক্ত-সম্মিলনীতেও তিনি ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন—"ওরে, তোরা আমাকে কোলে কর।" সেই বিরাটবপু বৃদ্ধশিশুটীকে কোলে করা অসম্ভব বোধে ভক্তগণ তাঁহাকে চৌকিতে বসাইয়া মাথায় করিয়া লইল। এই সব ক্ষুদ্র বিষয়েও আমরা তাঁহার সরলতার বহু পরিচয় পাইয়াছি বলিয়া তাহা বর্ণনা করিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিনিময়ে বিশ্বাসী—পূর্ব্ববর্ণিত এই ঘোড়া ঘোড়া খেলা লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন—"উহা বিনিময়। আমি তাহাকে ঘোড়া করিয়া চড়িয়াছি, সুতরাং সেও বিনিময়ে আমাকে ঘোড়া করিয়া চড়িতে পারে।" এই বিনিময় লইয়া তিনি অনেক কিছুই অনেক সময়ে আমাদিগকে বলিয়াছেন।

সুতরাং বিনিময়ের ভাব তাঁহার অন্তরে বড়ই প্রবল ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন,—"তোমরা আমাকে হাওয়া করিতেছ, আমার পা টিপিতেছ, আমারও ইহার বিনিময়ে কিছু করিতে হইবে। এ জগতে কিছুই বৃথা যাইবে না। অর্থাৎ কাজ করিলে তবে তাহার ফল হইবে। কর্ম্মের সহিত ফলের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।"

বিনিময়ের ভাব যদি তাঁহার ভিতর প্রবল হয় তবে কি শ্রীশ্রীঠাকুর কৃপাবাদ স্বীকার করেন না? তিনি কৃপার পাত্রাপাত্র ভেদ স্বীকার করিতে চান। তাঁহার মতে সাধারণতঃ এলোমেলো কৃপা হয় না—কৃপা সমস্তই সব সময় সুশৃঙ্খলভাবে হয়। যেসব পাত্রের কৃপা আকর্ষণের ক্ষমতা আছে তাহাদের উপরই কৃপা বর্ষিত হয়—অর্থাৎ প্রত্যেকেরই মূলধন কিছু থাকা চাই। সুকৃতি সঞ্চয় যাহার নাই তাহার উপর কি প্রকারে কৃপা বর্ষিতে পারে? মোটের উপর বিনিময়ে কিছু দিতে হইবে, তবেই কৃপা হইতে পারে। "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্" —কৃপাবাদের এই মূলমন্ত্রের পিছনেও কিছু অদৃষ্ট কর্ম্ম সঞ্চয় আছে বুঝিতে হইবে, ইহাই তাঁহার মত। হিতোপদেশকার বিষ্ণুশর্ম্মার কথা, "শুক পক্ষী ব্যতীত বককে শত চেষ্টায়ও কথা বলান যাইতে পারে না।" শ্রীশ্রীঠাকুর এই মতে মত দিয়াছেন, কারণ কৃপা অপাত্রে বর্ষিত হইলে উহা ফলপ্রসূ হয় না; তাঁহার মতে কৃপা অর্থে যদি "অনুকম্পা"* বুঝায় —যদি অধ্যাত্মভাবে কাহাকেও ভাবিত করিয়া তোলা হয় তবে সেখানেও এই বিনিময়। ভালবাসার ভিতর দিয়া ভাবের আদান-প্রদান হয়। সাধনা করিয়া বড় কেহ রাতারাতি সেরূপ কিছুর অধিকারী হইতে পারে না—যেরূপ ভালবাসা, বিশ্বাস ও ব্যাকুলতার ভিতর দিয়া আদায় হইয়া যায়। এই বিশ্বাস, ভালবাসা ও ব্যাকুলতা কোন সাধনা নহে। উহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত জিনিষ। উহার ফলে ভগবানের যে সাড়া মিলে সেটাই যথার্থ কৃপা—ঐরূপ কৃপাই যথার্থ ভাবভূমির ক্রিয়া—উহা সাধারণ নিয়ম-বহির্ভূত ভগবদ্বিভূতি মাত্র।

---

* মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥—গীতা

যোগসাধনাকালে যে সমস্ত ধৌতি* ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল, সিদ্ধিলাভের পর ঐ অভ্যাস ত্যাগ করায় শ্রীশ্রীঠাকুর শেষ জীবনে বিশেষ শ্বাসকষ্ট পাইয়াছেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্টও বেশী হইতে লাগিল এবং বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করায় মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইতে থাকিলেন ; হার্টও ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া আসিল—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কার্য্যও ফুরাইয়া আসিল। ট্রাষ্টডিড্ বা অর্পণনামা সম্পাদনের ভার হাওড়ার উকিল হেমদার উপর অনেক পূর্ব্বেই ন্যস্ত থাকায় শিষ্যভক্ত সকলকে বুঝিতে দিয়াছিলেন যে তাঁহার ইহ-জাগতিক কাজ সব ফুরাইয়া আসিয়াছে ; অতঃপর তাঁহার জীবন-সন্ধ্যায় অন্তিম বিদায় দানের জন্য সবাইকে প্রস্তুত হইতে হইবে। বাহিরের কোন কাজ হাতে না থাকায় মন ভিতরে সমাহিত হইতে থাকিল। ইহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্য-ভক্তের মনে একটা দারুণ আশঙ্কা হইতে থাকিল। তখন কুতবপুরে একটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা তাঁহার সম্মুখে উপস্থাপিত করায় শ্রীশ্রীঠাকুর উহা অনুমোদন করিলেন। সুতরাং যাঁহাদের স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ হয়, বাহ্যিক কাজ হাতে আসায় তাঁহাদের দেহত্যাগের সময় পিছাইয়া যায়। সাময়িকভাবে ভক্তগণ একটা নিশ্চিত আতঙ্ক হইতে রক্ষা পাইল এবং দেহত্যাগের কথা ভুলিয়া গেল। তাঁহার হাতে গড়া সাধের বিরাট প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর কোথায় পালাইবেন ? ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীঠাকুর এত ভক্ত রাখিয়া এত শীঘ্র কোথায় লুকাইবেন ? সুতরাং তিনি পূর্ব্বে যেরূপ বৎসরে একবার বঙ্গের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন ঐরূপই করিতে থাকার ফলে মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে থাকিলেন। অতঃপর জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরকে

*ধৌতি প্রকরণ প্রথম ভাগে দ্রষ্টব্য।

ভারত ভ্রমণে অনুরোধ করিতে থাকায় তিনি সন্ন্যাসী হইয়া যে সকল দেশ পূর্ব্বে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন—এইক্ষণে **All India Excursion Train**-এ কতিপয় ভক্তসঙ্গে সেই সকল দেশভ্রমণে যাত্রা করিলেন। ভারত-ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর কয়েকদিনের মধ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুর দারুণ বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলেন ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার রোগশয্যাপার্শ্বে যখনই আমরা গিয়া দাঁড়াইতাম—নিজেই গায়ের কাপড় উঁচু করিয়া দেখাইয়া যেন কত শান্তি পাইতেন। তদবস্থায় একদা আলিপুরদুয়ারের জনৈক ভক্তের উগ্র চিন্তা কিভাবে তাঁহাতে প্রতিফলিত হইয়াছিল—তাহা বলিলেন "আজ দুপুরে শয্যার উপরে ব'সে আছি—সম্মুখে ঐ বড় আয়নার উপর দৃষ্টি পড়িল—দেখি অর্দ্ধেক দেহ আমার, আর অর্দ্ধেক দেহ আলিপুরদুয়ারের শিবদয়াল পালের।" আর কিছু বলিলেন না। সচরাচর অতীন্দ্রিয় কিছুই বলিতেন না। ***

প্রায় দুই মাস পরে শ্রীশ্রীঠাকুর রোগ হইতে সম্পূর্ণ নিরাময় হইলেন বটে, কিন্তু তবুও তাঁহাকে কর্ম্মক্লান্ত অসুস্থ দেহটাকে টানিয়া লইয়া বেড়াইতে হইত। মঠে পুনরায় শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে বৎসরে একবার তথায় অবশ্যই যাইতে হইত। অসুস্থ শরীরে কাসির সঙ্গে মস্তিষ্কে আঘাত লাগায় খুব কষ্ট পাইতেন, এমন কি হাঁপানীতে শ্বাসরোধ হইয়া আসিত। মস্তিষ্কে একটু আঘাত লাগিলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের আমিত্ববোধ এতটা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত যে ঐ ব্যাপ্তিবোধ সঙ্কুচিত করিয়া আনিতে যথেষ্ট বেগ পাইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন,—"যখন ছড়িয়ে পড়ি, তখন মাঝের ব্যবধান থাকে না—সব একাকার। * * * এভাবে হয়ত একদিন আর গুটিয়ে আনা সম্ভব হবে না। মঠেই আমার দেহ রাখলে ভাল ছিল। তাহ'লে নীরবে স্বেচ্ছামত দেহ ছেড়ে চ'লে যেতাম। তা কি আর হবে? * * * আমার অন্তরঙ্গ ভক্তেরা বলে—'ঠাকুর! তোমার হঠাৎ দেহত্যাগটা আমরা সহ্য করতে পারব না' এটা

আমিও কিন্তু বেশ বুঝি—উপলব্ধি করি। কেননা সেবা-শুশ্রূষা ক'রে বিদায় দিতে পারলে অনেকটা তৃপ্তি আসে।"*

জীবজগতের কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এই নিষ্কাম কর্ম্মের বোঝা ঘাড়ে লইয়াছিলেন। জীবজগতের কল্যাণ যাহাতে হয়, জগদ্গুরুর সেই অতীন্দ্রিয় ইঙ্গিত কোন কোন মহাপুরুষ বুঝিতে সক্ষম হন। জগদ্গুরুর মঙ্গল ইচ্ছা শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশুদ্ধ অন্তরে লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। মঠাশ্রমের মাধ্যমে সেই মঙ্গল ইচ্ছারই প্রকাশ। মঠাশ্রমের মাধ্যমে নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া যাহাতে আমাদের চিত্তশুদ্ধি হয়, এইজন্যই তিনি মঠাশ্রম গড়িয়া গেলেন। নচেৎ প্রকৃতপক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের কোন কিছুই কাজ নাই। সুতরাং সেই সমস্ত মঠাশ্রমের মাধ্যমে নিষ্কাম কর্ম্মযোগে যদি আমাদের চিত্তশুদ্ধি না আসে, তবে আমাদের নিতান্ত দুরদৃষ্ট। এরূপ সর্ব্ববিধ সাধনসম্পন্ন মহাপুরুষের কৃপালাভ করিয়া এবং সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমরা নিজেদের চিত্তমালিন্যদোষে কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে পারিলাম না। চিত্তশুদ্ধি হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহা অন্তরে অনুভব করিবে। তাই অসুস্থ দেহ লইয়াও মঠে, আশ্রমে, গৃহস্থের বাড়ীতে পদার্পণ করিতে কোনদিনই তিনি ত্রুটী করেন নাই, তাহাতেও যদি আমরা তাঁহার ভাবধারার অনুসরণ করিয়া জীবজগতের কল্যাণে দেহ-মন-প্রাণ নিয়োজিত করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অবর্ত্তমানে মঠাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কিরূপভাবে পরিচালিত হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য ট্রাষ্টডিড্ করিয়া গেলেন। ১৩৩৪ সালে মঠের ভক্তসম্মিলনীর অধিবেশনকালে ট্রাষ্টডিডের মর্ম্মার্থ ভক্তশিষ্যসমাজে পঠিত হইল, এবং তাহাদের নিকট হইতে মতামত জানিয়া লইলেন। কিন্তু তদনুসারে তখন কোন কার্য্য হয় নাই।

 * শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-উপদেশামৃত।

ট্রাষ্টীদের অনুরোধে শ্রীশ্রীঠাকুরই কাজ চালাইয়া গিয়াছিলেন। ১৩৩৮ সালে হালিসহর ট্রাষ্টসভায় দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীশ্রীঠাকুর ট্রাষ্টীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"শরীর দিন দিনই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ছে। এ শরীর দিয়ে আর কুলিয়ে উঠছে না। তোমরা আমাকে নিষ্কৃতি দাও। আমার কর্ম্মের বোঝা তোমরা মাথায় তুলে নিয়ে আমায় নিশ্চিন্ত কর। আমি ঠাকুর হ'য়েই থাকি, আমি গুরুরূপেই তোমাদের মাঝে প্রকাশিত হই। কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট এর মাঝখানে প'ড়ে ভাবের ব্যত্যয় না ঘটায়। তোমরা যে কয়জন সন্ন্যাসী ট্রাষ্টী আছ, তাদের মধ্যেই এক জন আমার কার্য্যের গুরুভার গ্রহণ কর। আর তাকেই তোমরা আমার প্রতিনিধি স্বরূপে মেনে নাও।"

অতঃপর স' সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী ট্রাষ্টসভার সহকারী সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিনিধি-স্বরূপে আগামী বর্ষের কার্য্যাদি পরিচালনা করিবেন। ১৩৩৯ সালের খড়কুসমা আশ্রমে ভক্তসম্মিলনীর অধিবেশনে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুপস্থিতিতে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপে যাবতীয় কার্য্য দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন। ১৩৪০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যারতি ও কীর্ত্তন-স্তোত্রের পর মঠের শ্রীশ্রীগুরুব্রহ্ম আসনমন্দিরের দরজা উন্মুক্ত করাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামী প্রজ্ঞানন্দের গলে পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিয়া গুরুপ্রদত্ত লাঠি তাঁহাকে অর্পণ করিয়া বলিলেন— "প্রতিনিধিকে গুরুর ব্যবহারী ও হাতের কোন বস্তু দান করতে হয়। সেজন্য আমার হাতের লাঠিটা তোমায় দিলাম।" পরে ১টী নারিকেল তাঁহাকে দিয়া বলিলেন—"এই নাও সুফল!" এইরূপে তাঁহাকে অভিষেক করিয়া তিনি তাঁহার উপস্থিতিতে সমস্ত সেবক শিষ্য-ভক্তগণকে তাঁহার পাদস্পর্শ করতঃ প্রণাম করাইয়া তাঁহার প্রাধান্য ও আনুগত্য স্বীকার করাইলেন। ১৩৪০ সালের ভক্তসম্মিলনীর জলপাইগুড়ি

অধিবেশনের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর মঠাশ্রমের যাবতীয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং স্বামী প্রজ্ঞানন্দের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিলেন। স্বামীজী শপথগ্রহণপূর্ব্বক সভাপতির পদ ও সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। ট্রাষ্টীগণও শপথগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন। অতঃপর "জয়গুরু" ধ্বনিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গল ইচ্ছার অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া উক্ত সভা স্বামী প্রজ্ঞানন্দজীকে সর্ব্বাধ্যক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উক্ত সম্মিলনীতে সমবেত শিষ্য-ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আজ হ'তে তোমরা প্রজ্ঞানন্দের আদেশ-উপদেশমত চলবে। প্রজ্ঞানন্দের বাক্যই আমার বাক্য বলে গ্রহণ করবে। সভা, সমিতি, সঙ্ঘ, মঠ, গুরুধাম এবং আশ্রমাদির যাবতীয় কার্য্য সে ত পরিচালনা করবেই—এ ছাড়া সাধনভজন সম্বন্ধেও সে আমার স্থলে উপদেশাদি দিতে পারবে। তবে গুরুগিরি এখনও দেই নাই। গুরুগিরি ভিন্ন মোহন্তপদ উহাকে দিলাম, তবে শিক্ষাগুরুর কাজ সে এখন হ'তেই করতে থাকবে" ইত্যাদি।

আসাম মঠে শেষবারের মত একবার শিষ্যভক্ত লইয়া আনন্দ করিবেন এইরূপ একটা ইচ্ছা শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকদিন হইতে মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন। তজ্জন্য ১৩৪১ সালের ভক্তসম্মিলনীর অধিবেশন মঠেই আহূত হইল। অতঃপর ক্রমে ক্রমে ১৩৪১ সালের ভক্তসম্মিলনীর সময় আসিয়া পড়িল। শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্ব হইতেই মঠে অবস্থিতি করিতেছিলেন। একদিন সান্ধ্যকীর্ত্তনের পর আসনঘরের বারান্দায় শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়া বসিলেন। তৎপর যথাক্রমে প্রণামাদি আরম্ভ হইল। প্রথমে সন্ন্যাসীগণ, তৎপর ব্রহ্মচারীগণ, তৎপর গৃহী শিষ্যভক্তগণ প্রণাম করিলেন। পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতে আরম্ভ করিলেন—"ছাখো! আমি ত বৃদ্ধ হয়েছি, আমি আর কতকাল মঠাশ্রম চালাব? তোমরাই ইহার ভার নেও। আমি জীবিত থাকতে থাকতেই তোমাদের কাজ কর্ম্ম সব বুঝে নেওয়া

উচিত। ধর, আমি মরিয়াই গিয়াছি। আমার মৃত্যু হ'লে তোমরা ত খুব মজা করে লুচি সন্দেশ খাবে।" এই কথা শুনিয়া সমবেত ভক্তবৃন্দের মধ্যে একটী হাসির রোল উঠিল। উপরোক্ত কথা বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার পা দুখানি সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল যে পা হইতে কোমর পর্য্যন্ত সন্ধিস্থানগুলি শক্ত ও অবশ হইয়া গিয়াছ। এই অবস্থা দৃষ্টে প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ ও অন্যান্য ভক্তগণ বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর ধরাধরি করিয়া গৌরাঙ্গ ঘরের মধ্যে তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে শয়ন করাইয়া দেওয়া হইল এবং পূর্ণোদ্যমে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কিছু সময় কীর্ত্তন করিবার পর দেখা গেল, তিনি যেন এ জগত হইতে সরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন। ইহা দেখিয়া প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্পর্শ করিলেন। চিদানন্দ মহারাজ ধমকের সুরে বলিলেন—"আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবে ঠাকুর!" সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "শালারা আমাকে যেতে দিল না রে! যে মৃত্যুদ্বার এতদিন আমার রুদ্ধ ছিল—তা এখন সমস্তই খুলে গিয়েছে—আমি এখন যে কোন মুহূর্ত্তে চলে যেতে পারি"—শ্রীশ্রীঠাকুর আঙ্গুল দিয়া সূর্য্যমণ্ডলের দিকে লক্ষ্য করে বলিতে লাগিলেন, "স্পষ্ট দেখছি, যেন আমি সূর্য্যমণ্ডল ভেদ ক'রে উর্দ্ধদিকে গমন করছি।"

অবশেষে ঐ অবস্থা দেখিয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। সে রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগরাগাদি আর কিছুই হইল না। ওখান হইতে ধরাধরি করিয়া তাঁহার শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দেওয়া হইল।

কয়েকদিন পরেই সম্মিলনীর অধিবেশন আরম্ভ হইল। এইসময় ট্রাষ্টসভারও অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং সভাপতিত্ব না করিয়া স্বামী প্রজ্ঞানন্দকে স্বাধীনভাবে ট্রাষ্টসভার সভাপতিত্ব

করিবার সুযোগ দিয়া ক্রমে ক্রমে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। মঠের ভক্তসম্মিলনীর অধিবেশনের পূর্ব্বদিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া সমবেত শিষ্য ভক্তগণ যে আনন্দের প্রবাহে ভাসিয়াছিল তাহা উপভোগ করা ছাড়া এ সামান্য লেখনীতে প্রকাশ করা অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে শ্রীগৌরাঙ্গকে লইয়া তাঁহার দলদল যে প্রকার কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়াছিল এবারেও শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া দীর্ঘ ৮ মাইল পথ কীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করিতে করিতে বালক বৃদ্ধ যুবা স্ত্রী নির্ব্বিশেষে সকলেই ব্রহ্মপুত্র নদের তীর পর্য্যন্ত গিয়া তথা হইতে অধিক রাত্রে ফিরিয়াছিলেন। শিষ্য-ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে কাষ্ঠনির্ম্মিত ১টি গাড়ীতে বসাইয়া রথের মত টানিতে টানিতে দীর্ঘ পথ অতিবাহন করিয়াছিল। ঐ দিনই শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বিশিষ্ট বিশিষ্ট শিষ্যভক্তকে লইয়া স্বামী নির্ব্বাণানন্দের সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। নির্ব্বাণানন্দের কর্ম্মশক্তি প্রচুর, পাণ্ডিত্যও অগাধ। আর্য্যদর্পণের তিনিই একমাত্র পরিচালক ছিলেন। সুতরাং তাঁহার মঠ ত্যাগ করিবার পর "আর্য্যদর্পণ" পত্রিকা জনসাধারণের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না, এই আশঙ্কায় সুরেনদা, হরপ্রসাদদা প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তের মধ্যে কিছুদিন ধরিয়া কাণাঘুষা চলিতেছিল। এবারের সম্মিলনীর প্রারম্ভেই এই গুঞ্জনটি শ্রীশ্রীঠাকুরের কানে বিশেষভাবে আসায় তিনি ইচ্ছা করিয়াই ইহার মীমাংসা করিবার জন্য সভার একটী বিশেষ অধিবেশন করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন "আচ্ছা, বরদাকে (নির্ব্বাণানন্দ) এনে পুনরায় কর্ম্মভার দিলে কেমন হয়? আর্য্যদর্পণ ত দিন দিন দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ছে। তোমাদের অভিমত কি, নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ কর।"

কৌশলে প্রশ্নটা তিনি ভক্তদের সম্মুখে এমনভাবে উপস্থাপিত করিলেন, যাহাতে তাঁহাদের অভিমতই চূড়ান্তভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর মানিয়া লন। কেহ কেহ এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে বলিতে উদ্যত হইলে ভুবনদা

শ্রীশ্রীঠাকুরের পশ্চাৎদিক হইতে হাত নাড়িয়া এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে কিছু না বলিতে ইঙ্গিত করিলেন। ভুবনদা জানিতেন যে যদি কেহ এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে কিছু বলে তবে একটা মহা অনর্থ সংঘটিত হইবে। ভুবনদার ইঙ্গিত অনুসারে কেহই উহা সমর্থন না করিয়া বরং একবাক্যে বলিলেন—"না, আমরা তাকে চাই না।" তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন,—"আমার জীবিতাবস্থায় সে যদি তার ত্রুটি স্বীকার ক'রে আমার কাছে ফিরে আসে, তবে আমি তাকে সানন্দে গ্রহণ করব। আর সে যদি আমার কাছে ফিরে না আসে তবে আমার মঠাশ্রমের কেউ তার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখতে পারবে না, এটা যেন তোমাদের মনে থাকে। আজ যদি তোমাদের মন্তব্য অন্যপ্রকার হ'ত, যদি তাকে সেধে ডেকে এনে কর্ম্মভার দিতে তোমাদের ইচ্ছা হ'ত তবে আজই আমি দেহত্যাগ করতাম।"

বিপথগামী শিষ্যের দ্বারা অন্য শিষ্যভক্ত যাহাতে পথভ্রষ্ট না হয় তজ্জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি উপদেশ দিলেন, তাহা সংক্ষেপে এইস্থানে প্রদত্ত হইল।

১। শাস্ত্রাদি মন্থন করিয়া অনেক মত পথ আবিষ্কার করা যায়, কিন্তু নিষ্ঠা না থাক্‌লে ঈশ্বর বা সত্য লাভ হয় না।

২। গুরুর স্বরূপ না বুঝিয়া অমানুষরাই মানবগুরুকে জগদ্‌গুরুর প্রতীক বলে। সদ্‌গুরু—জগদ্‌গুরুর প্রতীক নহেন—জগদ্‌গুরু স্বয়ং। আতসী পাথরে কেন্দ্রীকৃত সূর্য্যরশ্মি—সূর্য্যই, কারণ সূর্য্যরশ্মির ভিতর সূর্য্যের উপাদানীভূত বস্তু (Component Parts) বর্ত্তমান। জগদ্‌গুরুর দ্বারা ব্যক্তিগত কাজ তেমন হয় না যেমন কাজ হয় সদ্‌গুরুর দ্বারা। বায়ু সর্ব্বত্র বিদ্যমান কিন্তু গুমটের দিনে পাখার বাতাস ব্যতীত শরীর শীতল হয় না। পাখার যে হাওয়া তৃপ্তি দেয় সে হাওয়া পবনঠাকুর স্বয়ং। পাখার বাতাস বায়ু—বায়ুর প্রতীক নহে।

উপরোক্ত উপদেশের মর্ম্ম "সারকথা" নাম দিয়া 'আর্য্যদর্পণে* প্রকাশ করিতে শ্রীশ্রীঠাকুর আদেশ দিলেন। সম্মিলনী অন্তে শ্রীশ্রীঠাকুর একমাস মঠে অবস্থান করিয়া বেলঘরিয়া, সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রাম হইয়া ফাল্গুন মাসের শেষে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত আকিয়াবে প্রবাসী বাঙালী ভক্তদের আহ্বানে অসুস্থ শরীর লইয়াও তথায় গিয়া ভীথনজীর বাংলোতে ১১ দিন অবস্থান করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ—আকিয়াবে অবস্থানকালে বহুলোক তাঁহার চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ স্থান ত্যাগের প্রাক্কালে নূতন ও পুরাতন সমস্ত ভক্তগণের উদ্দেশ্যে বলিলেন—"আমি একটা নিয়ম করেছি যেখানে তিনজন বা ততোধিক শিষ্যভক্ত হবে সেখানে তোমরা একটা সংঘ করবে। আমার সম্মুখে তোমরা যেমন সশ্রদ্ধ হ'য়ে বসে রয়েছ,—শ্রীগুরুর প্রতিকৃতির সম্মুখেও তদ্রূপ ব'সে তাঁকে সাক্ষাৎ উপস্থিত জ্ঞানে, স্তবস্তুতির মাধ্যমে প্রার্থনা করবে। আকুল আবেগের সহিত মিনতি জানালে গুরুকৃপার প্লাবন ব'য়ে যাবে। তোমাদের প্রার্থনা টেনে আনবে তাঁর কৃপাধারা। কলিযুগে সমবেত প্রার্থনায় যে অমোঘ শক্তি ইহা তোমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করবে। সঙ্ঘগুলিই মঠাশ্রম রক্ষণাবেক্ষণ করবে।"

সঙ্ঘগুলিই মঠাশ্রমের স্তম্ভস্বরূপ হইবে, হয়ত শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথাগুলি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। সুদৃঢ় স্তম্ভের উপর ইমারত যেরূপ দাঁড়াইয়া থাকে তদ্রূপ সঙ্ঘগুলি মঠাশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণে যত্নপর হইবে। যদি আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, দলাদলি, ঈর্ষাদ্বেষ ও অনাচারে জাগতিক কল্যাণকর মঠাশ্রমগুলি অন্তঃসারশূন্য হইতে থাকে তবে সক্রিয় ব্যবস্থার দ্বারা প্রতিরোধ করিয়া উহাদের পবিত্র রাখিতে হইবে। তাহা হইলে মঠাশ্রম হইতে সত্যের বিমল জ্যোতিতে সঙ্ঘের সভ্যগণও গুণক্রমে

* ১৩৪১ সালের আর্য্যদর্পণ পৌষ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রাণবন্ত হইবে। অন্যথায় অনাচারের প্রতিরোধ না করিয়া শুধু নির্ব্বাক দর্শক হইয়া থাকিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশের সারমর্ম্ম।

অতঃপর তিনি চট্টগ্রাম, ময়নামতী, বেলঘরিয়া, জলপাইগুড়ি আশ্রম ও রাজপুর আশ্রম হইয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রায় দুই মাস তথায় অবস্থান করিয়া সন ১৩৪২ সালের ১৩ আষাঢ় চিরবিদায় লইয়া মঠ ত্যাগ করিয়া আসিলেন। আসিবার পূর্ব্বে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও সেবকগণকে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় উপদেশ* দিলেন যাহার সংক্ষিপ্তসার এইস্থানে প্রদত্ত হইল।

"আমি স্থূলদেহে আর বেশীদিন থাক্‌ব না। কোন মহাপুরুষই অমর নন। অমর তাঁদের বাণী। আমার উপদেশ তোমরা সব পালন ক'রে চল্‌বে। যারা সংসার ত্যাগ ক'রে এসে আমার আশ্রয় নিয়েছ, আমি অদেহী হ'লেও তারা গৃহে ফিরে যেও না। আমার আশ্রম বা মঠ না-ই বা থাক্‌লো—বরং অন্য কোন সাধু-মহাপুরুষের আশ্রমে থাক্‌বে তবুও তোমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ো না। জনকল্যাণকর মঠাশ্রমের কাজের যে সূচনা আমি ক'রেছি তাতে আত্মনিয়োগে গুণক্ষয়ের একটা সুযোগ তোমাদের আছে।

"যদি তার তোমরা রূপ না-ই দাও, তবে সে আদর্শ যেন তোমাদের দ্বারা ম্লান না হয়। ভগবান কৃপা করবার জন্য তোমাদের ভার আমার অন্তরে নিহিত করেছেন। আমি অদেহী হ'লে আর কিছু দেখতে পাব না—এরূপ যাদের ধারণা তারা গুরুকেও নিজেদের মত অজ্ঞান ব'লে ভাবে। জ্ঞানসিদ্ধ গুরু দেহী বা অদেহী—সর্ব্বাবস্থায় তিনি সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ। গুরুর মৃত্যু নাই।"

* শ্রীশ্রীনিগমানন্দ উপদেশামৃত ২০৫-২০৮ পৃ. দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর বৎসরের প্রায় ৬ মাস ভ্রমণ ও অবশিষ্ট ৬ মাস পুরীতেই অবস্থান করিতেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুর পুরীতেই বাস করিতেছিলেন। বাৎসরিক ভক্তসম্মিলনী এবার পুরীতেই আহূত হইয়াছিল। পুরীর ভক্তগণ বাৎসরিক সম্মিলনীর জন্য আয়োজন করিতেছিলেন। এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুর মনের ভিতর নিরানন্দ অনুভব করিতে থাকিলেন। বাহিরের কোন কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কোন দৃশ্য দেখিয়া, কোন জিনিষ খাইয়া আনন্দ পাইতেন না। মন ভিতরে সমাহিত হইতে থাকিল। কয়েকদিন এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকাকালীন একদা শ্রীশ্রীঠাকুর পুরীর ভক্ত উকিল শ্রীবনমালী দাসকে বলিলেন যে এইরূপ নিরানন্দ অবস্থা যদি না কাটে তবে তিনি দেহত্যাগ করিবেন। অতঃপর ক্রমশঃ এই অবস্থা যখন তীব্র হইতে থাকিল তখন শ্রীশ্রীঠাকুর ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করিতে থাকিলেন। এই প্রকার অবস্থার কথা জানিতে পারিয়া ফণিদা পুরীতে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে হাওড়া ষ্টেশনে লইয়া আসার পর কলিকাতার ভক্তগণের অনুরোধে শ্রীশ্রীঠাকুর বেলঘরিয়ায় ভক্ত শ্রীসুধীরঞ্জন রায়ের বাসাবাড়ীতে উঠিলেন। অন্তর্য্যামী শ্রীশ্রীঠাকুর পুরী হইতে আসিবার সময় এবারে গেরুয়া কাপড় সঙ্গে লইয়া আসিলেন কিন্তু অন্যান্য বারে কোথাও গেরুয়া কাপড় সঙ্গে লইতেন না।

যিনি সুদীর্ঘ ৩০ বৎসর যাবৎ জীবজগৎকে ভবব্যাধি নিরাময় করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন তাঁহার স্থূলদেহের অসুস্থতা বা রোগ নিরাময়কল্পে ভক্তগণ অধীর হইয়া উঠিলেন। যথোপযুক্ত চিকিৎসার জন্য অনেক ডাক্তারের নামই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রস্তাব করা হইল তাহাতে তিনি বলিলেন—"আমার কথা ত আমি সবই জানি তবুও যদি তোমরা আমাকে দেখাতে চাও তবে সেই ছোক্‌রা ডাক্তারকে দেখাতে পার।" ছোক্‌রা ডাক্তার বলিতে ডাঃ যোগেশ

মুখার্জ্জীর কথা শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন ইহা সবাই বুঝিল। তিনি ৩।৪ বৎসর যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রায় সব অসুখের সময় চিকিৎসা করিয়া থাকেন। যখন বেলঘরিয়ার বাসাবাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বসন্তরোগ হয়, সে সময়ে চিকিৎসাকালীন স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার মায়ের স্মৃতিবিজড়িত পাথর বসান ১টী সোনার আংটী তাঁহাকে দিয়াছিলেন ; কারণ ডাঃ যোগেশবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের চিকিৎসার জন্য কোন ফি লইতেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছানুক্রমে ডাঃ যোগেশ মুখার্জীকে ডাকা হইল। তিনি আসিলে নানা প্রশ্নের পর রোগের কথা উঠিলে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"ছাখো ! মন টন সব ত ভগবানকে দিয়ে ফেলেছি—এই পচা গলা স্থূল দেহটা তোমাদের দেবো ব'লে এসেছি।"

ডাঃ মুখার্জ্জী—এ আপনার কৃপা।

এই বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"কোলকাতায় থাক্‌লে চিকিৎসার সুবিধা হয়।"

অতঃপর ২।১ দিনের মধ্যেই ৪৫।১বি বিডন ষ্ট্রীটে মাসিক ১১০্‌টাকায় বাড়ী ভাড়া করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে তথায় আনা হইল। ফণিদা, নারায়ণদা প্রভৃতি শিষ্যভক্তের ইচ্ছানুযায়ী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে ডাকার পরামর্শ শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিয়া বলিলেন—"এবার বিধানের বিধানে আর কাটবে না।"

অতঃপর ডাঃ বিধান রায় আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু রোগ নির্ণয় করিতে না পারিয়া অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুরকেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্বামীজি ! আপনার অসুখের কথা আপনিই বলুন।" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—একটী শান্ত পুকুরের ভেতরে একটা ঢিল নিক্ষেপ করলে তরঙ্গ উঠে তা যেমন ক্রমশঃ পুকুরে লয় হয়ে যায়—আমার ভেতরকার অবস্থাটাও ঠিক তদ্রূপ।

ডাঃ রায় ইহার মর্ম্মার্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুরের রক্ত পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে এরূপ বিশুদ্ধ রক্ত তিনি কখনও ইতঃপূর্ব্বে দেখেন নাই। তিনি ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন বটে কিন্তু কোনই ফল দেখা গেল না। সুতরাং হার্ট স্পেশালিষ্ট ডাঃ অমল রায় চৌধুরীকে আনা হইল। তিনিও আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত ঔষধেও কোন ফল হইল না।

আলিপুরদুয়ারের শিবদয়ালদা শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম একনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ প্রাচীন ভক্ত। একদিন তাঁহার সহিত ইহলোক-পরলোক—জীবন-মৃত্যুরহস্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক কিছুই আলোচনা করিলেন। নিজের সম্বন্ধে বলিলেন—"আমার সব দ্বার এখন খোলা—সব একাকার। জীবন্মুক্তের দেহাবসানে সূক্ষ্ম বা কারণ-দেহ থাকে না। স্থূলদেহ খসিয়া পড়িয়া যাওয়ার বা ছাড়িয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই—'ইহৈব সমবলীয়তে' —ব্রহ্মনির্ব্বাণ। * * * * আমার শেষ মুহূর্ত্তে তোমার মত লোক যদি ভুবনের পিছনে থাকে তবে সে ঘাবড়িয়ে যাবে না। * * * *"

ভক্তগণের ইচ্ছানুসারে স্যার নীলরতন সরকারকে আনা হইল। তিনিও ঔষধ দিলেন। কোন ফল হইল না। এসব ব্যর্থ চেষ্টায় শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিলেন।

ডাঃ যোগেশ মুখার্জি ২।১ দিন অন্তরই শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখাশুনা করিতেছিলেন। নিজ বাটিতে রোগী থাকায় কয়েকদিন আসিতে পারেন নাই। পরে একদিন আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নাড়ী দেখিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কি দেখলে ?

ডাঃ মুখার্জ্জী—কি করে বলি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাড়ী নেই, এই তো ?

ডাঃ মুখার্জ্জী—হাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কি মনে হয় ?

ডাঃ মুখার্জী—মনে হয় আর—

* * * *

১২ই অগ্রহায়ণ ভক্ত মতিলাল চক্রবর্ত্তীকে বলিলেন—"যাচ্ছি তোমাদের মঙ্গলচিন্তা করতে।"

বেলা ৩টায় নারায়ণদা উপস্থিত হওয়ামাত্র ভুবনদা তাঁহাকে বলিলেন —"ঠাকুর আপনাকে ডেকেছেন, আপনি উপরে যান।" ভুবনদার প্রমুখাৎ এই সংবাদ অবগত হওয়ামাত্র নারায়ণদা অতি দ্রুত শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট গিয়া প্রণামান্তর তাঁহার শয্যার নিকট বসিতেই তিনি বলিলেন—"এই যে নারাণ এসেছ, তোমাকে আমি খুঁজছিলাম—কয়েকটা কথা বলবো ব'লে। দেখ, আমার যদি দেহত্যাগ ঘটে, তোমরা দেখবে কেহ যেন আমার দেহের উপর চোখের জল না ফেলে, তাহলে কিন্তু সব গোলমাল হ'য়ে যাবে। আর দেহত্যাগ হলেও তোমাদের দুঃখের কোন কারণ ঘটবে না। আমি এখন যেমন তোমাদের মঙ্গলচিন্তা নিয়ে আছি, দেহত্যাগের পরেও ঠিক এই ভাবেই তোমাদের মঙ্গলচিন্তা নিয়ে থাকব। তুমি সকলকে এই কথা বলে দিও। আর শোন—"

এমন সময় সেবক ব্রহ্মচারী ভুবনদা বাহির হইতে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে ডাক্তারের নির্দ্দেশানুযায়ী কথা বলিতে নিষেধ করিলেন। ইহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর যেন একটু বিমর্ষ হইয়াই চুপ করিয়া থাকিলেন। যাহা বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আর বলা হইল না। ঐদিন রাত্রে নারায়ণদা বিডন ষ্ট্রীটের বাড়িতেই রাত্রি যাপন করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগ—১৩ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৪২ শুক্লা-চতুর্থী তিথি। শ্রীশ্রীঠাকুর সেবক ভুবন ব্রহ্মচারীকে বলিলেন—"যে দেহ দ্বারা কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছি না—কাহারও সঙ্গে দেখা

করিতে পারিতেছি না—কাহারও আনন্দবর্দ্ধন করিতেছি না—কাহাকেও সেবা করিতে পারিতেছি না—সে দেহ রাখিয়া লাভ কি? আমি আজ দেহত্যাগ করব। তুমি দেখ্‌বে—আমার দেহত্যাগের পর আমার দেহে যেন কাহারও চোখের জল না পড়ে।"

ডঃ অমল রায় চৌধুরী আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে পরীক্ষা করিলেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের চক্ষু সম্পূর্ণ মুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে—কাহারও ডাকে কোনও সাড়া দিতেছেন না—কেবল মাত্র মাঝে মাঝে ডাকের উত্তরে—উ—এই একটু শব্দ শোনা যাইতেছে।

বেলা তখন ১২টা—শ্রীশ্রীঠাকুর শয্যার উপর আসীন। তখন সেখানে তিন জন ব্রহ্মচারী ভিন্ন আর কেহ ছিল না। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সেবক ভুবন ব্রহ্মচারীর মনে একটা আশঙ্কা জাগিল, তার মনে কেমন যেন নৈরাশ্য দেখা দিল—তিনি তারস্বরে ডাকিলেন, "ঠাকুর, ঠাকুর!" মুদিত নেত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর শেষ কথা বলিলেন—"**আর কেন ডাক! আমাকে ভিতরে ডুবে যেতে দাও।**"

এদিকে সেবক ও ভক্তদের মনে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ডাঃ নলিনী সেনকে ডাকা হইল। তিনি পরীক্ষা করিয়া শেষ অবস্থা বুঝিয়া একটি প্রেসক্রিপশন করিয়া দিলেন কিন্তু সে ঔষধ আর খাওয়ান গেল না। তৎপূর্ব্বেই বেলা ১টা ১৫ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুর উপবিষ্ট অবস্থায়ই দেহত্যাগ করিলেন।

সে স্নেহসিক্ত নয়ন আর মেলিল না—বিরাট প্রতিষ্ঠানের প্রাণপ্রদীপ নিভিয়া গেল—অসংখ্য ভক্তের হৃদয়দেবতার নশ্বর দেহ পড়িয়া রহিল।

তারপর সেই নশ্বর দেহকে সুসজ্জিত করা হইল। ৪৫।১ বি বিডন ষ্ট্রীটের সম্মুখে শত শত লোক সমবেত হইল—যোগবলে দেহত্যাগী পরমহংস শ্রীশ্রীনিগমানন্দদেবের নশ্বর দেহ দেখিবার জন্য। যাহারা দেখিল তাঁহাকে ধ্যানগম্ভীর জীবন্ত মূর্ত্তি বলিয়া মনে করিল। অতঃপর



মহাসমাধিমগ্ন শ্রীশ্রীঠাকুর

(মহাপ্রয়াণের ৩ ঘণ্টা পর)

রাত্রি ৯টায় তাঁহার নশ্বর দেহ লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া বিডন ষ্ট্রীট ও সার্কুলার রোড হইয়া হালিসহর সারস্বত আশ্রমে লইয়া যাওয়া হইল।

হালিসহর সারস্বত আশ্রমে সমাধি—১৪ই অগ্রহায়ণ শনিবার। পূত ভাগীরথীতীরে হালিসহর সারস্বত আশ্রমে গুরুব্রহ্মের আসনমন্দিরের দক্ষিণে দশ হাত গভীর ভূমি খনন করিয়া একটি ক্ষুদ্র কক্ষ তৈয়ার করা হইল। ভূগর্ভকক্ষের মেঝেতে বসান হইল আধ ইঞ্চি পুরু একটি লৌহপাত ও চারিপার্শ্বে চারিখানি ঢেউতোলা টিন খাড়া করিয়া রাখা হইল। অতঃপর হাজার হাজার ভক্তের উপাস্য দেবতার নশ্বর দেহ উপবিষ্ট অবস্থায়ই একটি সেগুন কাঠের বাক্সের ভিতরে বসানো হইল। সেই বাক্সের তিন দিকে তিনটি তাকিয়া। পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত—চন্দনে চর্চ্চিত এবং ধূপধুনায় অর্চ্চিত সে দেহে অগুরু সুরভিত করা হইল। বাক্সের সম্মুখে পর্দা দিয়া ঢাকিয়া রেলের দুখানি পাটির সাহায্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের নশ্বর দেহ-অধিষ্ঠিত বাক্স ধীরে ধীরে মৃৎকক্ষে নামানো হইল। রেলের পাটির উপর ঢেউ তোলা টিন দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া তাহার উপর সর্বপ্রথম মাটি দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের আদি ত্যাগী শিষ্য স্বামী চিদানন্দ—তারপর দিলেন অগণিত শিষ্যভক্ত। এইভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের নশ্বর দেহ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় সমাধিস্থ করা হইল।

আমরা যে আজ কি হারাইয়াছি তাহা বুঝি নাই। তাঁহাকে হারাইয়া দীন হইয়াছি তাহাও ধারণা করিতে পারি নাই। যে আত্ম-বোধ তিনি জাগাইতে আসিয়াছিলেন জীবনে তাহার প্রত্যক্ষ বোধের অধিকারী হইব কি-না তাহাও জানি না—তবে তাঁহার সে বাণী এখনও আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে—“আমার দেহত্যাগের পর জগদ্‌গুরুর সহিত মিশে যাব বটে, কিন্তু আমাকে তোরা আরও বেশী ভাবে উপলব্ধি

করতে পারবি—আমি তোদের ভিতর দিয়া অতি দ্রুত ফুটে উঠব। আর তোরা আমার জন্য কেঁদে ভাসিয়ে দিবি।"

আজ বুঝিতেছি সত্যই অশ্রুই আমাদের সম্বল, অর্ঘ্য দিবার মত আমাদের আর যে কিছুই নাই। হে ভগবান, নরদেহধারী হইয়া যতক্ষণ আমাদের ভিতর ছিলে—স্বভাববশত, ভ্রমবশত কত ঘাটই হয়েছে।

তোমার স্থূলদেহের বিদ্যমানে কোনদিন ক্ষমা ভিক্ষা করিবার অভিমান ত্যাগ করি নাই। আজ অনুশোচনা এসেছে। হে ঠাকুর! হৃদয়ে শান্তি দাও, উজ্জ্বল কর।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

(১)

শঙ্করের মত ও গৌরাঙ্গের পথ*

জ্ঞান ও প্রেমের মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীশ্রীঠাকুর বিভিন্ন মতবাদের পথে সাধনায় সত্য লাভ করিয়া দেখিয়াছেন যে, সব মতবাদের পথেই সত্য লাভ করা যায় এবং তাঁহার প্রকট অবস্থায় নানা মতের ও নানা পথের সাধকদিগকে পরিচালিত করিয়া তিনি সেই সেই মতে সত্যলাভের পথ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। কতকগুলি সাধনায় যেরূপ সাধনানুকূল শরীর প্রয়োজন হয় বর্ত্তমানকালে তদুপযোগী শরীর ও সংযম নাই। তজ্জন্য তিনি অদেহী হইলে তৎপ্রতিষ্ঠিত সারস্বত মঠের ভাব ও আদর্শের ধারক ও বাহক তদন্তর্গত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সঙ্ঘকে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন এবং বিভিন্ন ভক্তসম্মিলনীতে তাহা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

শঙ্করের মত ও গৌরাঙ্গের পথ—অর্থাৎ ভক্তিপথে অদ্বৈতসিদ্ধি বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সহজেই হইতে পারে ইহা শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার আশ্রিতগণকে অতি দৃঢ়তার সহিত বলিয়া গিয়াছেন।

শঙ্করের মত নির্গুণ ব্রহ্মবাদ এবং গৌরাঙ্গের পথ হইল ভক্তিপথ। ভক্তিপথ সাধারণতঃ দ্বৈতবাদীর পথ। এই ভক্তিপথে সাধনা করিলে কিরূপে অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করা যায় ইহাই আলোচ্য বিষয়। গৌরাঙ্গের পথটা যে কি, নিম্নে তাহাই আলোচনা করা হইতেছে।

---

* ভারতের একজন খ্যাতনামা শাস্ত্রবিদ্ ও আইনজ্ঞ একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে শঙ্করের মতের সহিত গৌরাঙ্গের পথের সামঞ্জস্য হয় কি প্রকারে এবং দ্বৈতবাদের সাধনার দ্বারা অদ্বৈতজ্ঞান লাভ হয় কি ভাবে? উক্ত প্রশ্নের উত্তরে কলিকাতা সারস্বত সঙ্ঘের প্রাক্তন সভাপতি বন্ধুবর শ্রীমতিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ইচ্ছায় ইহা সংক্ষেপে লিখিত হইল।—গ্রন্থকার

১। **শাস্ত্রানুগত্য**। শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনযাত্রার পথে শাস্ত্রানুরক্তি দেখা যায়। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য হইয়াও অনুষ্ঠানমূলক সন্ন্যাস লইতে তিনি ভারতী সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীপাদ কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সমাজকল্যাণের জন্য শাস্ত্রপ্রদর্শিত পন্থার আনুগত্য দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ত সন্ন্যাসেরই কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তবুও তিনি "আপনি আচরি ধর্ম্ম" জীবকে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন।

২। **নারী সম্ভাষণকারীর সঙ্গত্যাগ** (ছোট হরিদাস)।

প্রভু কহে "বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনিজনের মন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"

* * *

প্রভু কহে "কভু নহে বশ আমার মন।
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥"

* * *

হরিদাস কাহা যদি শ্রীবাস পুছিল।
"স্বকর্ম্ম ফলভাক্ পুমান্" প্রভু উত্তর দিল॥
তবে শ্রীবাস তার বৃত্তান্ত কহিল।
যৈছে সংকল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল॥
শুনি প্রভু হাসি কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত।
"প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥"

চৈঃ চঃ

৩। **নারীস্পর্শ বর্জ্জন।**

(গুর্জ্জর রাগে শ্রীগীতগোবিন্দ পদ গান শ্রবণে
প্রভুর আবেশ হয়)।

"তারে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইল।
স্ত্রীগান বলিয়া গোবিন্দ কোলে কৈল॥" চৈঃ চঃ

(বাহ্য ফিরিয়া আসিলে)

প্রভু কহে, গোবিন্দ আজ রাখিলে জীবন।
স্ত্রী পরশ হইলে আমার হইত মরণ॥
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।
গোবিন্দ কহে "জগন্নাথ রাখে মুঞি কোন ছার"॥
প্রভু কহে "গোবিন্দ মোর সঙ্গে রহিবা।
যাহা যাহা মোর রক্ষায় সাবধান হইবা।"

৪। **রজোগুণাত্মক ব্যক্তির দর্শনে অনিচ্ছা।**

সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজ দরশন।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ॥
প্রভু কহে তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠ নারী স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার॥

চৈঃ চঃ

৫। **বিষয়বার্ত্তা ত্যাগ।**

ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জ্জন নিবাসী।
আমায় দুঃখ দেন নিজ দুঃখ কহি আসি॥

* * *

বিষয় বার্ত্তা শুনি ক্ষুব্ধ হয় মন।
তাহে ইহা রহি মোর নাহি প্রয়োজন॥

চৈঃ চঃ

৬। **বিধবার পুত্রের সঙ্গত্যাগ।**

শুনি প্রভু কহে "কাহাঁ কহো দামোদর।"
দামোদর কহে "তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥

*　　*　　*

রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেনে কর ॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী ॥
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোক-কানাকানি বাতে দেহ অবসর ॥
এত বলি দামোদর মৌন হইলা।
অন্তরে সন্তোষ প্রভু হাসি বিচারিলা ॥
ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ।
দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ ॥"

চৈঃ চঃ

৭। **জিহ্বা লাম্পট্য ত্যাগ।**

প্রভু কহে যতি হইয়া জিহ্বা লাম্পট্য অত্যন্ত অন্যায়।
যতি ধর্ম্ম প্রাণ রাখিতে মাত্র খায় ॥

৮। **তৈল বর্জ্জন।**

প্রভু কহে "সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার ॥
পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যেই পাইবে।
দারী সন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে ॥

*　　*　　*

সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়।
মসীবিন্দু ধৌতবস্ত্রে যৈছে না লুকায় ॥ চৈঃ চঃ

৯। **সমবুদ্ধি।**

আমি ত সন্ন্যাসী আমার সমদৃষ্টি ধর্ম্ম।
চন্দন-পঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় সম॥
ঘৃণাবুদ্ধি করি যদি নিজ ধর্ম্ম যায়।

চৈঃ চঃ

১০। **দীনতা ও নিরভিমান।**

উত্তম হইয়া হীন করি মান আপনারে।
সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে॥

১১। **সন্ন্যাসীর শয্যা।**

কলার শরলাতে শয়ন ক্ষীণ অতিকায়।
শরলাতে হাড় লাগে ব্যথা লাগে গায়॥

*   *   *

তুলি বালিশ দেখি প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হল।

*   *   *

গোবিন্দকে কহি সেই তুলি বাহির কৈল।
কলার শরলার উপর শয়ন করিল॥

*   *   *

প্রভু কহে খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দ চায় আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমার খাট তুলি বালিশ মস্তক মুণ্ডন॥

চৈঃ চঃ

১২। **বিষয়ীর অন্নবর্জ্জন।**

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥ চৈঃ চঃ

১৩। **সঞ্চয়শীলতা বর্জ্জন বা আকাশ-বৃত্তি।**

"Gobinda Das offered half the portion of a *haritaki* to Chaitanya Deva, after his dinner and kept the other half for the next day. On seeing the other half the next day, he enquired of Gobinda Das, where he got it. The latter replied that it was the remnant of the day before. "Would you store up things for the morrow like a worldly man ? You can't then be admitted into the order of the ascetics." He was made to retire to his home for this act. (১)

১৪। **নিজগণের ভিতর জাতিভেদ প্রথা বর্জ্জন।**

Nimai has broken the trammels of Caste. He boldly declared, "Though one is a Chandal (Paria) he is superior to all Brahmins, if he is pious and has love for God. * * * If a muchi (cobbler) prays to God with true devotion, a hundred times do I offer salute at his feet. (২)

জীবের জীবত্ব নাশ করিতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবনযাত্রার এই পথ অবলম্বন করিয়া নিরন্তর ভজনে বা শ্রীগুরুর নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মযোগে আত্মনিয়োগ করিলে হৃদয়ের ভিতর ভগবদ্ভাবের বিকাশ লাভ ঘটিবে। ধ্যাতা যখন ধ্যেয় বস্তুতে তন্ময় বা লয় হইয়া যাইবে তখন আর দ্বৈতজ্ঞান থাকিবে না—বিন্দু সিন্ধুতে লয় হইয়া যাইবে।

গীতায় শ্রীভগবান্ ১৪শ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে অনন্যা ভক্তি দ্বারা তাঁহার সেবা করিলে গুণত্রয় বিশেষভাবে অতিক্রম

(১+২) History of Bengalee Language and Literature by Dr. Dinesh Chandra Sen—Page 430. 1911 Edition.

করিয়া "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে"—অর্থাৎ ব্রহ্মানুভূতির যোগ্য হয়। গীতায় ১৮শ অধ্যায়ে ৫৫ শ্লোকে বলিয়াছেন, ভক্তি দ্বারা—"যাবান্ যশ্চাস্মি"—অর্থাৎ তাঁহার বিভুত্ব বা ব্যাপকতা এবং তাঁহার স্বরূপ "তত্ত্বতঃ" জানিতে পারে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—"*** যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান—তিনি যদি ভক্তিপথ ধরেও যান, তাহলেও তিনি সেই জ্ঞান লাভ করবেন। ভক্তবৎসল মনে করলেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন।*** ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুসী হয় তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন—জ্ঞানও দেন। * * * সেই সগুণ ব্রহ্ম, যিনি প্রার্থনা শুনেন—তাকেই বলো। তিনিই সেই ব্রহ্মজ্ঞান দিবেন—কেননা যিনিই সগুণ ব্রহ্ম—তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ১ম ভাগ,

"ভক্তিতেই সব পাওয়া যায়। যারা ব্রহ্মজ্ঞান চায়, যদি ভক্তি রাস্তা ধরে থাকে, তারা ব্রহ্মজ্ঞানও পাবে।

তাঁর দয়া থাকলে কি জ্ঞানের অভাব থাকে? *** ভক্তির দ্বারাই সব পাওয়া যায়। তাঁকে ভালবাসতে পারলে আর কিছুরই অভাব থাকে না। * * মাকে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম—বেদ-বেদান্তে কি আছে আমায় জানিয়ে দাও। তিনি একে একে সব জানিয়ে দিয়েছেন।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ৪র্থ ভাগ

গীতাবাক্য উদ্ধার করিয়া শ্রীমৎ সন্তদাস বাবাজী 'গুরুশিষ্যসংবাদে' বলিতেছেন—

"ভক্তিযোগের দ্বারাও যে এই ব্রহ্মপরতা লাভ হয় তাহাও ভগবান গীতায় স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন, যথা—

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥"

—গীতা ১৪শ অঃ

ভক্তিযোগের চরম অবস্থায় ব্রহ্মভাব লাভ হইবেই—এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন—"সকল মতবাদকে অদ্বৈতবাদ যেন স্নেহের পক্ষপুটে জড়িয়ে রেখেছে।*** দ্বৈত শেষভূমিতে টিকতেই পারে না। আস্বাদনের চরম মুহূর্ত্তে—অদ্বৈতেরই উপলব্ধি হয়ে থাকে।*** ধ্যাতা যখন ধ্যেয় বস্তুতে তন্ময় হয়ে যায়, তখন কি আর দ্বৈতভাব থাকে ?*** সেবা করতে করতেও—অদ্বৈতভাব মাঝে মাঝে এসে যায়। তবে ভক্তেরা জোর করে তাকে ঠেলে দিয়ে সেবা-সেবক ভাব নিয়েই থাকতে চায়। আমাকে যে প্রকৃত ভালবাসে—তার মাঝে আমিই ফুটে উঠি। এখানেও অদ্বৈতেরই লীলা।" (১)

ভক্তের সঙ্গে ভগবানের অদ্বৈতসিদ্ধি একবার লাভ হইলে ভক্তের ইচ্ছা মাত্রই সমস্ত তত্ত্বই তার মধ্যে বিকশিত হইয়া যায়।

যাঁহাদের বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, অথচ সন্ন্যাস লইয়াছেন—এই সব সন্ন্যাসীর পক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের পথচারী হওয়া সুকঠিন। শাস্ত্র তাঁহাদিগকে পতিত বলিয়াছেন। যথা—

যদা মনসি বৈরাগ্যং জায়তে সর্ব্ববস্তুষু।
তদৈব সংন্যসেৎ বিদ্বানন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই স্মৃতিবাক্যটি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মবিচারের অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন।

শ্রীল রঘুনাথ দাসকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব গৃহীদিগকেও পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।

(১) শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-উপদেশামৃত

"মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥

—চৈঃ চঃ

"শঙ্করের মত ও গৌরাঙ্গের পথ" এই নীতি ও আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ যদি পথভ্রষ্ট হইয়া যান তবে গৃহীগণ অধঃপাতে যাইবে এই আশঙ্কায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাদের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন—

"আমার মতের সঙ্গে যাদের মতের মিল না হবে, তাদের আমারই প্রতিষ্ঠিত মঠাশ্রমে থেকে আমার ভাবকে—আদর্শকে কলুষিত করা উচিৎ নয়।" (১)

(১) শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-উপদেশামৃত

শ্রীশ্রীঠাকুর ও তত্ত্বচতুষ্টয় *

চরমতত্ত্ব যাহা—তাহা হিন্দুদর্শনোক্ত সাধনার দ্বারা চারি ভাবে জানা যায়। তন্ত্রের ভিতর দিয়া যাহা জানা যায় তাহা শক্তিবাদ, যোগের ভিতর দিয়া যাহা জানা যায় তাহা পরমাত্মবাদ, বেদান্তের ভিতর দিয়া যাহা জানা যায় তাহা ব্রহ্মবাদ এবং ভক্তিদর্শনের ভিতর দিয়া যাহা জানা যায় তাহা ভাবতত্ত্ব। এই তত্ত্বচতুষ্টয়ই শ্রীশ্রীঠাকুরের ভিতরে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী লোকগুরুগণের জীবনী ও সাধনা সমূহ আলোচনা করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে শঙ্করাচার্য্য বেদান্তোক্ত জ্ঞানের সাধনায় পূর্ণজ্ঞানী—ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন। উভয়ভারতীকে তর্কে পরাস্ত করিবার জন্যই আচার্য্য শঙ্করকে তন্ত্রের প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া কামকলাতত্ত্ব অধিগত করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে কাশ্মীরে সারদাপীঠে গমনের পর তাঁহাতে ভাবতত্ত্বের বিকাশ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ আনন্দলহরী ও দেবদেবীর স্তোত্র প্রভৃতি রচনা তাহার প্রমাণ। কিন্তু এই ভাব যখন তাঁহাতে বিকাশ হইয়াছিল, তখন তাঁহার আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে। সুতরাং উহা প্রচার করিবার সুযোগ ও সুবিধা তিনি পান নাই। কাজেই আমরা দেখিতে পাই যে ব্যাসদেবের পর শঙ্করের ভিতরই জ্ঞান ও ভাবতত্ত্ব এই উভয় তত্ত্বই বিকাশ লাভ করিয়াছিল। যোগের পরমাত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার জ্ঞাত থাকিলেও তন্ত্রের শক্তিবাদ প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার জ্ঞাত ছিল কি-না তাহা আমরা বলিতে পারি না।

তাঁহার পরই রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মত স্থাপন করিয়া দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য করিয়া ভক্তিবাদের বিশেষত্ব স্থাপন করেন।

---

* মাননীয় বিচারপতি স্যার এম, এন, মুখার্জ্জী কে, টি, মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারের মহাবোধি হলে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধান উপলক্ষে সর্ব্বপ্রথম যে সভা আহূত হয়, উক্ত সভায় পঠিত।

কিন্তু জীবনে অন্যান্য সাধনার দ্বারা সেইসব পন্থায় সত্য লাভে সক্ষম না হইয়া পরমত-অসহিষ্ণুতা দোষদুষ্টির জন্য মাদ্রাজের জনৈক শৈব রাজার রাজ্য হইতে প্রাণভয়ে পলাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার ভিতর অন্য কোন ভাবের সাধনার বিকাশপ্রাপ্তি হয় নাই।

পরে জয়দেব ভক্তিবাদের ভিতর আরও কিছু মিষ্টত্ব মিশ্রিত করিয়া কিশোর কৃষ্ণের প্রেমঘন মূর্ত্তি গড়িয়া মানবজাতির সম্মুখে ধরিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভিতর জ্ঞান ও যোগের ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব বিকাশ লাভ করে নাই। কেবল ভাবতত্ত্বে তন্ত্রের কামকলাতত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছিল। তন্ত্রের উৎকৃষ্টাংশ অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গের ভিতর দিয়া মহাশক্তির সহিত সম্বন্ধ তাঁহাতে প্রকাশ পায় নাই।

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য আসিয়া যুগপ্রয়োজনে ভক্তিধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রেমের বন্যা বহাইয়া সাময়িকভাবে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমদ্বারা জ্ঞান ও যোগশাস্ত্রোক্ত সাধনাকে স্তম্ভিত করিয়া দেন। তিনি বেদান্তদর্শনের মায়াবাদকে ভাসাইয়া দিয়া উক্ত দর্শনের পরিণামবাদের সহিত ভাবতত্ত্বের খাপ খাওয়াইয়া প্রচার করিয়া যান। কিন্তু জ্ঞান, যোগ ও তন্ত্রের বীজ ঐ সময়ে প্রকাশানন্দ, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ বুকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তিনি জয়দেবের প্রেমময় কৃষ্ণকে বেদান্তের পরিণামবাদের সহিত খাপ খাওয়াইয়া জগতের সম্মুখে ধরিয়া গেলেও নানক বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্য একটী ভাব অর্থাৎ "নিরাকার অবিনাশী" ভাব প্রচার করিয়া গেলেন। গুরু নানকের ভিতর অন্য ভাব ফুটিল না; তাঁহাতে যোগ, জ্ঞান বা তন্ত্রের সাধনপদ্ধতি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল না।

তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ আসিলেন—তিনি দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরব্যাপী তন্ত্রোক্ত কঠোর সাধনা করিলেন। পঞ্চবটীতলে উলঙ্গ হইয়া আসন

করিয়া কঠোর সাধনা করিয়া মহাশক্তিকে জগজ্জননীরূপে সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিলেন। শুধু জগজ্জননীরূপে বলিলে ঠিক হইবে না, তাঁহাতে মাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা এতই হইল যে সামাজিক প্রথা বা পূর্ব প্রারব্ধ অনুসারে বিবাহ করিলেও তিনি স্ত্রী-জাতির ভিতর মায়ের বিকাশ দেখিতে পাইয়া নিজের স্ত্রীর ভিতর একমাত্র মায়েরই বিকাশ অনুভব করিতে লাগিলেন। মহাশক্তির মা-মেয়ে-স্ত্রী এই তিনভাবে বিকাশ। কিন্তু তাঁহার ভিতর মাতৃভাবের বিকাশ হওয়ায় মহাশক্তির কন্যাভাব ভক্তের নিকট গ্রাসিত হইল বটে, কিন্তু তাঁহাতে স্ত্রীর ভাব মনে জাগে নাই বা মহাশক্তির স্ত্রীভাব তাঁহাতে ফুটিয়া উঠে নাই। সন্তানের মায়ের সহিত যতটা ভালবাসা—যতটা প্রেম হইতে পারে একমাত্র তাহাই হইল। জগৎ তাঁহার সন্তানভাবে স্তম্ভিত হইল—কিন্তু সমস্ত ভালবাসা দাস্যভাবে মায়ের চরণেই নিবদ্ধ রহিল।

সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জনরূপ সন্ন্যাসধর্ম্মে অভ্যস্ত না হওয়ায় ও সাম্প্রদায়িক মূর্ত্তিসাধনায় মন যেভাবে গঠিত হইয়াছিল, পরম বৈদান্তিক তোতাপুরীর সাহায্যে প্রথম প্রথম বৈদান্তিক সাধনায় ঐ মূর্ত্তি সম্মুখে আসিয়া বাধা প্রদান করিলেও তোতাপুরী যাহা ৪০ বৎসরে আয়ত্ত করিয়াছিলেন তিনি মাত্র তিন দিনের চেষ্টায় সেই নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করায় অধ্যাত্মপথের পথিকগণ তাঁহার অসাধারণত্ব দর্শনে স্তব্ধীভূত হইলেন। তারপর সুকোমল ভাবতত্ত্বের সাধনায় গোপীভাবে লুব্ধ হইয়া নারী সাজিয়া নারীর সহিত মিশিয়া নারীভাবে ভাবিত হইতে চেষ্টা করিলেও তাঁহার আত্মবিস্মৃতি অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপবিস্মৃতি আসিল না—কারণ নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। তিনি ব্রহ্মজ্ঞ হওয়ায় পুরুষের স্বরূপ অবস্থা লাভ হইয়াছে। সুতরাং যাঁহার একবার আত্মপ্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে তাঁহার আবার আত্মবিস্মৃতি আসিবে কি প্রকারে? তাঁহার স্বরূপ বদলাইল না। সুতরাং ভাবতত্ত্বের

ভিতর প্রেমের যে স্তরে "প্রতি অঙ্গ কান্দে মোর প্রতি অঙ্গ লাগি" শ্রীভগবানের সহিত তাঁহার এই "মধুর" সম্বন্ধ স্থাপিত হইল না। এবং যোগসাধনপন্থায় চরমে যে অবস্থা লাভ হয় তাহার অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্বের জাগ্রত ভাবের অভাব রহিয়া গেল। এই ত গেল দক্ষিণেশ্বরের সেই অদ্ভুত দেবমানবের কথা।

তারপর আমরা আর একজনকে দেখিয়াছি—শ্রীশ্রীনিগমানন্দদেব, যাঁহার কথাই বলিতে আসিয়াছি। তিনি ভগবানকে জানিব—তাঁহাকে পাইব বলিয়া কোমর বাঁধিয়া সাধনা করেন নাই। সাধারণ মানুষ যেমন অবিশ্বাসী হয় তিনিও তেমনি দেব-দ্বিজে অবিশ্বাসী ছিলেন। নীতিবিদ্ জীবন যাপনই তাঁহার জীবনের প্রথম হইতে লক্ষ্য ছিল। কিন্তু অবিশ্বাসীর নিকট মহাশক্তি মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করিলেও প্রহেলিকা (**hallucination**) বলিয়া বাল্যে চাঞ্চল্যবশে তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন। কোষ্ঠী দেখিয়া পুত্র সন্ন্যাসী হইবে ভয়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিবাহ দিলেন। নারীর হৃদয়ের ভিতরে কি আছে তিনি তাহা দেখিলেন। অকস্মাৎ স্ত্রীর মৃত্যু হইল। তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। স্ত্রীর সহিত সাক্ষাতের জন্য এক রাত্রের সাধনায় মহাশক্তিকে স্ত্রীরূপে পাইলেন। ধর্ম্মজগতে এক অভিনব ব্যাপার সংঘটিত হইল। কিন্তু সাধনাকালে তাঁহার শরীর হইতে বিচ্ছুরিত জ্যোতিঃ ঘনীভূত হইয়াই দেবীর প্রকাশ হওয়ায় তিনি চিন্তা করিলেন যে—শক্তির জন্ম যখন তাঁহা হইতে তখন তাঁহার স্বরূপ কি? "আমি কে" এই ভাব লইয়াই তিনি গৃহত্যাগ করেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। পূর্ণ বৈরাগ্য ব্যতীত কেহ "অহং"-এর স্বরূপ জানিতে ব্যস্ত হয় না। ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় একমাত্র শ্রীশঙ্করই নিজের স্বরূপ জানিতে বাহির হইয়াছিলেন। স্বামী নিগমানন্দ দেড় বৎসরের মধ্যেই যোগ-সাধনায় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিলেন। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির পর

বেদান্তোক্ত সাধনার চরমে যে অবস্থা লাভ হয়—তাঁহার বিনা চেষ্টায় সেই নির্ব্বিকল্প অবস্থা আপনি খুলিয়া গেল। নির্ব্বিকল্প অবস্থা হইতে নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করা যায় না—সেই জ্ঞানাতীত ভূমি হইতে গুরুভাব জাগিয়া যাওয়ায় তিনি সেই সূত্র ধরিয়া স্থূলে অবতরণ করিলেন। ঐ অবস্থা লাভের পরেও তিনি নিজের ভিতর অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। মহতের কৃপায় তাঁহাতে প্রেমের স্ফূর্ত্তি হইল। প্রেমময়ী তাঁহাকে আপনি আসিয়া ধরা দিলেন।

ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমরা যাহাই বলনা কেন, হিন্দুধর্ম্মের চারিটি তত্ত্ব যেরূপ ভাবে এই একই আধারে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে এরূপ আধার তুমি দ্বিতীয়টি দেখিতে পাইবে না—ইহা উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারা যায়। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার যে তত্ত্বচতুষ্টয়ের প্রত্যেকটির সাধনার প্রয়োজন ছিল, এবং ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে গুরুবাদের ভিতর দিয়া একটা ঐক্যের সন্ধান দিবার প্রয়োজন ছিল—ইহা তাঁহার সাধক-জীবন আলোচনায় বুঝিয়াছি। ভারতের সভ্যতার গতি যে দিকে, তাহার বহুপূর্ব্বে সেই সব ভাবের অগ্রদূতস্বরূপ এইরূপ অসীম শক্তিশালী মহাপুরুষগণ সেই পথ চিহ্নিত করিয়া হাজার হাজার লোককে সেই পথ দেখাইয়া যান। তাঁহার ভাব প্রথমতঃ লোকে গ্রহণ করে না। পরে যখন তাঁহাকে বুঝিবার অবসর, শক্তি এবং সময় হয় তখনই তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহা আমরা মানবসমাজে বরাবর দেখিয়া আসিতেছি।

শ্রীশ্রীনিগমানন্দদেবের ভিতর হিন্দুদর্শনের মূল চারিটি তত্ত্ব যেভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে এই প্রবন্ধ তাহারই সংক্ষিপ্ত প্রকাশ মাত্র।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

সমাপ্ত

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ হইতে প্রকাশিত

সারস্বত গ্রন্থাবলী

ব্রহ্মচর্য্য-সাধন—ব্রহ্মচর্য্য পালনের ধারাবাহিক নিয়মাবলী। (১৬শ সংস্করণ) মূল্য ৩'০০। অসমীয়া ও হিন্দী ২'৫০।

যোগীগুরু—যোগ ও তাহার সাধনপদ্ধতির সহজ বিবরণ। (১৬শ সংস্করণ) মূল্য ৯'০০ টাকা। ঐ হিন্দী ১০'০০, অসমীয়া ৫'০০ টাকা।

জ্ঞানীগুরু— জ্ঞান ও যোগের উচ্চাঙ্গসমূহের বিশদ আলোচনা। (১৩শ সংস্করণ) মূল্য ১২'০০ টাকা। ঐ হিন্দী ৮'০০ টাকা।

তান্ত্রিকগুরু—তন্ত্রশাস্ত্রের মর্ম্মরহস্য ও তান্ত্রিক সাধনার প্রাঞ্জল বিবরণ। (১১শ সংস্করণ) মূল্য ৯'০০ টাকা। ঐ হিন্দী ৬'০০ টাকা।

প্রেমিকগুরু—জীবনের পূর্ণতম সাধনা প্রেমভক্তি ও জীবন্মুক্তির সুমধুর বর্ণনা। (১০ম সংস্করণ) মূল্য ১০'০০। ঐ হিন্দী ১৫'০০।

মায়ের কৃপা—জগজ্জননীর শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ ও অভয়বাণী। (৯ম সংস্করণ) মূল্য ২'০০ টাকা। হিন্দী সংস্করণ ১'৫০ টাকা।

কুম্ভযোগ—কুম্ভমেলার পৌরাণিক ইতিবৃত্ত ও সাধকগণের পরিচয়সহ ১৩২১ সালের হরিদ্বার কুম্ভমেলার বিস্তৃত বিবরণ। (৪র্থ সংস্করণ) ১'৫০।

তত্ত্বমালা—১ম খণ্ড, শক্তিতত্ত্ববিশ্লেষণ (৫ম সংস্করণ) ৩'৫০ টাকা।

তত্ত্বমালা—২য় খণ্ড, ভগবৎতত্ত্ববিশ্লেষণ (৫ম সংস্করণ) ৩'০০ টাকা।

তত্ত্বমালা—৩য় খণ্ড, আত্মতত্ত্ববিশ্লেষণ। (৫ম সংস্করণ) ৪'০০ টাকা।

সাধকাষ্টক—আটজন গৃহস্থ সাধুর জীবন-কাহিনী(৫মসংস্করণ)৩'৫০।

বেদান্ত-বিবেক—বেদান্তশাস্ত্রের অমৃতময় তত্ত্বসমূহের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ। (৪র্থ সংস্করণ) ৩'০০।

শিক্ষা—বর্ত্তমান শিক্ষাসমস্যা ও তাহার সমাধান (৩য় সংস্করণ) ৬'০০।

উপদেশরত্নমালা— কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিমূলক উপদেশসমূহে গ্রথিত অপরূপ রত্নহার। (৭ম সংস্করণ) ১'০০ টাকা।

স্তোত্রমালা— সারস্বত মঠে পঠিত স্তোত্রসমূহের সংগ্রহ। ১'৫০।

শ্রীশ্রীনিগমানন্দের জীবনী ও বাণী সিদ্ধ সদ্‌গুরুর শ্রীমুখনিঃসৃত জীবন-কথা, আত্মপরিচয়, তত্ত্বোপদেশ ও অভয়-বাণীর অপূর্ব্ব সমাবেশ। (৬ষ্ঠ সংস্করণ) মূল্য ১০'০০ টাকা।

অভয়বাণী—শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বহস্তলিখিত ও শ্রীমুখ-কথিত আশা ও উদ্দীপনাপূর্ণ বাণীসমূহের সংগ্রহ। (৩য় সংস্করণ) মূল্য ১ ২৫ টাকা।

নিগমবাণী— শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দের সার্ব্বভৌম বাণী। ১'২৫ টাকা।

কীর্ত্তনমালা—(৪র্থ সংস্করণ) ৬'৫০ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-উপদেশামৃত—(২য় সংস্করণ) ৬'০০ টাকা।

নিগমপ্রসাদ—শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময়ী বাণী। প্রসাদের মতই মধুর। ২'৫০ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্ব-সঞ্চয়ন—গুরুতত্ত্বসম্পর্কে শাস্ত্রবাণী ও মহাপুরুষবাণীর অপূর্ব্ব সমাবেশ। মূল্য ৪'০০ টাকা মাত্র।

সঙ্ঘবাণী—সারস্বত সঙ্ঘের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী। ১'০০।

মনঃশিক্ষা—মনকে বুঝাইবার, শিখাইবার ও সর্ব্বাবস্থায় সাম্যাবস্থা লাভ করিবার অব্যর্থ সঙ্কেত। ৮'০০ টাকা মাত্র।

উৎকলতীর্থে—উৎকলদেশে অবস্থিত তীর্থসমূহের প্রাঞ্জল বিবরণসহ বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতবাদসমন্বিত মনোরম ভ্রমণকাহিনী। ৫'০০ টাঃ।

নীলাচলে ঠাকুর নিগমানন্দ—১ম খণ্ড ১৫'০০, ২য় খণ্ড ১০'০০।

ভক্তসম্মিলনীর ভাষণ—মূল্য ১০'০০ টাকা। **শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দের লৌকিক বিদ্যা ও অলৌকিক শক্তি**—মূল্য ৭'০০টাকা। **উপনিষদ্ মনন**—১ম ৪'০০, ২য় ৫'০০, ৩য় ৪'০০, **বেদান্তকেশরী**—২'৫০, **শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-গল্পসঞ্চয়ন**—৫'০০, **ছন্দে নিগমানন্দ**—১ম ৬'০০, ২য় ৭'০০, ৩য় ৮'০০, ৪র্থ ১২'০০, **আচার্য শঙ্কর ও তদীয় মতবাদ**—৬'০০, **মহাপুরুষ** (নাটক)—৬'০০।

সারস্বত মঠান্তর্গত শাখাশ্রম ও সঙ্ঘসমূহ হইতে প্রকাশিত

পুস্তকাবলী

ঠাকুরের চিঠি—ঠাকুর শ্রীশ্রীনিগমানন্দ পরমহংসদেবকর্ত্তৃক তদীয় শিষ্যভক্তগণসমীপে লিখিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ পত্রাবলী। ১ম খণ্ড ২'৫০, ২য় খণ্ড ২'০০, ৩য় খণ্ড ২'০০। ঐ (স্বামী সত্যানন্দের প্রতি) ৩'০০।

সম্মিলনীর চিঠি—১৩৩৮ হালিসহর ভক্ত-সম্মিলনীর বিস্তৃত বিবরণ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশরাশি। ১'৫০।

জয়গুরুনামমাহাত্ম্যকীর্ত্তনম্—মূল্য ০'২০ প.।

সদ্‌গুরু নিগমানন্দ—শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-বিশ্লেষণ। ১'৫০।

সেবকের দিনলিপি—সাধকের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণের বাণী। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড। প্রতি খণ্ড ১'৫০ হিসাবে।

নিগম-স্মৃতি—কবিতার ছন্দে ঠাকুরের জীবন-কথা। মূল্য ০'৫০ প.।

শ্রীশ্রীগুরুগীতা—সংস্কৃত মূল ও তাহার প্রাঞ্জল পদ্যানুবাদ। ০'৭৫ প।

আচার্য্য-প্রসঙ্গ—শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দদেব-সম্পর্কিত। ১'৫০।

নীলাচলের পথে—শ্রীশ্রীঠাকুরের অমিয়স্মৃতিবজড়িত বিরহবিধুর ভক্তপ্রাণের মর্ম্মনিঙাড়ী ভাবোচ্ছ্বাস। মূল্য ০'৭৫ প.।

আমি কি চাই—০'৫০ প। **নিয়মপঞ্চক**—০'৫০ প.।

আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনগঠনোপযোগী উপদেশরাশিতে সমলঙ্কৃত। প্রতিগৃহে রাখার এবং বিবাহবাসরে উপহার দেওয়ার উপযুক্ত। পরিবর্দ্ধিত অভিনব তৃতীয় সংস্করণ ১০.০০।

কামাখ্যায় কুমারীপূজা—পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ। সাধকের প্রত্যক্ষ উপলব্ধ অনুভূতি। শেষাংশে কবিতায় 'কামাখ্যাদর্শন'। মূল্য ১'৫০।

নিত্যলোকের ঠাকুর—ভাবলোকের অপূর্ব্ব বর্ণনা ১'৫০।

মৃত্যু, পরকাল ও গতি সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর—৩য় সংস্করণ, ২·৫০।

নিগমানন্দদর্শন—সমন্বয়ী চিন্তার মৌলিক আকর। "শঙ্করের মত ও গৌরাঙ্গের পথ"-এর দার্শনিক বিশ্লেষণ। মূল্য ৭·০০ টাকা।

অমিয় স্মৃতি—শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দদেবের অমিয় মধুর স্মৃতি অবলম্বনে রচিত কবিতার নির্ঝর। মূল্য—০·৭৫ প.। **প্রেমসেবোত্তরা গতি**—বৈষ্ণবশাস্ত্র-মন্থনে উদ্ভূত অমৃতলহরী ৩·০০। **শঙ্করের মত ও গৌরাঙ্গের পথ**—জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়—৩·০০। **নিগমানন্দের আচার্য্য-অভিমান**—১·০০, **ঋষি নিগমানন্দ**—১·২৫, **সহজ পথে মায়েদের সিদ্ধি**—০·৫০, **ঠাকুর নিগমানন্দের গুরুভক্তি**—০·৫০, **বেদান্তবিদ্ গুরুর বিকাশ**—০·৫০। **সঙ্ঘে যোগদান করিব কেন?**—২·০০, **গুরুব্রহ্মের আসনপূজা**—২·০০। **শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-লীলা-লহরী** (ছন্দে)—৭·০০। **পঞ্চদশী-প্রদীপ** (১ম)—২·৫০, **স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব**—১০·০০, **সরল কঠোপনিষদ্**—১০·০০, **পরলোক-প্রসঙ্গ**—১০·০০, **শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-স্মৃতি**—২০·০০, **ব্রহ্মানন্দ গিরি**—৩·০০, **আচার্য-শিষ্যের পারম্পর্য**—১·০০, **আশীর্বাণী**—১·০০, **মিলন-বাণী**—১ম ১·৫০, ২য় ১·৫০ টাকা। **ছন্দে অভয়বাণী**—কবিতায় গ্রথিত শ্রীশ্রীঠাকুরের অভয়বাণী—১·০০, **শ্রীশ্রীঠাকুরমাহাত্ম্য**—৩·০০, **রুচির কূজন**—·৫০, **বর্ত্তমান সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা**—·৫০। **মর্মবাণী**—৩·০০, **মর্মবীণা**—৩·০০, **মর্মবেণু**—৩·০০, **আনন্দ-নির্ঝর**—৩·০০, **শ্রীগুরুপদাবলী কীর্ত্তন**—২·০০, **পুণ্যস্মৃতি**—২·০০, **পুরাতনী**—২·০০, **ব্রহ্মচর্য্যপ্রসঙ্গ**—১ম ৩·০০, ২য় ৫·০০। **ব্রহ্মচর্য্য-মাহাত্ম্য**—২·২৫, **সচিত্র আসন সাধন**—১·৫০, **মানব-জীবনের বনিয়াদ**—২·২৫। **শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-কথাসংগ্রহ** (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে)—যন্ত্রস্থ।

প্রাপ্তিস্থান: আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, হালিসহর, ২৪ পরগণা। এবং টাইটেল ফর্মার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ঠিকানাসমূহ।